বাংলাদেশের
সত্তার
অন্বেষা
আকবর আলি খান

বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা

একটি প্রচ্ছন্ন জাতির গতি-প্রকৃতির অনুসন্ধান

মূল
আকবর আলি খান

অনুবাদ
আমিনুল ইসলাম ভুইয়া

বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা : বাংলাদেশ নিজের অস্তিত্ব ঘোষণাকারী সর্বশেষ বৃহৎ জাতি-রাষ্ট্র। এ ভূ-খণ্ডের জনগোষ্ঠী এমন একটি জাতি যা সিকি শতাব্দীর মধ্যে দু'বার তার রাষ্ট্রীয় সত্তার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এর সাম্প্রতিক ইতিহাসের বাঁক-পরিবর্তন ঐতিহাসিকদের জন্য এক প্রহেলিকা। 'বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা' গ্রন্থে আপাতদৃষ্টিতে রহস্যময় এই জাতির ঐতিহাসিক উৎসের অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। প্রকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ চর্চার দু'টি ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রথমত, এই প্রচ্ছন্ন জাতির ঐতিহাসিক বিবর্তন ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কাঠামোর অন্তরালে যেসব তত্ত্ব রয়েছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থটিতে এ অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যষ্টিক ভিত্তির (micro foundation) অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।

তৃণমূল পর্যায়ের ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণ দিয়ে শুরু করে গ্রন্থটিতে গ্রামীণ বসতি-কাঠামোর বিভিন্ন নিয়ামক পরীক্ষা করা হয়েছে। অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, গ্রামীণ বসতির আনুষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার (coporateness) ঘাটতি এ অঞ্চলের রাজনৈতিক খণ্ডীভবন, অস্থিতিশীলতা এবং দলাদলির পেছনে কাজ করেছে। গ্রন্থটির অনুকল্প হল—বাংলাদেশের পল্লী এলাকার প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসই ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল ; অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ এলাকার গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান ইসলামের প্রসারকে করেছিল বাধাগ্রস্ত।

আকবর আলি খান (জ. ১৯৪৪) বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার পক্ষে বিশ্ব ব্যাংকে বিকল্প নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মরত। তিনি কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৭ ও ১৯৭৯ সালে অর্থনীতিতে যথাক্রমে এম এ এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে ১৯৬৪ সালে স্নাতক (সম্মান) ও ১৯৬৫ সালে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭১ সালে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ; অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগের উপসচিব পদে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। বিশ্ব ব্যাংকের পদে যোগদানের পূর্বে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তাঁর বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশী ও বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। Some Aspects of Peasant Behaviour in Bengal : A Neo-classical Analysis ; Discovery of Bangladesh এবং 'পরার্থপরতার অর্থনীতি' তাঁর প্রণীত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ' ১৯৯৮ সালে Discovery of Bangladesh গ্রন্থটিকে বাংলাদেশে মানবিক ও কলা বিভাগের শ্রেষ্ঠ গবেষণামূলক গ্রন্থ হিসেবে বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম স্বর্ণপদকে ভূষিত করেছে।

আমিনুল ইসলাম ভুইয়া ১৯৫৩ সালের ১লা অক্টোবর নরসিংদীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৮৬ সালে এ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে 'পলিসি এনালাইসিস'-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা : 'জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত' (১৯৮৮) 'অত্যাচারিতের শিক্ষা' (১৯৯৩) ও 'সম্রাট বনাম সূর্য সেনের ঐতিহাসিক মামলার রায়' (১৯৯০)। বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব।

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪১১/ ডিসেম্বর ২০০৪

বাএ ৪৪৭২
[অর্থবর্ষ ২০০৪-২০০৫ পাঠ্যপুস্তক : মাসাআবা উপবিভাগ : ৩]

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
মানবিকীবিদ্যা, সামাজিকবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
মুহম্মদ নূরুল হুদা
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোঃ সৈয়দুর রহমান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
আশরাফুল হাসান আরিফ

মূল্য
দুইশত টাকা মাত্র

BANGLADESHER SOTTAR ONNESHA (Discovery of Bangladesh : Exploration into Dynamics of a Hidden Nation) Translated by Aminul Islam Bhuya. Published by Mohammad Nurul Huda, Director, Textbook Division, Bangla Academy Dhaka 1000 Bangladesh. First Published : December 2004, Price : Tk 200.00 only.

ISBN 984-07-4481-X

উৎসর্গ

হাজেরা খান (আমার মা)
জাহান আরা রহমান (আমার শাশুড়ি)
ও
নাহরিন খান (আমার কন্যা)

প্রসঙ্গ-কথা

'বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা : একটি প্রচ্ছন্ন জাতির গতি-প্রকৃতির অনুসন্ধান' আকবর আলি খানের ইংরেজীতে লেখা *Discovery of Bangladesh : Exploration into Dynamics of a Hidden Nation* গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। মূল গ্রন্থটি প্রচলিত অর্থে কোনো ইতিহাস গ্রন্থ নয়। সুতরাং প্রচলিত কালানুক্রমিক ইতিহাসের রাজন্যবর্গের ক্রিয়াকলাপসমৃদ্ধ ইতিহাস এখানে পাওয়া যাবে না। আকবর আলি খান বঙ্গদেশে গ্রামীণ মানব বসতির ইতিবৃত্ত এবং গ্রামীণ বসতির কর্মধারা ব্যাখ্যা করেছেন। আর এই ব্যাখ্যা করেছেন ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, লিপিতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক তথ্য ব্যবহার করে। ফলে বাংলায় গ্রাম-সভ্যতার বিকাশের একটি চিত্র পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। তিনি নদীমাতৃক এদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার বিষয়াদি অনুসন্ধান করেছেন। ধর্মান্তরের পর্যায়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

আমরা জানি, বাংলাদেশ পলিমাটির দেশ। পলির ধর্ম হচ্ছে অনুর্বরতা চাপা দেওয়া আর নতুন উর্বরতার সৃষ্টি করা। অনুর্বরতা চাপা দেওয়ার সঙ্গে ভাঙন আর গড়নের এক বিচিত্র খেলা চলে নদী উপত্যকায়। 'নদীর এপার ভাঙ্গে ওপার গড়ে এইতো নদীর খেলা' আমাদের গীতিকারদের উপলব্ধি অসত্য নয়, এই উপলব্ধি অবৈজ্ঞানিক নয়। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, কর্ণফুলী বার বার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। নামও পরিবর্তন করেছে। ব্রহ্মপুত্র হয়েছে যমুনা, গঙ্গা হয়েছে পদ্মা, কুশিয়ারা হয়েছে মেঘনা, কাঁইচা হয়েছে কর্ণফুলী। এদেশে নদীর নাম সুরমা, কুশিয়ারা, গোমতী, মধুমতী আর ইছামতী। কীর্তিনাশার কর্মকাণ্ড কিংবদন্তী হয়ে উঠেছে। কীর্তি যেখানে নাশ হয় সেখানে ইতিহাসের সোজা সরল পথ বঙ্কিম আকার ধারণ করে। রাজধানী পরিবর্তন হয়েছে বহুবার। সাভারে রাজধানী ছিল, পুণ্ড্রবর্ধনে ছিল, সোনারগাঁয়ে ছিল, গৌড়ে ছিল, বিক্রমপুরে ছিল, মুর্শিদাবাদে ছিল, রাজমহলে ছিল। টাকশাল ছিল নানা স্থানে। বন্যজন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর মানবশত্রু ঠেকানোর জন্য গড় নির্মিত হয়েছে নানা রকম।

এখানে কাঠের দুর্গ আছে, জলদুর্গ আছে, বনদুর্গ আছে, মৃন্ময় দুর্গ আছে। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বিবর্তিত হচ্ছে এ-অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবন। যুদ্ধবিগ্রহ, মহামারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মানবীয় বিপর্যয় সব নিয়ে এ-ভূখণ্ডের মানুষের জীবন। এই জীবন বিশ্ব-ইতিহাসের অংশবিশেষ। এই ইতিহাস নির্মাণ করার প্রাতিষ্ঠানিক চেষ্টা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইতিহাস লিখেছেন নীহাররঞ্জন রায়। কিন্তু ইতিহাস রচনা সহজ ছিল না কারো জন্যই। বার বার আবিষ্কার করতে হচ্ছে নতুন বাংলাদেশের রূপ। অজস্র ভাঙাগড়া চলেছে এদেশে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত উপলব্ধি করেছিলেন — 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙে ভরা'। এই বাংলাদেশের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন আকবর আলি খান।

পলিমাটির দেশে টেরাকোটা শিল্প গড়ে ওঠেছিল। টেরাকোটা এদেশের ইতিহাসের প্রাচীনতম উপকরণের একটি। টেরাকোটার বিবর্তনে এদেশে গড়ে ওঠেছিল সমৃদ্ধ মূর্তিশিল্প। আধুনিক যুগের ভাস্কর্যের জনক বিশ্বকর্মার অবস্থান ছিল সর্বত্র। বিশ্বকর্মার পূজাও হয়ত প্রচলিত ছিল।

আকবর আলি খান অর্থনীতি ও ইতিহাসের গবেষক। ইতিহাসের উপেক্ষিত অনেক উপকরণ ব্যবহার ও বিন্যাস করে তিনি তাঁর বইটি লিখেছেন। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) প্রকাশিত '*Discovery of Bangladesh : Exploration into Dynamics of a Hidden Nation*' গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন জনাব আমিনুল ইসলাম ভুইয়া। এই শ্রমসাধ্য কাজটি নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সাথে সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই গ্রন্থটির বিষয়ে ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এই আমাদের বিশ্বাস।

১৫ই ডিসেম্বর ২০০৪
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মনসুর মুসা
মহাপরিচালক

সূচিপত্র

সারণি-তালিকা

মানচিত্র-তালিকা

পরিভাষাকোষ

অগ্রদানী ব্রাহ্মণ	পতিত ব্রাহ্মণ, যারা মৃত আত্মার পক্ষে দান গ্রহণ করে
অগ্রহর	ব্রাহ্মণ প্রতিপালনের জন্য রাজা কর্তৃক দান-করা ভূমি বা গ্রাম
আজলাফ	সাধারণ মুসলমান; আত্‌রাফ হিসেবেও ব্যবহৃত
আব্‌দাল	পানি-বহনকারী; মুসলমানদের মধ্যে সর্বনিম্ন একটি বর্ণ
আশরাফ	বাংলার উর্দু-ভাষী উচ্চকোটির মুসলমান গোষ্ঠী
আসাবিয়া	ইসলাম-পূর্ব আরবের জনপ্রিয় শক্তিশালী গোত্র-বন্ধন
কায়স্থ	হিন্দু উপ-বর্ণ, কেরানি ও দলিল-লেখকরাও এতে অন্তর্ভূক্ত ছিল।
গুরু	শিক্ষক
চণ্ডাল	নিম্ন-বর্ণের হিন্দু
ছোটলোক	সাধারণ মানুষ
জমিদার	ভূস্বামী
জিম্মি	খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মাবলম্বী–যাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোরানে নির্দেশ রয়েছে।
জিহাদ	ধর্ম-যুদ্ধ
জোতদার	জমিদার ও নিম্ন কৃষকদের মধ্যকার মধ্যস্বত্বভোগী
তাইয়ুনী	মৌলানা কেরামত আলীর অনুসারীদেরকে দেয়া নাম
তালুকদার	তালুক-এর মালিক। এক ধরনের ভূস্বামী; সামাজিক ও ভূমি-স্বত্বের মর্যাদার দিক থেকে যাদের অবস্থান জমিদারদের একটু নিচে
দারুল ইসলাম	ইসলামের দেশ
দারুল হারব্‌	কাফেরদের বাসস্থান
নাড়ু -	স্থানীয় এলাকা (তামিল); চোল এলাকায় গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক স্তর ও ভিত্তি
পঞ্চায়েত	গ্রাম কাউন্সিল
পত্তিদারী	এক ধরনের যৌথ গ্রাম যেখানে পূর্বপুরুষের অংশ অনুসারে ভূমি-বণ্টন করা হয়।
পরামানিক	রংপুর অঞ্চলের গ্রাম-নেতা
প্যাটেল	বংশানুক্রমিক গ্রাম-প্রধান
পেরিয়ানাড়ু	স্থানীয় পরিষদের সর্বোচ্চ স্তর
পোতাইল	প্যাটেল
পোদ	কৃষিতে নিয়োজিত হিন্দু বর্ণ
ফারায়জি	মৌলবাদী মুসলামন আন্দোলন–যা ফরজ বা বাধ্যতামূলক ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ওপর জোর দেয়।

বর্ণ-ব্রাহ্মণ	নিচুস্তরের ব্রাহ্মণ
বসুনিয়া	রংপুর ও দিনাজপুরে বসবাসকারী ধনী কৃষক
ভাইয়াচারা	এক ধরনের যৌথ গ্রাম যেখানে পরিবারের শ্রম শক্তি অনুসারে ভূমি বিতরণ করা হয়
বাবু	বাঙালি ভদ্রলোকদের সম্বোধন করার সাধারণ রীতি; হেয় প্রতিপন্ন করার অর্থে ব্রিটিশ শাসক কর্তৃকও ব্যবহৃত
বেদে	নৌকায় বসবাসকারী জিপসী
বৈদ্য	হিন্দুদের উচ্চ-বর্ণ; ঐতিহ্যগত কবরেজ
ব্রহ্মদেয়	ব্রাহ্মণকে প্রদেয় দান; বিশেষত, গ্রামের আয় ও ব্যবস্থাপনা ব্রাহ্মণকে প্রদান করা
ভদ্রলোক	হিন্দু উচ্চ-বর্ণের সম্মানীয় ব্যক্তি
মণ্ডল	উত্তর বাংলার গ্রাম-প্রধান
মাতব্বর	গ্রামের প্রবীণ মানুষ
মাল্লত	সমাজ-এর এক ধরনের স্থানীয় নাম
মুভেন্দাভেলা	দক্ষিণ ভারতের স্থানীয়-প্রধান
মুম্মাদি	দক্ষিণ ভারতের স্থানীয়-প্রধান
মুরুব্বী	গ্রামের প্রধান মানুষজন
মৌজা	ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক। কখনও কখনও একটি গ্রাম আবার কখনও কখনও কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত
ম্লেচ্ছ	পাপী এবং হিন্দু জীবনধারা হতে বিচ্যুত
যবন	বিধর্মী
রায়তওয়ারী	বংশানুক্রমিক-প্রধান পরিচালিত গ্রাম
রেয়াই	কুমিল্লায় পরিদৃষ্ট গ্রামীণ সামাজিক গ্রুপ
লাত্দার	খুলনা ও যশোহর জেলায় মধ্যস্বত্বভোগী ভূমি মালিক
লাম্বারদার	গ্রাম-প্রধান
শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ	সবচেয়ে নির্ভেজাল ব্রাহ্মণদের এক ধাপ নিচের ব্রাহ্মণ
সনাতন ধর্ম	চিরস্থায়ী ধর্ম-বিশ্বাস
সমাজ	গ্রামের বিভিন্ন খানা সম্বলিত স্থানীয় গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান
সর্দার	নেতা
সালিশ	বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সমাজ কর্তৃক পরিচালিত বিচার সভা
হাওলাদার	এক ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী ভূমি-মালিক

মুখবন্ধ

স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের কারণে দখলদার বাহিনী আমাকে চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করেছিল; ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই অন্ধকারময় দিনগুলোতে আমি স্বপ্ন দেখতাম বাংলাদেশের বিপ্লব নিয়ে একটি ইতিহাস রচনা করার। কিন্তু দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত স্বাধীনতার সেই আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে আমি উপলব্ধি করলাম কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংঘটিত ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসের মতো বাংলাদেশের বিপ্লবও সাম্প্রতিক-রাজনীতির ডামাডোলে তলিয়ে গেছে। বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী অন্যান্যদের মতো আমার মনেও দ্বিধাদ্বন্দ্ব জেগে উঠল – মুক্তিযুদ্ধের নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন করার যোগ্যতা কি রয়েছে আমার? মনে হল এই নতুন জাতিটির ঐতিহাসিক উৎস অনুসন্ধান করা বোধহয় আমার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। ধরে নিলাম, ঐতিহাসিক ঘটনাবলির দূরত্ব হয়ত আমাকে সাহায্য করবে বাংলাদেশ-বিপ্লবের ধারণাগত কাঠামো নির্মাণ করতে এবং সঠিকভাবে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরতে। কিন্তু এ কাজটিও সমভাবে হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়াল। আলফ্রেড কোব্বান যথার্থই বলেছেন, পদ্ধতিপ্রণালীর বিবেচনায় 'ঐতিহাসিক আর সমাজতাত্ত্বিকগণ একে অপরের প্রকৃতিগত শত্রু।' কিন্তু বাংলাদেশের ঐতিহাসিক শিকড় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তত্ত্বের প্রতি ঐতিহাসিকদেরও প্রকাশ্য বিরাগ সত্ত্বেও প্রথাগত ঐতিহাসিক প্রণালী আলো বিকিরণের বদলে উত্তাপই ছড়ায় বেশি। অর্থনীতিবিদ হিসেবে আমার সমর্থন আলফ্রেড মার্শালের আপ্তবাক্যের প্রতি; তিনি বলেছেন, 'তিনিই সবচেয়ে হঠকারী ও বিপজ্জনক তাত্ত্বিক যিনি দাবি করেন ঘটনাকে তার নিজের মতো করে উপস্থাপিত হবার সুযোগ দিতে হবে।' এ কারণে আমি ঐতিহাসিকদের পরোক্ষ তত্ত্বের চাইতে সমাজতাত্ত্বিকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বায়নকে বেশি মূল্য দেই। আমি জানি যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ফলে হয়ত ঐতিহাসিকদের মধ্যে বন্ধুর চেয়ে শত্রুই জুটবে বেশি। তবে আশা করা যায়, সুনির্দিষ্ট তত্ত্বের উপস্থাপন বিতর্কাধীন বিভিন্ন ইস্যুর ক্ষেত্রে স্পষ্টতা আনবে এবং মাথা খাটিয়ে মূলধারার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুধাবন করতে সাহায্য করবে। তারপরও আশঙ্কা থাকবে এই আলোচনার (study) অনেক অনুকল্প হয়ত অনেকের কাছে গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হবে না।

যদিও গত পঁচিশ বছর যাবত আমি এই সমীক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি। তবু ড. কামাল সিদ্দিকীর সক্রিয় উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া এই বইটি চূড়ান্ত করা সম্ভব হত না। এই বই লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সব গবেষণা-সামগ্রীর জোগান দিয়ে তিনি আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। শুধু ভাষায়

বর্ণনা করে সে ঋণ শোধ হওয়ার নয়। এ লেখাটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের বিভিন্ন পর্যায়ে জনাব এ. কে. এন. আহমেদ ও জনাব জিয়াউল আনসার তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কয়েকটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণও এই গবেষণার বেশ কিছু অনুকল্প নিয়ে অন্বেষী প্রশ্ন তুলেছেন; এ সব প্রশ্ন 'বাংলাদেশ চর্চা'-র বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে। তাঁদের সবার প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড-এর জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ-এর সহায়তার জন্য আমি তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ; স্বল্পতম সময়ে তিনি এ বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের জনাব তপন কে. চক্রবর্তীকেও ধন্যবাদ জানাই; অত্যন্ত যত্ন ও ধৈর্য সহকারে তিনি এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি টাইপ করেছেন।

আমার স্ত্রী হামিম গত ২৩ বছর বহুভাবে আমাকে সহযোগিতা-সমর্থন জুগিয়েছেন। তাঁর এ ত্যাগ যে পুরোপুরি বিফলে যায়নি, আশা করি, তা দেখতে পেয়ে তিনি তৃপ্তি পাবেন।

ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯৬ | **আকবর আলি খান**

সংশোধিত সংস্করণের ভূমিকা

সংশোধিত এই সংস্করণটিতে একটি উত্তরলেখ যুক্ত করা হয়েছে। উত্তরলেখটিতে কিছু কিছু কারিগরি বিষয় পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে যা মূল পাণ্ডুলিপিতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়নি। তবে কিছু কিছু সম্পাদকীয় পরিবর্তন ছাড়া মূল পাণ্ডুলিপি অপরিবর্তিত থেকে গেছে।

নিবন্ধটি কলা ও মানবিক বিভাগে ১৯৯৬-৯৮ সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখা হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ায় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ আমাকে বিচারপতি ইব্রাহিম স্বর্ণপদক প্রদান করেছে; আমি তাদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

ঢাকা, ১লা ফেব্রুয়ারি ২০০১ | **আকবর আলি খান**

ভূমিকা

জাতিভিত্তিক-রাষ্ট্রের (nation-state) ভুবনে বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটে বিলম্বে। যোগদান তারিখের ক্রম অনুসারে জাতিসংঘের এক শত পঁচাশিটি সদস্যের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান একশ' তেত্রিশতম (১৯৯৫-এর উপাত্ত)। বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির পর যে সব রাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগ দিয়েছে তাদের অধিকাংশই ক্ষুদে রাষ্ট্র; সাম্প্রতিককাল অব্দি ইতিহাসের চোরাগলিতে ছিল এদের অবস্থান । বাংলাদেশের পর জাতিসংঘে যে ৫২টি রাষ্ট্র যোগ দিয়েছে তার ২৫টির প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা দশ লাখেরও কম; অন্য ১৭টির ক্ষেত্রে তার পরিমাণ এক কোটির নিচে। এ ধরনের ৪৮টি দেশের একত্রিত জনসংখ্যা বাংলাদেশের জনসংখ্যার চাইতেও কম (১৯৯৫ সালে এ সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১২ কোটি)। ১৯৭১ সালে জন্মের সময় বাংলাদেশ ছিল জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর অষ্টম বৃহৎ দেশ। বিশ্বের প্রতি আটচল্লিশ জন মানুষের একজন হচ্ছে বাংলাদেশী। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় বাংলাদেশ হচ্ছে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণাকারী সর্বশেষ বৃহৎ জাতিভিত্তিক-রাষ্ট্র।

বাংলাদেশের জন্ম শুধু বিলম্বিতই নয়, আকস্মিকও বটে। বাংলাদেশ কোনও সুচিহ্নিত ভৌগোলিক সত্তাতো নয়ই, এমনকি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত ঐতিহাসিক এককও নয়। ১৯৪৭ সালে এর রাজনৈতিক সীমানা চিহ্নিত করেছিল একজন ব্রিটিশ মধ্যস্থতাকারী যাঁকে নির্বাচন করার পিছনে মুখ্য যে বিবেচনা কাজ করেছিল তা ছিল দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা (Collins and Lapierre, ১৯৭৫, পৃ. ২১৭)। এই বিভক্তি এতটাই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, এর ফলাফল বয়ান করতে গিয়ে বাঙালি কবি অন্নদাশঙ্কর রায় দুঃখ করে একে 'ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির/ চলছে যেন হরির-লুট" (১৯৫৪, পৃ.১৪৮) বলে আখ্যায়িত করেছেন। ১৯৪৭ সালে বিভীষিকাময় দেশভাগ অবশ্য এর জাতিসত্তা সংকটের সমাধান দেয়নি। বাংলাদেশ দু'-দু'টি বিচ্ছিন্নতার ফসল। বাংলাদেশ এমন একটি জাতি যা সিকি শতাব্দীর মধ্যে দু'বার তার রাষ্ট্রীয় সত্তার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বাংলাদেশের নাটকীয় অভ্যুদয় দক্ষিণ এশিয়ার জাতীয়তাবাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সাথে মোটেও মেলে না। দক্ষিণ এশিয়ায় 'এক-জাতি তত্ত্বে'র সমর্থনকারী ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের গৎ-বাঁধা ছকে যেমন তা পড়ে না, তেমনি দ্বি-জাতি তত্ত্বে' বর্ণিত ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের সাথেও তা খাপ খায় না। সেটন ওয়াটসন 'আবহমান পুরনো জাতি'-র বিপরীতে চরিত্রগতভাবে ভিন্ন 'নতুন জাতি' বলে যাকে বর্ণনা করেন – তার সাথেও এর পুরোপুরি মিল নেই (Seton-Watson, ১৯৭৭, পৃ. ৬)। বাংলাদেশ সতত অস্থিতিশীল একটি জাতি; এর উৎস ঐতিহাসিকদের জন্য প্রহেলিকা। একজন আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যথার্থই বলেছেন, "বাংলাদেশ স্ববিরোধিতার চ্যালেঞ্জে ভরা একটি দেশ" (Ziring, ১৯৯২, পৃ ১)।

রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে বাংলাদেশ যদিও নবীন, বাংলাদেশ নামটি কিন্তু কোনও ক্রমেই নতুন নয়। ১০২৫ খ্রিষ্টাব্দে খোদিত রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় শিলালিপি বাংলাদেশকে 'অবিরল বৃষ্টিধারার' দেশ বলে বর্ণনা করেছে (Chowdhury, ১৯৮৭, পৃ. ৮৩-৮৪)। 'বঙ্গ' শব্দ থেকে বাংলাদেশ শব্দের উদ্ভব। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ *ঐতরেয় আরণ্যক*-এ বঙ্গ শব্দের সন্ধান মেলে (আনুমানিক খ্রিষ্ট-পূর্ব ৫০০ সাল থেকে ৫০০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত)। প্রচলিত কিংবদন্তি মতে রাজকুমার বঙ্গ প্রথম বাংলা জয় করেছিলেন; তার জন্ম হয়েছিল বালী রাজার স্ত্রী সুদেষ্ণা ও অভিশপ্ত মুনি দীর্ঘতমা-র মিলনে (সরকার, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃ.২২২)। ভাষাবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, বঙ্গ শব্দের উৎস প্রতিবেশী অঞ্চলের ভাষার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ভাষাবিজ্ঞানীদের একটি ঘরানা মনে করে যে, *'বঙ্গ'* শব্দটি তিব্বতি শব্দ *'বঙস্'* থেকে উদ্ভূত। *'বঙস্'* মানে *'ভেজা'* ও *'আর্দ্র'* (দাশ, ১৯৬৯, পৃ. ১)। এই ব্যাখ্যা মতে বাংলাদেশ বলতে আক্ষরিক অর্থেই একটি আর্দ্র এলাকা নির্দেশ করে। অন্য এক ঘরানার মতে 'বাঙ্গালা' শব্দের উদ্ভব আসামের আদিম গোষ্ঠী বোরোদের শব্দ *'বাং'* ও *'লা'* থেকে – যার অর্থ দাঁড়ায় 'বিস্তীর্ণ সমতল' (Nath, ১৯৪৮, পৃ. ১৭)। ষোড়শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক আবুল ফজল আবার অন্য এক ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, বাংলার আদি নাম ছিল '*বাং*'। এর পূর্বতন শাসকগণ সারা প্রদেশে ১০ গজ সমান উঁচু ও ২০ গজ প্রস্থের মাটির ঢিবি তৈরি করেছিল; তাকে বলা হত '*আল*'। '*বাং*'-এর সাথে '*আল*' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বাঙ্গালা নাম গড়ে উঠেছে এবং প্রচলিত হয়েছে (Majumder, ১৯৪৩, খণ্ড-১, পৃ. ১৯-এ উদ্ধৃত)। এখন পর্যন্ত যে-সব তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে তিব্বতি উৎসের অনুকল্পটি সবচেয়ে যৌক্তিক মনে হয়, কারণ বাংলা বদ্বীপ পৃথিবীর বৃহৎ জলাভূমিগুলির অন্যতম।

ভৌগোলিকভাবে বাংলা একটি সুনির্দিষ্ট একক। নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন, "একদিকে সুউচ্চ পর্বতমালা, দুই দিকে কঠিন শৈলভূমি, আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র..., মাঝখানে সমভূমির সাম্য – ইহাই বাঙালীর ভৌগোলিক নিয়তি" (রায়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭১)। বিস্ময়ের ব্যাপার হল 'বৃহৎ বঙ্গ'-এর ভৌগোলিক ঐক্য বাঙালিদের নিজেদের চাইতে বহিরাগতদের চোখে অধিক স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। বাঙালিরা নিজেরা অধিকাংশ সময় বহুসংখ্যক 'ক্ষুদ্র বাংলা'-য় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। এতদঞ্চলের প্রাচীন শিলালেখ বিভিন্ন ক্ষুদে রাজত্বের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। বাংলার মধ্যযুগীয় *ধর্মমঙ্গল* সাহিত্যে 'দ্বাদশ বাংলার' উল্লেখ বারবার লক্ষ করা যায় (সেন, ১৯৯৩, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২)। অন্যদিকে প্রতিহার রাজা প্রথম ভুজের গোয়ালিয়র শিলালেখ (৯ম শতাব্দী) '*বৃহৎ বাংলা*'র অস্তিত্বের উল্লেখ করে (সেন, ১৯৯৩, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২)। মোগল শাসকগণ সুনিশ্চিতভাবেই বাংলার ভৌগোলিক বৃহৎ আয়তন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। মোগল দরবারের ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন, বাঙ্গালা দ্বিতীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত (ইকলিম); চট্টগ্রাম থেকে গড়হি (তেলিয়াগড়) অব্দি লম্বায় তা চারশ' ক্রোশ। পূর্বে আর উত্তরে পাহাড়ের সীমান্ত দিয়ে ঘেরা; দক্ষিণে তার সমুদ্র; সুবা বিহার তার পশ্চিম সীমান্ত। এর লাগোয়া দেশ হচ্ছে কামরূপ আর আসাম' (Rahim-এ উদ্ধৃত, ১৯৬৩, খণ্ড-১, পৃ. ৭)। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরও তাঁর

বাংলা দৈর্ঘ্যে ৪৫০ ক্রোশ আর প্রস্থে ২২০ ক্রোশ; অর্থাৎ বাংলার আয়তন হচ্ছে আনুমানিক ৪০০,০০০ বর্গমাইল যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি (৮৪,০৯২ বর্গমাইল), বিহার ও ওড়িশার (১১১,৮৪২ বর্গমাইল) সম্মিলিত আয়তনের চাইতেও অনেক বেশি। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় জাহাঙ্গীর বাংলার আয়তনকে খুব বেশি বলে অনুমান করেছিলেন। তবে বলা যায়, ভৌগোলিক একক হিসেবে এর বিশালত্বকে তিনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন।

মুসলমান শাসনামলে (১২০১-১৭৫৭ খ্রি.) 'বৃহৎ বঙ্গ' একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা হয়ে ওঠে; প্রাচীন আমলে বৃহৎ বঙ্গ ছিল অজ্ঞাত। মুসলমান শাসনের আগে এ এলাকার রাজনৈতিক মানচিত্র ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে ভরা। বিভিন্ন শিলালেখ এই এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রমাণ জোগায়। প্রাচীনকালে এ এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন নরগোষ্ঠীই হয়ত এ সব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। রায়ের মতে বঙ্গ, রাঢ়, গৌড় এবং পুণ্ড্র হচ্ছে বাংলার প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নাম (রায়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৮)। শিলালিপিতে যে সব রাজ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সুনির্দিষ্ট সীমান্ত জানা যায়নি। তদুপরি, এদের সীমান্ত স্থির থাকেনি; এ সব রাজত্বের রাজনৈতিক ভাগ্যের সাথে সাথে সীমান্ত পরিবর্তিত হয়েছে। ঐতিহাসিক সূত্রে তিনটি সুনির্দিষ্ট রাজত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; এগুলো *বঙ্গ*, *বাঙ্গালা* এবং *বাঙ্গালাদেশ* নামে পরিচিত ছিল। দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে অবস্থিত ছিল এসব রাজত্ব। এগুলো ছাড়াও ইতিহাসে পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজত্ব – যেমন, হরিকেল (সম্ভবত সিলেট), সমতট (কুমিল্লা অঞ্চল), পট্টিকেরা (কুমিল্লা অঞ্চল), এবং চন্দ্রদ্বীপের (বরিশাল অঞ্চল) উত্থান-পতন লক্ষ করা গেছে। বাংলার পশ্চিম অঞ্চলে ছিল কজঙ্গল (দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা), তাম্রলিপি (মেদিনীপুর), সুহ্মভূমি (বর্ধমান, হুগলি এবং হাওড়ার অংশবিশেষ) এবং রাঢ় (পশ্চিম বাংলা)। রাঢ় আবার কোনও কোনও সময় উত্তর রাঢ় (উত্তর পশ্চিম বাংলা) এবং দক্ষিণ রাঢ় (দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা) নামে দু'অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। মধ্য বাংলায় গড়ে উঠেছিল পুণ্ড্রবর্ধণ (বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী অঞ্চল), বরেন্দ্র (রাজশাহী অঞ্চল), গৌড় (মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ, ও বর্ধমান) এবং কর্ণ-সুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ অঞ্চল) রাজ্য।

প্রাচীন কালের বহু 'ক্ষুদ্র বাংলা' নিয়ে মুসলমান শাসকরা গড়ে তোলেন 'বৃহৎ বঙ্গ'। মুসলমানদের বাংলা আক্রমণের আগেও রাজা শশাঙ্ক (৭ম শতাব্দী) ও পাল শাসকগণ (৭৫০-১১৬২ খ্রিষ্টাব্দ) কর্তৃক বাংলাকে এক করার ব্যর্থ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলায় টেকসই রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) শুধু বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলকেই ঐক্যবদ্ধ করেননি, তিনি এই ঐক্যবদ্ধ রাজ্যকে 'বাঙ্গালা' হিসেবে নতুনভাবে নামকরণও করেছিলেন। তিনি নিজে *শাহ্-ই-বাঙ্গাল* (বাঙ্গালার রাজা) উপাধি ধারণ করেন। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচেষ্টার আকস্মিক তোড় ছাড়া চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য বিদ্যমান থাকে। মোগল শাসকগণ দিল্লিকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যে বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করে এই ঐক্য আরও জোরদার করেন। মুসলমান শাসকদের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ঐক্য ভাষাগত সমরূপতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। বাংলায় মুসলমান শাসকগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎসাহী

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; তাঁদের পূর্ববর্তী হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসকবৃন্দ এমনটি ছিলেন না। মুসলমান শাসনের পূর্বে উচ্চকোটির (elite) হিন্দুরা অপবিত্র ও স্থূল গণ্য করে বাংলা– তথা দেশী ভাষার প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছে; নিম্ন বর্ণের লোকজনের জন্য সংস্কৃত শিক্ষাকেও নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামের প্রসার উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। অশিক্ষিত জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য ইসলাম ধর্ম ও বৈষ্ণববাদরূপে পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্মের তীব্র প্রতিযোগিতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ফলে উভয় পক্ষই তাদের ধর্মবাণী প্রচারের জন্য দেশী ভাষার আশ্রয় নেয়।

উত্তরাধিকারসূত্রে ব্রিটিশরা সাংস্কৃতিকভাবে সমরূপ ও রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ বাংলা লাভ করে। দক্ষিণ এশিয়ায় কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য (*Pax Britannica)* বাংলার ঐক্যরূপের প্রাথমিক অবস্থাকে শুধু সংহতই করেনি, উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করে। চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, 'বাঙালিরা নিজেরা রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তাদের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল মুসলমানদের প্রশাসনে ছোট-খাট পদ এবং চাকুরি। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে আচমকা ও নাটকীয়ভাবে সবকিছু বদলে যায়। বাংলা ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে, এবং ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষার কারণে একই সাথে তা হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রভূমি। বাংলার জনগণের ঐতিহাসিক অস্তিত্বে প্রথমবারের মতো তাদের কাছে একটি সুযোগ আসে নিজের দেশের ইতিহাসে একটি মুখ্য ভূমিকা পালনের, সেইসাথে ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত সর্বোচ্চ পদ লাভের। এক্ষেত্রে বাঙালি বলতে সেই জনগোষ্ঠীক বোঝানো হচ্ছে যাদেরকে গোষ্ঠী হিসেবে ভারতের অন্য হিন্দুদের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়' (Chaudhury, ১৯৮৭, পৃ. ৬৬৩)। উনবিংশ শতাব্দীতে উচ্চকোটির বাঙালিরা গর্ব করে বলত 'আজ বাংলা যা ভাবছে, বাকি ভারত কাল তা ভাববে'। বাঙালি ঐতিহাসিকগণ দাবি করেন যে, প্রাচীন কালের বাঙালিরা শুধু বাংলায়ই নয়, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং ভারতের অন্যান্য অংশের সভ্যতারও নির্মাতা ছিল (সেন, ১৯৯৩; দাশ, ১৯৮৪)। এ রকম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহে বাংলার উচ্চকোটির রাজনীতিবিদরা মোহান্ধ থেকেছে– চৌধুরী একে ফাঁপানো অহংমন্যতা (megalomania) বলে আখ্যায়িত করেছেন (চৌধুরী, ১৪০২ বঙ্গাব্দ)।

ইতিহাসের বিভিন্ন কালে বাংলা হয় বৃহৎ বাংলা, নয় বহু ক্ষুদে বাংলা রূপে পরিচিত ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দু'টি রাজনৈতিক একক হিসেবে বাংলার বিভক্তি তার ইতিহাসে আচমকা মোড় পরিবর্তন করে। মোটামুটিভাবে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে বাংলার বিভক্তি ঐতিহাসিক দলিলাদিতে একেবারেই অনুপস্থিত তা বলা যাবে না। *কামসূত্রের* (আনুমানিক ৩য় ও ৪র্থ খ্রিষ্টীয় শতক) লেখক বাৎসায়ন গৌড় ও বঙ্গকে দু'টি আলাদা এলাকা বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে বতুতা চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলায় পরিভ্রমণ করেছিলেন; তিনি লক্ষ্মণাবতী ও বাঙ্গালা রাজত্বের উল্লেখ করেছেন – যা মোটামুটিভাবে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার অনুরূপ (Rahim, ১৯৬৩)। মোগল দরবারের ঐতিহাসিক আবুল ফজল 'ভাটি' (নিচু অঞ্চল) ও 'বাংলা'-কে আলাদা আলাদা দু'টি

অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা মোটামুটিভাবে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার এলাকা নিয়ে গঠিত (Eaton, ১৯৯৪, পৃ. ১৪৫-১৪৬)। অবশ্য এ সব বিভাজন ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভক্তির অগ্রদূত ছিল না। এ সব রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল স্বল্পস্থায়ী। অর্জন ও আত্মোৎসর্গের যৌথ স্মৃতি সৃষ্টিতে তারা সফল হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, মরিসনের মতামত উল্লেখ করা যায়। তিনি মত পোষণ করেন যে, মুসলমান-পূর্ব কালে বাংলা কার্যত চারটি রাজনৈতিক ভাগে বিভক্ত ছিল (Morrison, ১৯৬৯)। ১৯৪৭ সালের বাংলা-ভাগ কোনও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতি নয়। হান্স কোন্ 'প্যাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ (corporate) ইতিহাসের একটি মহান যৌথ সত্তা' বলে যাকে বর্ণনা করেন সে রকম কোনও সত্তা হিসেবে তাই বাংলাদেশ বিকাশ লাভ করেনি (Kohn, ১৯৪৫, পৃ. ৩২৯)।

মোটামুটিভাবে জাতীয়তাবাদের উৎস সম্পর্কে দু'ধরনের পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব রয়েছে : ১. আদিকালিক (Primordial) তত্ত্ব ও ২. বিশেষ গোষ্ঠীর হাতিয়ার-স্বরূপ (Instrumental) তত্ত্ব। আদিকালিক তত্ত্বের প্রবক্তাগণ যুক্তি দেখান যে, ইতিহাসের আদিম পর্যায়েই জাতি জন্ম নেয়। আদিকালিক তত্ত্বের সমর্থকদের মতে জাতি একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা। এই ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এক ধরনের 'মানসিক বন্ধন যা অবচেতনে একটা জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে; অপরিহার্যভাবে তা নিজেদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা বলে বিশ্বাস করতে শেখায়' (Connor, ১৯৭৮, পৃ. ৩৭৯)। আদিকালিক অনুরক্তিকে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয় যে, 'এটি বাস্তবতা থেকে, আরও স্পষ্টভাবে বললে সংস্কৃতি যে-সব বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত হয়, তা থেকে উৎসারিত। এই বাস্তবতা সামাজিক অস্তিত্বের এবং প্রধানত নৈকট্য ও আত্মীয় সম্পর্কের। এর বাইরেও আরও কিছু উৎস রয়েছে, যেমন কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ, কোনও নির্দিষ্ট ভাষায় বা উপভাষায় কথা বলা, নির্দিষ্ট কোনও সামাজিক আচার পালন, ইত্যাদি"। এ সব অনুরক্তি মানসিক পরিস্থিতির বাস্তবতা গড়ে তোলে এবং তা 'ব্যক্তিত্বের যুক্তিবহির্ভূত ভিত্তিতে প্রোথিত থাকে' (Geertz ১৯৬৩, পৃ. ১৪৭)। সর্বদা আদিম অনুরক্তি বাস্তব না-ও হতে পারে; কোনও কোনও সময় তা কল্পিতও হয়। আদিকালিক অনুরক্তির ধারণা অনেক সময় ইতিহাস সম্পর্কে বিশ্বাস থেকে গড়ে ওঠে। ব্রিউলি এ ধারণাকে "ইতিহাস সম্পর্কে লালিত-বিশ্বাসের (historicism) অনন্যতা" বলে বর্ণনা করেছেন। এ ধারণা মতে প্রতিটি জাতির অনন্যতাই তার ইতিহাস সম্পর্কে লালিত বিশ্বাস কর্তৃক প্রতিপাদিত। ইতিহাস সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের বিশ্বাস আদতে যথার্থ ইতিহাস নয়, এটি হচ্ছে জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিহাস সম্পর্কে লালিত-বিশ্বাসের প্রয়োগ। জাতি অতীত দ্বারা নির্মিত হয় – এ ধরনের সূত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টাই প্রতিফলিত হয় এ সব ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে। ব্রিউলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "ইতিহাস প্রমাণপঞ্জির কোনও আকর নয় যার মাধ্যমে কোনও তত্ত্বকে যাচাই করা যায়; এটি কোনও সনদপত্রও নয় যার আলোকে বর্তমানের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত করে তোলা যায়। এটি বর্তমানের ওপর কোনও বাধ্যবাধকতাও নয়। মানব চরিত্র যে বিচিত্র ও ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে তা-ও অস্বীকার করে না ইতিহাস। বলা চলে কোনও একটি জনগোষ্ঠীর চেতনা বোঝার জন্য

ইতিহাস হচ্ছে একমাত্র পথ; কোনও বিশেষ সমাজের ভাষা বোঝার জন্য প্রধান উপায়' (Breuilly), ১৯৮২, পৃ. ৩৩৪)।

প্রকৃতির মধ্যেই জাতির উৎপত্তি এবং জাতি-ভিত্তিক-রাষ্ট্র হচ্ছে নৃতাত্ত্বিকভাবে বা সাংস্কৃতিকভাবে বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিয়তি — এই মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করেন হাতিয়ার-স্বরূপ জাতীয়তাবাদ মতের প্রবক্তারা। জাতীয়তাবাদের হাতিয়ার-স্বরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি দৃষ্টিকোণ লক্ষ করা যায় (হাচিন্‌সন্‌ ও স্মিথ, ১৯৯৪)। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সংস্কৃতির ভূমিকা স্বীকার করা সত্ত্বেও গেল্‌নার যুক্তি দেখান যে, সাংস্কৃতিক অভিন্নতা জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে না; বরং উল্টোটাই সত্যি। আধুনিক সমাজে সাংস্কৃতিক অভিন্নতার প্রয়োজনে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলা হয়। তাঁর ভাষায়, "জাতীয়তাবাদই জাতি সৃষ্টি করে; জাতি জাতীয়তাবাদ গড়ে না"। লোক-সংস্কৃতিভিত্তিক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন কৃষি সমাজ থেকে উচ্চ-সংস্কৃতি (high culture) নিয়ন্ত্রিত শিল্পভিত্তিক সমাজে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় জাতীয়তাবাদের প্রণোদনা গড়ে ওঠে। শিল্পভিত্তিক সমাজের কার্যকারিতা নির্ভর করে সমরূপ শ্রমশক্তির ওপর — একই ধরনের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি (উচ্চ সংস্কৃতি) রয়েছে এমন শ্রমশক্তির একস্থান থেকে অন্যত্র সহজভাবে স্থানান্তরের সুযোগের ওপর। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদ হচ্ছে "আদিতে যে-সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমগ্র জনগোষ্ঠীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত নিচু স্তরের সংস্কৃতি . . .মূলত সে সংস্কৃতির ওপর উঁচু স্তরের সংস্কৃতি আরোপণ।" (Gellner, ১৯৯৩)।

টম নেয়ার্ন (Tom Nairn, ১৯৭৭) বলছেন যে, জাতীয়তাবাদ সেই সমাজে জন্ম লাভ করে যা হুমকির সম্মুখীন, যা অনুন্নত, এবং যেখানে বুদ্ধিজীবীগণ উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের লক্ষ্যের সমর্থনে গণমানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন। মার্কস্‌বাদী ঐতিহাসিক এরিক হবস্‌আওম (Eric Hobsawm, ১৯৮৩) দাবি করেছেন যে, এমনকি য়ুরোপেও নিজেদের ক্ষমতাকে বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে উচ্চকোটির রাজনীতিবিদরা জাতি আবিষ্কার করেছে। পল আর. ব্রাস (Paul R. Brass, ১৯৭৯) সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পৃথক জনগোষ্ঠীসমূহের আবহমান সংস্কৃতি বা আচার-অনুষ্ঠানের ভিন্নতা সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ উচ্চকোটির গোষ্ঠীসমূহ অভিন্ন রাজনৈতিক পরিচিতি গড়ে তোলার জন্য সাংস্কৃতিক প্রতীকসমূহকে সুকৌশলে কাজে লাগায়। এন্ডারসন (Anderson, ১৯৯২) জাতিভিত্তিক-রাষ্ট্রকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট একটি সত্তা, 'একটি কাল্পনিক রাজনৈতিক গোষ্ঠী' বলে গণ্য করেন।

জাতীয়তাবদের ক্ষেত্রে 'আদিকালিক' এবং 'হাতিয়ার-স্বরূপ' — উভয় অবস্থানই চরম। এ দুই চরম অবস্থানের মাঝামাঝি কোথাও হয়ত সত্যের অবস্থান। বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জাতীয়তাবাদের 'হাতিয়ার-স্বরূপ' ব্যাখ্যার দিকেই বেশির ভাগ ঐতিহাসিকের ঝোঁক। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ব্যাখ্যাকার হিসেবে এ তত্ত্বের অনুসারীদের চারটি ঘরানা লক্ষ করা যায়। এক ঘরানার প্রবক্তাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হচ্ছে *ব্রিটিশ রাজের* 'বিভক্তি ও শাসন' নীতির চূড়ান্ত ফসল (Addy & Azad, ১৯৭৫)। অন্য একটি ঘরানার অনুসারীগণ অভিমত পোষণ করেন যে, বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটেছে অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে (Sobhan, ১৯৯২)। একই সুরে মল্লিক ও হুসেইন উপসংহার টেনে বলেছেন:

বাংলাদেশের নিজস্ব সত্তা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ছিল 'অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ন্যায্য হিস্সা লাভের সংগ্রামে একটি প্রান্তীয় সমাজের প্রতিক্রিয়া' (Mallick & Husain, ১৯৯২, পৃ. ৫৫০)। তৃতীয় একটি ঘরানা বাংলাদেশের উদ্ভবকে উচ্চকোটির গোষ্ঠীসমূহের দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (Broomfield, ১৯৯২)। আরও দেখা যায় যে, অনেকক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্ভবকে দীর্ঘ সময়ের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতির বদলে পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি নির্মাণের ব্যর্থতা হিসেবে উপস্থাপন করা হয় (Jahan, ১৯৯৪; Maniruzzaman, ১৯৮০)।

'আদিকালিক তত্ত্বের' দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা প্রধানত জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা-বিবৃতির মধ্যে বিধৃত হয়েছে। এখনও তা কোনও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্বরূপে অবয়ব লাভ করেনি। এতদ্সত্ত্বেও জাতিসত্তার আদিকালিক সত্তাকে একটি বাস্তবতা হিসেবে ধরে নেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, জিরিং লিখেছেন : "পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা তাদের বিশেষ সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে একটি জাতি গড়ার জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা ঘোষণা করেছে এবং তার প্রমাণ দিয়েছে। আবহমান কাল থেকে স্বতন্ত্র একটি চেতনা জাতিসত্তায় একটি সামাজিক অভিব্যক্তি পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে জন্ম-নেওয়া অন্য অনেক দেশের মতো এখানে বিভিন্ন অসম জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজন পড়েনি। সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ আগেই এখানে একটি সফল ভূমিকা পালন করেছিল। নিজেদের স্বাধিকার দাবি করার আগেই বাঙালিরা একটি সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ছিল" (Ziring, ১৯৯২, পৃ. ২)। অন্য একজন ঐতিহাসিক দাবি করেছেন যে, "বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের যাত্রা শুরু সেই সময়ে যখন সকল ইতিহাস যাত্রা শুরু করেছিল – তার মানে প্রাগৈতিহাসিক কালে" (Osmany, ১৯৯২, পৃ. ১)।

আদিকালিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যার প্রশ্নাতীত গ্রহণযোগ্যতা দু'কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। এ ধরনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জাতীয়তার অপরিবর্তনীয় ভিত্তি থাকতে হবে। কিন্তু লক্ষ করা গেছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি অকস্মাৎ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ থেকে ভাষাগত জাতীয়তাবাদে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

জাতীয়তাবাদের ভিত্তির এই পরিবর্তন সাম্প্রতিককালের বাঙালি বনাম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের" প্রবক্তাগণ প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবাংলার সাথে তুলনা করে বাংলাদেশের বাঙালিদের ইসলামি পরিচিতির ওপর জোর দেন (Osmany, ১৯৯২, পৃ. ১৪৫)। অন্যদিকে "বাঙালি জাতীয়তাবাদ" বাংলার অসাম্প্রদায়িক ও ভাষাগত ঐতিহ্যের মহিমা তুলে ধরে (Ahmed, ১৯৯৪)। তবে, বাংলাদেশের জাতিসত্তার পরস্পরবিরোধী এই ধারাকে সমন্বিত করার কোনও তত্ত্ব এখনও গড়ে তোলা যায়নি।

বাংলাদেশে আদিকালিক জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে একটি সুপ্রচলিত বিশ্বাস। এ বিশ্বাসমতে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ প্রসঙ্গে চ্যাটার্জী ঠিকই বলেছেন যে, গত শতাব্দীতে '*আর্য-হিন্দু-ভারতবর্ষ* সম্পর্কে ঐতিহাসিক স্মৃতির একটি জোয়ার' সৃষ্টি হয়েছে যা ভারত ইতিহাসের এককত্ব এবং তার ধ্রুপদী উৎসকেই

সমর্থন করে (Chatterjee), ১৯৯৩, পৃ. ১১৫)। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসকে উত্তর-ভারতভিত্তিক সাম্রাজ্যের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত বলে মনে করা হয়। এর শুরু খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষপাদে, পরাক্রমশালী *গঙ্গাঋদ্ধি* (গঙ্গরিদই) সাম্রাজ্যে। কথিত আছে যে, এই শক্তি 'মহামতি আলেকজান্ডার'-কেও ভীত-শঙ্কিত করে পিছু হটাতে সক্ষম হয়েছিল। এ ব্যাখ্যা মতে বাংলাদেশ অঞ্চল বিভিন্ন পরম্পরায় মৌর্য সাম্রাজ্য (খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী), গুপ্ত সাম্রাজ্য (৪র্থ-৫ম শতাব্দী), শশাঙ্কের সাম্রাজ্য (৭ম শতাব্দী), পাল সাম্রাজ্য (৮ম-১২শ শতাব্দী), সেন রাজত্ব (১২শ-১৩শ শতাব্দী), দিল্লির সুলতানী শাসন (১৩শ-১৫শ শতাব্দী), মোগল সাম্রাজ্য (১৬শ-১৮শ শতাব্দী) এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য (Pax Britannica) কর্তৃক শাসিত হয়েছে। সাম্রাজ্য নির্মাণে বাংলার রাজনৈতিক প্রতিভার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে গিয়ে বিশেষভাবে পাল সাম্রাজ্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়। পাল সাম্রাজ্য চারশ' বছরেরও বেশি কাল ধরে শাসন করেছে এবং অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ধর্মপাল ও দেবপালের নেতৃত্বে তা চূড়ান্তভাবে বিকশিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রায়শই বাংলাকে মহান ভারতীয় ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা হয়। স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয়া হয় যে, দক্ষিণ এশিয়ার অভিন্ন সংস্কৃতি সম্পকির্ত চেতনা অভ্যন্তরীণ বিভেদ ও পরিবর্তন সত্ত্বেও "ক্ষুদ্র" ও "বৃহৎ" সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম গড়ে তোলে এবং "বিশ্ববীক্ষা, মূল্যবোধ-কাঠামো ও সভ্যতার আদল নির্মাণ করে" (Singer, ১৯৭২, পৃ. ৭)। ফলে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশকে কোনও সুচিহ্নিত ঐতিহাসিক একক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না।

বলা চলে দু'টি অনুমানই ভ্রান্ত। বাংলাদেশের ইতিহাসের এককেন্দ্রিক-সাম্রাজ্যিক (Unitary-Imperial) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রচলিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বাংলাদেশ অঞ্চলের রাজনৈতিক জীবনে সর্ব-ভারতীয় ভূমিকাকে অতিরঞ্জিতরূপে উপস্থাপন করে। শিলালেখসূত্রে প্রাপ্ত সাক্ষ্য এই ধারণা দেয় যে, এখন যে এলাকা নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত তার মাত্র কিছু কিছু এলাকা কোনও কোনও সময় দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল (১নং সারণি দেখুন)।

সারণি-১

বাংলাদেশের ইতিহাসের এককেন্দ্রিক-সাম্রাজ্যিক (Unitary-Imperial) ও খণ্ডিত-স্থানিক (Fragmentary-Local) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের তুলনা

কাল	এককেন্দ্রিক-সাম্রাজ্যিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ	খণ্ডিত-স্থানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ
খ্রিষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ	পরাক্রমশালী *গঙ্গাঋদ্ধি (গঙ্গারিদই)* সাম্রাজ্যের উদ্ভব	*গঙ্গাঋদ্ধির* সুনির্দিষ্ট সীমান্ত অজ্ঞাত। সাধারণত ধারণা করা হয় যে, এটি গঙ্গা ও ভাগীরথীর পূর্বে অবস্থিত ছিল। গঙ্গাঋদ্ধির পক্ষে খুব বড় একটি সাম্রাজ্য হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কাল	এককেন্দ্রিক-সাম্রাজ্যিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ	খণ্ডিত-স্থানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ
খ্রিষ্ট-পূর্ব ৩২১-১৮৫ সাল	মৌর্য সাম্রাজ্য। উত্তর বাংলায় মৌর্য দখলের স্পষ্ট প্রমাণ আছে; অন্য অঞ্চলে মৌর্য প্রভাবের পরোক্ষ প্রমাণ মেলে।	মৌর্য রাজনৈতিক আধিপত্য শুধু উত্তর বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল।
খ্রিষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দী	কুষানদের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ অঞ্চল হয়ত বা কুষান অধিকৃত ছিল।	বাংলা যে কুষান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল তার প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ নেই।
৩৩০-৬৫০ খ্রি..	বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি অংশ	উত্তর বাংলায় গুপ্ত আধিপত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে। কিন্তু পূর্ববাংলা মাঝে-মধ্যে কর দিত। এতদ্‌সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলায় (পুষ্কর) স্বাধীন রাজ্য ও কোটালিপাড়ার শিলালেখ অনুযায়ী ফরিদপুরে স্বাধীন রাজত্বের অস্তিত্ব ছিল (আনুমানিক ৫০০-৬০০ খ্রি.)।
৬০০-৬৫০ খ্রি.	শশাঙ্কের গৌড় সাম্রাজ্য	পূর্ববাংলা গৌড় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল না; ভদ্র রাজবংশের অস্তিত্ব তাই প্রমাণ করে।
৬৫০-৭৫০ খ্রি.	নৈরাজ্যের কাল	স্বাধীন খড়গ রাজবংশ পূর্ববাংলা শাসন করে (৬৫০-৭০০খ্রি.)।
৭৫০-১১৬২ খ্রি.	বিশাল উত্তর ভারতীয় পাল সাম্রাজ্য প্রায় চারশ' বছর রাজত্ব করে	পাল সাম্রাজ্য মূলত বিহার ও উত্তর বাংলার কিছু কিছু এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। ১০৪৩ থেকে ১০৭৫ খ্রি. পর্যন্ত স্বল্পকালীন অরাজক অবস্থা ব্যতীত বাংলাদেশ অঞ্চল পাল সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত ছিল। প্রথম দিককার পাল শাসকদের সমস্ত শিলালেখই বিহার থেকে জারি করা হয়েছিল। তারা যে সব ভূমি দান করেছিল সেগুলো অবস্থিত ছিল বিহার ও উত্তর বাংলার কোনও কোনও অংশে। শেষ পাল রাজা বাংলায় নয় বরং বিহারে রাজত্ব করেছেন। এগুলো স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে, পাল সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি

কাল	এককেন্দ্রিক-সাম্রাজ্যিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ	খণ্ডিত-স্থানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ
		ছিল বিহার। উপরন্তু নিম্নলিখিত সার্বভৌম রাজত্ব সম্পর্কিত শিলালেখ বাংলাদেশ অঞ্চলের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রমাণ করে: ১. খড়গ রাজবংশ, ৬৫০-৭০০ খ্রি. ২. নাথ ও রাত রাজবংশ, ৭০০-৭৫০ খ্রি. ৩.. দেব রাজবংশ, ৭৫০-৮০০ খ্রি. ৪. হরিকেল রাজবংশ, ৮০০-৯০০ খ্রি. ৫. চন্দ্র রাজবংশ, ৯০০-১০৪০ খ্রি. ৬. বর্মণ, ১০৮০-১১৫০ খ্রি. ৭. পট্টিকেরা রাজবংশ, ১০০০-১১০০ খ্রি.
১১৬০-১২০৬ খ্রি.	সেন-রা সারা বাংলায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে	সেন রাজত্ব বাংলাকে ঘিরে গড়ে ওঠে; এটি উত্তর-ভারতীয় সাম্রাজ্য ছিল না।
১২০৪-১৭৫৭ খ্রি.	বিভিন্ন রাজবংশের অধীন দিল্লি-কেন্দ্রিক মুসলমান সাম্রাজ্য বাংলা অব্দি সম্প্রসারিত ছিল	প্রায় ৫৫০ বছরের মুসলমান শাসনের মধ্যে বাংলা ২২০ বছর কার্যকরভাবে দিল্লিভিত্তিক সর্ব-ভারতীয় সাম্রাজ্য কর্তৃক শাসিত হয়। প্রায় ৩৫০ বছর বাংলা কার্যত স্বাধীন থাকে।

সূত্র : ১. এককেন্দ্রিক-সাম্রাজ্যিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, মজুমদার, (১৯৪৩)
২. খণ্ডিত-স্থানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, চৌধুরী, (১৯৬৭)।

বাংলাদেশের ইতিহাসের সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশ অঞ্চলের ঐতিহাসিক নিয়তি ছিল রাজনৈতিক খণ্ডায়ন; এ অঞ্চলে কোনও সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন শিলালেখ দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলায় স্বাধীন রাজত্বের পরম্পরার অস্তিত্ব নির্দেশ করে। এ সব স্থানীয় রাজত্বের মধ্যে রয়েছে বৈণ্যগুপ্তের রাজত্ব (৬ষ্ঠ শতাব্দী), ফরিদপুরের রাজাগণ (৬ষ্ঠ শতাব্দী), ভদ্র রাজবংশ (৬০০-৬৫০ খ্রি.), খড়গ রাজবংশ (৬৫০-৭০০ খ্রি.), নাথ ও রাত রাজবংশ (৭৫০-৮০০ খ্রি.), হরিকেলের রাজবংশ (৮০০-৯০০ খ্রি.), চন্দ্র রাজবংশ (৯০০-১০৪০ খ্রি.) বর্মণ রাজবংশ (১০৪০-১১৫০ খ্রি.) ও পট্টিকেরা রাজবংশ (১০০০-১১৫০ খ্রি.)। বাংলায় কার্যকর রাজনৈতিক ঐক্য সর্বপ্রথম মুসলমান শাসকরাই প্রতিষ্ঠা করে। এতদসত্ত্বেও মুসলমান শাসনামলের ৫৫০ বছরের মধ্যে ৩৫০ বছর বাংলা ছিল বস্তুত স্বাধীন।

সাংস্কৃতিকভাবে ভারতীয় সভ্যতার "বৃহৎ ঐতিহ্য" বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রেডফিল্ড ও সিঙ্গার উল্লেখ করেছেন যে, "পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বা 'ধ্রুপদী সাহিত্যে' মূর্ত, ধর্মবিশ্বাসে মহিমান্বিত, স্মৃতি স্তম্ভ, ভাস্কর্য, চিত্রকলা যার স্থাপত্যে পরিদৃশ্যমান, শিল্পকলা ও বিজ্ঞান দ্বারা পুষ্ট বৃহৎ ঐতিহ্য একটি দেশীয় সভ্যতার সাংস্কৃতিক মর্মস্থল (core) হয়ে ওঠে। এর নৈতিক, বিধিসংক্রান্ত, নন্দনতাত্ত্বিক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক মানদণ্ড (norm) সচেতনভাবে নির্ণয়ের উৎস হয়ে ওঠে বৃহৎ ঐতিহ্য। বৃহৎ ঐতিহ্য জীবনযাত্রা নির্ধারণ করে এবং ফলে যারা নিজেদেরকে একটি অভিন্ন সভ্যতার অংশ হিসেবে গণ্য করে তাদের ক্ষেত্রে পরস্পরকে চিনে নেয়ার একটি বাহন এবং মানদণ্ড হয়ে ওঠে" (Singer-এ উদ্ধৃত, ১৯৭২, পৃ. ৭)। তবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলায় বৃহৎ ঐতিহ্যের প্রভাব ছিল লক্ষণীয়ভাবে কম। ঐতিহাসিকভাবে এ অঞ্চল ছিল ভিন্নমত, বিধর্মী মত এবং গুহ্য ধর্মমতের লালনক্ষেত্র। এতদসত্ত্বেও এ সব মতবাদকে বৃহৎ ঐতিহ্যের কাঠামোতে ক্ষুদে সংস্কৃতি হিসেবে মেলানো হয়েছে। বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যার আধিক্য বৃহৎ ঐতিহ্যের প্রভাবকে আরও খর্ব করেছিল। এই বৃহৎ ঐতিহ্য বহিরাগত সংস্কৃতি অথবা লোক-সংস্কৃতিকে সংস্কৃতায়ন (Sanskritisation) বা স্বতন্ত্র-প্রকোষ্ঠবদ্ধকরণ-এর (Compartmentalisation) মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছিল। (সংস্কৃতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে হিন্দু ধর্ম বাইরের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে; অহিন্দু জনগোষ্ঠীকে নিম্ন-বর্ণে স্থান দিয়ে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করা হয়, বা নিম্ন বর্ণকে উচ্চতর বর্ণের মর্যাদা দেয়া হয়। স্বতন্ত্র-প্রকোষ্ঠবদ্ধকরণ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নিজস্ব জীবন ও চিন্তা পদ্ধতির অনুসারী নতুন নতুন দল ও গোষ্ঠীকে হিন্দুদের উপবর্ণ হিসেবে আত্তীকরণ করা হয়।) তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদে সংস্কৃতির সাথে ইসলামের সমন্বয় সত্ত্বেও বাংলার মুসলমানগণ পুরোপুরি ভারতের বৃহৎ ঐতিহ্যের প্রভাব বলয়ের বাইরে ছিল। তাদেরকে সংস্কৃতায়নও করা যায়নি, স্বতন্ত্র-প্রকোষ্ঠবদ্ধকরণও সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে ইসলামি পুনর্জাগরণী আন্দোলন বাংলায় মুসলমানদের বৃহৎ ইসলামি ঐতিহ্যের দিকে আকৃষ্ট করে। এই আন্দোলন শুধু ইসলামের 'ভারতীয়করণ'-কেই প্রতিরোধ করেনি, উপরন্তু বাংলায় ইসলাম থেকে লোকজ উপাদান পরিত্যাগ করতেও উদ্বুদ্ধ করে (Roy, ১৯৮৩)। ১৯৪০-এর দশকে যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে তার ভিত্তিতে রয়েছে ইসলামি পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন।

ধর্মতত্ত্ব ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে উৎসাহ জুগিয়েছে; অন্যদিকে ইতিহাস সম্পর্কে লালিত বিশ্বাস (historicism) ভূখণ্ডগত জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটিয়েছে। অতীতে কী ঘটেছে তার ভিত্তিতে লালিত ইতিহাস-বিশ্বাস গড়ে ওঠে না, বরং যে সব মতবাদ এবং ধ্যান-ধারণা আপাতদৃষ্টিতে ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত মনে হয় বলে অনুমান করা হয় তার ভিত্তিতে তা গড়ে ওঠে। লালিত ইতিহাস-বিশ্বাসের তিনটি ধারা বাংলাদেশের ভূখণ্ডগত জাতীয়তাবাদকে মূর্ত করেছে। এগুলো হচ্ছে 'দুর্দমনীয় বাংলার' গৌরব, 'সোনার বাংলার' সমৃদ্ধির স্মৃতি এবং 'মধুরতম' মাতৃভাষার প্রতি মোহগ্রস্ত অতিভক্তি।

বাংলার ইতিহাসের ধ্রুপদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রচলিত মতবাদ হল — এ দেশ সর্বদাই বিদ্রোহীদের ঘাঁটি ছিল। উত্তর-ভারতের সাম্রাজ্যের আধিপত্যকে তা বার বার অগ্রাহ্য করেছে। বলা হয় যে, এ এলাকায় বিদ্যমান অদম্য স্বাধীনতার স্পৃহা ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট। পাহাড়-পর্বত ও বন-জঙ্গল ঘেরা বাংলা ছিল নিজেই একটি বিশ্ব। তার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা আরও প্রবল হয়েছিল অসংখ্য নদ-নদীর অস্তিত্বের কারণে; বদ্বীপ এলাকায় তা জালের মতো বিস্তৃত। ফলে, বাংলা ছিল রাজনৈতিক বিদ্রোহীদের জন্য নিরাপদ স্থান; তারা বার বার বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। দুর্দমনীয় বাংলার এই ভাবমূর্তিকে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণাকে তীব্রতর করার জন্য। বাংলার এই ভাবমূর্তি অতিরঞ্জন বই কিছু নয়। প্রথমত, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কোনওক্রমেই শুধু বাংলার ক্ষেত্রে অনন্য ঘটনা নয়। দক্ষিণ এশিয়ার সমস্ত অঞ্চলেই এটি ছিল সাধারণ ঘটনা। দ্বিতীয়ত, এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে, বাংলা সর্বদাই ছিল একটি অখণ্ড রাজনৈতিক সত্তা। ঐতিহাসিক প্রমাণাদি ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলা সর্বদাই রাজনৈতিকভাবে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় বিভক্ত ছিল। বাংলা শুধু দিল্লির বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেনি, বরং নিজের ঘরেও বাংলা ছিল বিভক্ত। উত্তর ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে ঘন ঘন বিদ্রোহকে তাই বাংলার রাজনৈতিক বাস্তবতা বলে ধরে নেয়া যায় না। বাংলার নিজেরই কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ছিল না; এটিই এতদঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাস্তবতা।

উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্বত্র জাতীয়তাবাদীদের প্রিয় স্বপ্ন হচ্ছে 'সোনালী যুগ'কে ফিরিয়ে আনা। উন্নয়নশীল ও উন্নত বিশ্বের জীবন-মানের বৈষম্যে মর্মাহত হয়ে স্বল্পোন্নত সমাজের নেতৃবৃন্দ সাম্প্রতিক অতীতের অনেক আগে সুদূর অতীত সম্পর্কে তাদের লালিত ইতিহাস-বিশ্বাসের ভিত্তিতে "সোনালী যুগের" ভাবমূর্তি গড়ে তোলেন। সোনালী যুগ ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন হচ্ছে সার্বিক বঞ্চনায় জর্জরিত জাতিসমূহের আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রতিরোধ-কৌশল। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদীদের উদ্দীপনা যুগিয়েছিল 'সোনার বাংলার' স্বপ্ন। এ স্বপ্ন গড়ে ওঠেছে দুটো পূর্ব-ধারণার ভিত্তিতে। প্রথমত, স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরে নেয়া হয় যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার আগে বাংলায় নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল, অর্থাৎ সে সময় বাংলা দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক-চক্রজনিত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ-পূর্ব যুগে অন্যান্য প্রতিবেশী সমাজ থেকে বাংলা ছিল অধিকতর সমৃদ্ধ-শালী।

প্রাক-ব্রিটিশ বাংলা স্বর্গভূমি ছিল — এমন ধারণা ঐতিহাসিক উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় না (Khan, ১৯৯২)। সচরাচর-দৃষ্ট একটি প্রতিনিধিস্থানীয় প্রাক্-শিল্প সমাজ ছিল বাংলা; এর অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল ভঙ্গুর ও প্রকৃতির খামখেয়ালির কাছে অসহায়। সাধারণভাবে অনুমেয় যে, সময় সময় বাংলায় স্বল্পস্থায়ী দুঃখ-দুর্দশার কাল এসেছে; ফলে তথাকথিত সোনার বাংলায় দুর্ভিক্ষ পুরোপুরি অজানা ছিল না। উপরন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দারিদ্র্যের অনেক গভীর গহ্বর ছিল। দাস প্রথার অস্তিত্ব স্পষ্টতই ইঙ্গিত দেয় যে, দৈন্যদশা ছিল ব্যাপক। এ

অঞ্চলের বাসিন্দাদের ক্রয় ক্ষমতাও ছিল সীমিত। বাংলায় দাসদের মূল্য সম্পর্কিত প্রাপ্ত দলিলাদি হতে মনে হয় যে, প্রাক-ব্রিটিশ যুগে মজুরির হার ছিল কম। তাঁতীদের দারিদ্র্য সম্পর্কিত সংখ্যাগত ও গুণগত প্রমাণাদি দ্বারা এই অনুকল্প সমর্থিত হয়। তথাকথিত সোনার বাংলায় দৈনন্দিন লেন-দেনের সাধারণ মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহৃত হত না। সাধারণ মানুষ *কড়িতে* আয় করত ও কড়ি দিয়ে বেচা-কেনা করত। প্রধানত খাজনা পরিশোধের জন্য স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহৃত হত। বাংলায় সস্তা দাম নিয়ে যে কিংবদন্তি রয়েছে তা দ্রব্য ও সেবার অতি-সরবরাহের কারণে গড়ে ওঠেনি, বরং দ্রব্যমূল্যের স্বল্পতার কারণে সৃষ্ট হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রাক-ব্রিটিশ বাংলায় দ্রব্যমূল্যের স্বল্পতায় সাধারণ মানুষের সচ্ছলতা নয়, বরং তাদের দুর্দশাই প্রতিফলিত হয়েছে। তার মানে *সোনার বাংলা* নিখাদ স্বর্ণময় ছিল না। অবশ্য সমসাময়িক অনেক প্রাক-শিল্প সমাজের তুলনায় প্রাক-ব্রিটিশ বাংলা যে অধিক সমৃদ্ধ ছিল সে অনুকল্প প্রাপ্ত দলিলাদির ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করাও সম্ভব নয়। স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরে নেয়া যায় যে, এশিয়ার অন্য অনেক অঞ্চলের তুলনায় বাংলা ছিল অধিকতর সমৃদ্ধশালী। পানির প্রতুলতার কারণে এশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে বাংলায় খরা ছিল কম বিধ্বংসী। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে 'সোনার বাংলার' অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুমানের বিপক্ষে প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ সত্ত্বেও সোনার বাংলা সম্পর্কে লালিত ইতিহাস-বিশ্বাস বাংলাদেশীদের মনোজগতের গভীরে প্রোথিত।

রোমান্টিক জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিতে ভাষা হচ্ছে জাতীয় আত্মার প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি ভাষাকেই তার অনন্য মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে ভাষাকে জাতি সত্তার একটি মৌল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হত। এক্ষেত্রেও বিস্ময়ের কিছু নেই যে, বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ ভাষার প্রতি আবেগমণ্ডিত অনুরক্তি দ্বারা লালিত হয়েছে। জিরিং-এর (১৯৯২) মতে, "ভাষার সাথে বাঙালির যে ভালোবাসাবাসি তার সাথে জড়িত রয়েছে তীব্র অনুভূতিপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান; তা এমন আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতার জন্ম দেয় যা পৃথিবীর অন্যান্য অংশে কদাচিৎ দেখা যায়।" তিনি ভাষার প্রতি বাঙালিদের অনুরাগের অনন্যতার দু'টি কারণ নির্দেশ করেছেন। প্রথমত, একটি দরিদ্র জাতি তার জাতীয় পরিচিতির নোঙ্গর হিসেবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরবে এটিই স্বাভাবিক। সাংস্কৃতিক ঔদ্ধত্য হচ্ছে বৈষয়িক দৈন্যের প্রতিপূরক। দ্বিতীয়ত, ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়া বাংলাদেশে ভাষার প্রতি আবেগময় অনুরক্তি গড়ে তুলেছে। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, প্রতি বছর বর্ষার পানি যখন দেশের বিপুল এলাকা প্লাবিত করে ফেলে তখন জীবন স্থবির হয়ে পড়ে। এ রকম অবস্থায় "বাঙালিরা ছোট ছোট দলে গাদাগাদি করে বর্ষাকাল কাটিয়ে দেয়; অবিরাম বৃষ্টির কারণে যোগাযোগশূন্য অবস্থায় শুধুমাত্র আবৃত্তি করে আর গান গেয়ে সময় কাটায়; বৃষ্টির ক্ষান্তি আর পানি শুকিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করে।" নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, জিরিং-এর অনুকল্প বাস্তবতার একটি সরলীকৃত ব্যাখ্যা। বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা শুধু দরিদ্র ও বর্ষা-প্লাবিত গ্রামাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভাষার প্রতি আবেগ শহরাঞ্চলেই অধিকতর সরবে ঘোষিত হয়েছে; এ সব এলাকায় বর্ষার প্রভাব সীমিত।

শুধু ভাষার ভিত্তিতে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যাদানকারী তত্ত্বের তিনটি উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, পাকিস্তান আন্দোলনের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশীরা একই ধর্মাবলম্বী ও ভিন্ন ভাষাভাষী লোকজনের সাথে যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি নিজেরাই বেছে নিয়েছিল। স্পষ্টতই বলা যায়, এ অঞ্চলে ভাষা ও ধর্মের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনন্য নয়। পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষাও বাংলা। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিম বাংলার কলকাতা গত দু'শ বছর ছিল বাঙালি সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু। নোভাকের যুক্তি হল, "যদিও আজকের বাংলাদেশে এ রকম কথা বলা গর্হিত মনে হবে তবু বাস্তব সত্য হল, বাংলার উচ্চতর সাহিত্যিক ঐতিহ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রধানত হিন্দুদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে। তারা তাদের প্রদেশে য়ুরোপীয় ধাঁচে আধুনিক রাষ্ট্রের চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করেছেন" (Novak, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৩)। পরিশেষে বলতে হয় যে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অক্ষরজ্ঞানশূন্য। নিরক্ষর লোকেরা ভাষা নিয়ে আবেগাপ্লুত হবে এটি স্বাভাবিক নয়। ভাষা নিয়ে আত্মমুগ্ধতা উচ্চকোটির ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

উপরের আলোচনাদৃষ্টে বোঝা যায়, বাংলাদেশে ভূখণ্ডগত জাতীয়তাবাদের আদিকালিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অর্ধ-সত্য ও অতিকথনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের জন্ম একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এককের বিভক্তি এবং সমরূপ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বিভক্ত বাংলার কোনও অংশই বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একক দাবিদার নয়।

দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ যে ঐতিহাসিক শক্তিকে উন্মোচিত করেছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে বাংলার বিভক্তিতে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের দিকে জনমতের ঝোঁক অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। রেনান যথার্থই লক্ষ করেছেন, 'একটি জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ হচ্ছে প্রতিদিনকার গণভোট; ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের মতোই জাতির অস্তিত্ব হচ্ছে অব্যাহতভাবে জীবনের প্রতি আস্থা প্রকাশ করা' (Renan, ১৯৯৪, পৃ. ১৭)। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের জনগণ কর্তৃক ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ইসলামি জাতীয়তাবাদ একটি স্ববিরোধী অভিধা। বিভিন্ন জাতীয়তায় *'উম্মাহ'*-র বিভক্তি নয়, বরং সকল মুসলমানের সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে ইসলাম।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিকদের সামনে সবচেয়ে দুরূহ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জাতীয়-তাবাদের পরিবর্তনশীল ভিত্তির কারণে উদ্ভূত পরস্পরবিরোধিতার সমন্বয়সাধন। বাংলাদেশের স্বরূপের জটিল অনুসন্ধানে এই নাটকীয় ডিগবাজি সম্পর্কেও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভিন্নতা রয়েছে। সবচেয়ে সহজ যে ব্যাখ্যা তাতে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ *অনন্য*। কবীর যুক্তি দেখিয়েছেন, 'বাংলাদেশে ধর্ম থেকে ভাষায় এই দ্রুত পরিবর্তন হতভম্ব করার মতো ব্যাপার। গোষ্ঠীগত পরিচয়ের পরিবর্তনের এই ধরন হয়তবা অনন্য একটি ঘটনা' (Kabir, ১৯৯৪, পৃ. ২১৩)। এই অনুকল্পের সুবিধা হচ্ছে এই যে, এর জন্য কোনও প্রমাণের প্রয়োজন নেই; যাঁরা একে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে চান তাদেরই ওপর দায় বর্তায় যুক্তির মাধ্যমে একে খণ্ডন করা।

ঐতিহাসিকদের অন্য একটি ঘরানা মনে করে যে, বাংলাদেশে জাতিসত্তার বিবর্তনের ধারায় ধর্মীয় ও ভূখণ্ডগত জাতীয়তাবাদ হচ্ছে দু'টি পর্যায়। ১৯৪৭-পূর্ব জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় অথবা সাম্প্রদায়িক অথবা ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বহিরঙ্গে ঢাকা ছিল; ১৯৪৭-পরবর্তী জাতীয়তাবাদ ছিল পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক (Mallick & Husain, ১৯৯২, পৃ. ৫৫০)। এই তত্ত্ব বাংলাদেশে ধর্মীয় ও ভূখণ্ডগত আনুগত্যের পরস্পরবিরোধিতাকে অতিসরলীকৃতভাবে উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের মানুষের মনে ধর্মীয় ও ভূখণ্ডগত আনুগত্য পাশাপাশি অবস্থান করেছে। অসাম্প্রদায়িক ও ভূখণ্ডগত জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের স্থলাভিষিক্ত হয়নি, বা তাকে প্রতিস্থাপিতও করেনি; গণ-মানুষের মনোভূমি দখল করার জন্য তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।

আহমদের মতে "বাঙালিদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির মধ্যে কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে" (Ahmed, ১৯৯৪, পৃ. ১৩)। আবেগপ্রবণতা, বাহ্যিক ও প্রকাশ্য আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে আধ্যাত্ম-চেতনার প্রাধান্য, এবং সনাতন হিন্দু ধর্ম হতে বিচ্যুতিকে এ সব বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা যায়। সব বৈশিষ্ট্য কীভাবে গড়ে উঠল তার ব্যাখ্যা অবশ্য এ তত্ত্বে নেই। জাতীয়তাবাদ সর্বত্রই একটি শক্তিশালী আবেগ-জাগানিয়া শক্তি। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদকে তাই শুধু আবেগপ্রবণতার আলোকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আবেগপ্রবণতার উৎসকেও ব্যাখ্যা করা দরকার।

বিদ্যমান বিশ্লেষণসমূহে স্পষ্টভাবে বাংলাদেশে আদিকালিক জাতীয়তাবাদের সন্তোষজনক কোনও ব্যাখ্য উপস্থাপন করা হয়নি। এমন অনুকল্পও গড়ে তোলা যায় যে, বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত নয়। ফলে, বাংলাদেশে জাতিসত্তার আদিকালিক উৎসের সন্ধান অর্থহীন হয়ে পড়বে। মার্ক ব্লখ যথার্থই 'উৎসের বিগ্রহ'-এর বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। "অতি সাম্প্রতিক কালকে দূর অতীত দিয়ে ব্যাখ্যা করার উদ্যোগ স্বাভাবিকভাবেই সেই সব ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করে যারা অতীতকে তাদের গবেষণার প্রধান বিষয় করে তুলেছেন; ফলে, এ সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমাদেরকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। চরিত্রগত দিক থেকে ঐতিহাসিকদের সবচেয়ে বড় বিগ্রহ হল উৎস নিয়ে আচ্ছন্নতা" (Marc Bloc, ১৯৫৩, পৃ. ২৯)। তদুপরি, জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সর্বদা দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন এ কথাও সর্বক্ষেত্রে ঠিক নয়। ম্যাকস্ ভেবার (Max Weber, ১৯৪৮) মনে করেন যে, প্রাচ্য-দেশে সময়ের স্বল্প পরিসরেই জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটতে পারে।

বাংলাদেশে জাতিসত্তা নবীন হতে পারে কিন্তু বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের সাম্প্রতিকতা সম্পর্কে অনুকল্প ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা সমর্থিত নয়। ভূখণ্ডগত ও বহির্দেশীয় আনুগত্যের পরস্পরবিরোধিতা বাংলাদেশের আত্মপরিচয় সন্ধানে যে ডিগবাজির সৃষ্টি করেছে, তা কোনওক্রমেই নতুন নয়। বাঙালি মুসলমানের বিভক্ত ব্যক্তিত্বের সন্ধান বহুপূর্বে – চতুর্দশ শতকেই খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলায় ইসলামের প্রসার এই আত্মপরিচয়ের সংকটের জন্ম দিয়েছিল। মুসলমানরা বিশ্বাস করে পবিত্র কোরানের প্রতিটি বর্ণ আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ। পবিত্র কোরানের কোনও প্রামাণ্য

অনুবাদই স্বীকৃত নয়। ফলে কোরানকে যারা আল্লাহর বাণী হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের জন্য আল্লাহর ভাষা বোঝা আবশ্যক। বাস্তবে অবশ্য বাংলাদেশের মতো প্রান্তিক অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীরা একেবারেই আরবি জানত না। অপরদিকে, বাংলা এলাকায় স্থানীয় ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান সমীচীন বলে বিবেচিত হয়নি; কারণ, বাংলা ভাষা হিন্দুধর্মের সাংস্কৃতিক আবহে সৃষ্ট ও লালিত হয়েছিল। ফলে আশ্চর্যের কিছু নেই, গোড়ার দিককার যে সব মুসলমান লেখক বাংলা সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তাঁদের লেখায় 'হিন্দু ও হিন্দু ধর্ম' বাংলা ভাষার সমার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (শহীদুল্লাহ, ১৯৬৭, পৃ. ২৪৬)। অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেবার জন্য বাংলা ভাষার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

বাংলা ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন মুসলমান লেখক শাহ মুহম্মদ সগীর-এর লেখায় ধর্মবিশ্বাস ও বাসভূমির দাবির মধ্যে দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। সগীর ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমসাময়িক (যাঁর শাসনকাল ছিল ১৩৮৯ থেকে ১৪১৬ খ্রিষ্টাব্দ। মুসলমানী কাহিনী 'য়ুসুফ জোলেখা'-র ওপর তাঁর রচিত মহাকাব্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, লেখকগণ পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বাণী অনুবাদ করতে ভয় পায়। তিনি অবশ্য ধারণা পোষণ করতেন যে, এ ধরনের ভয় অমূলক। তিনি লিখেছেন,

> ন লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ।
> দোষিব সকল তাক ইহ ন জুয়াএ।।
> গুনিয়া দেখিলুँ আহ্মি হুই ভয় মিছা।
> ন হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা।।
> শুনিয়াছি মহাজনে কহিতে কথন।
> রতন ভাণ্ডার মধ্যে বচন সে ধন।।

(হক-এ উদ্ধৃত, ১৯৫৭, পৃ. ৫৯)।

বাংলার মধ্যযুগে মুসলমান কবিদের কবিতায় বাংলা ভাষায় লেখার জন্য কৈফিয়তের ছড়াছড়ি লক্ষ করা যায়। এ সব কৈফিয়তকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। মুসলমান লেখকদের একটি ঘরানা বাংলা ভাষার ব্যবহারকে সময়ের দাবির ভিত্তিতে সমর্থনযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুজাম্মিল বলেছেন যে, মানুষ-জন আরবি ভাষা বোঝে না বলেই তিনি বাংলায় লিখেছেন। কবি যুক্তি দেখিয়েছেন,

> আরবী ভাষায় লোকেँ ন বুঝে কারণ।
> সভানে বুঝিতে কৈলুँ পয়ার রচন।।
> যে বলে বলৌক লোকেँ করিলুँ লিখন।
> ভালে ভাল মন্দে মন্দ ন যাএ খণ্ডন।।
> রচিলেক মোজাম্মিলে পঞ্চালি সুছন্দ।
> দেশি ভাষে রচিলুং মাঝে মৃদু মন্দ।।

(হক, ১৯৫৭, পৃ. ৬৭)।

একই সুরে আব্দুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০ খ্রি.) মন্তব্য করেছেন যে, ইসলামি শিক্ষার জন্য আরবি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তিনি আরও বলেছেন, যাঁরা আরবি জানে না তাদের জন্য ফার্সি ভাষা পরবর্তী-উত্তম ভাষা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে; কিন্তু যারা দু'টির কোনওটিই জানে না, তাদের অন্তত স্বদেশী ভাষায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা উচিত (শহীদুল্লাহ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৮)। দ্বিতীয় একটি ঘরানা তুলনামূলক সুবিধার বিচারে বাংলার ব্যবহারকে সমর্থন করে। সয়িদ সুলতান (আনুমানিক ১৫৫০-১৬৪৮ খ্রি.) ও শেখ মুত্তলিব (১৫৯৫-১৬৬০ খ্রি.) উভয়েই এ ধরনের যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। শেখ মুত্তলিব লিখেছেন,

''আরবীতে সকলে ন বুঝে ভাল মন্দ।
তেকারণে দেশী ভাষে রচিলু প্রবন্ধ।।
মুসলমানী শাস্ত্রে কথা বাঙ্গালা করিলু।
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু।।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছয়ে মনান্তরে।
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে।।
মুমীনেব আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক।
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ খেমিবেক।।
এসব জানিয়া যদি করয়ে রক্ষণ।
তবে সে মোহোরে পাপ হইবে মোচন।।

(হক-এ উদ্ধৃত, ১৯৫৭, পৃ. ১৯৮)।

সয়িদ সুলতানও একই ধরনের যুক্তি দিয়েছেন; কিন্তু বাংলার লেখার কারণে গোঁড়া মুসলমানরা তাকে 'মুনাফিক' বলে সমালোচনা করে (হক, ১৯৫৭, পৃ. ১৬১)। তৃতীয় ঘরানাটি জোরে-শোরে দাবি করে যে, আল্লাহ সব ভাষাই বোঝেন; তাই বাংলার ভাষা ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিম যুক্তি দেখিয়েছেন,

যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।।
সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী।
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যতি ইতি বাণী।।
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন।
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবের গণ।।

এ যুক্তি অনুসরণ করে তিনি গর্বভরে দাবি করেছেন,

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।।

মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।
(হক-এ উদ্ধৃত, ১৯৫৭, পৃ. ২০৫-২০৬)।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, মুহম্মদ ফসীহ-র (সপ্তদশ শতাব্দী) মতো কিছু লেখক আরবি হরফে বাংলা লিখেছেন। তাঁদের আশা ছিল এটি আল্লাহতালার কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে (হক, ১৯৫৭, পৃ. ২১৫)। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা নিবন্ধ '*মাকতুল হুসাইন*' আরবি হরফে লেখা হয়েছিল।

বাংলা-ব্যবহারকারী বিভিন্ন ধরনের কৈফিয়তের মধ্যে গত ছয়শ' বছর যাবত বাঙালি মুসলমানদের মনে বাসভূমির প্রতি আনুগত্য ও ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও গভীরতা প্রতিভাত হয়েছে। বাংলাদেশের জাতিসত্তার ভিত্তিমূলে এই যে পরস্পরবিরোধী পরিবর্তন তাতে অভিনবত্ব কিছু নেই; এগুলোর শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত তার অতীতে। ধর্ম ও ভাষার পরস্পরবিরোধিতা অবশ্য শুধু বাংলাদেশের মুসলমানদের ক্ষেত্রেই অনন্য নয়; বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অ-আরব (non-Arab) মুসলমানদের মধ্যে একই ধরনের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের বিদ্যমান সাহিত্যে শুধু বাংলার মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই অবহেলিত হয়নি, তার অতীতের আরও দু'টি উল্লেখযোগ্য দিকও উপেক্ষিত হয়েছে। প্রথমত, যে এলাকা নিয়ে আজকের বাংলাদেশ গঠিত তা উত্তর ভারতের অন্যান্য এলাকার মতো পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যের পীঠস্থান ছিল না। স্থানীয় উদ্যোগে বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ অঞ্চলে ছিল অপরিচিত; মাঝে-মধ্যে বাহির থেকে তা চাপিয়ে দেয়া হত। বাইরের সাময়িক সাহায্য-সমর্থন ফুরিয়ে গেলে তা ভেঙ্গে পড়ত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিধারা প্রতিবেশী বিহার ও আসাম থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ধারায় বিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীনকালে বিহার নন্দ, মৌর্য, গুপ্ত ও পালদের বিপুল সাম্রাজ্যের উত্থান প্রত্যক্ষ করেছে। আসামে সমরবাদী অহম শাসকরা একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল; সে সাম্রাজ্য প্রায় ছ'শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়েছিল (ত্রয়োদশ হতে উনবিংশ শতাব্দী)। একইভাবে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল তাদের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশাল সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটেছে। প্রতিতুলনায়, বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় রাজনৈতিক সত্তা সবসময়ই ছিল ক্ষুদ্র ও স্বল্পায়ু।

দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ এশিয়ার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সমুদ্রের মধ্যে বাংলাদেশ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের একটি দ্বীপ। উত্তর পশ্চিম ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তর ইসলামি বিশ্বের সীমান্তে। বাংলাদেশের চারিদিকে মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য। ১৯৯১ সালের আদম শুমারিমূলে দেখা যায় যে, বিহার ও ওড়িশা এবং আসামের মুসলমান জনসংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ১০.৬ ও ২৮.১ ভাগ (২নং সারণী দেখুন)। বাংলায় ইসলাম কীভাবে প্রসার লাভ করেছে তাকে প্রাধান্য দিয়েছে প্রথাগত ইতিহাস চর্চা। কিন্তু এলাকাভেদে ধর্মান্তরণের সাফল্য কেন ভিন্ন হয়েছে তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এ সব গবেষণা ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে।

সারণি - ২

ভারতের মুসলমান জনসংখ্যার প্রদেশভিত্তিক শতকরা হার (১৯১১)

	অঞ্চল	মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা হার
১.	ভারত	২১.০%
২.	আজমীর-মারওয়ার	১৬.১%
৩.	আসাম	২৮.১%
৪.	বেলুচিস্থান	৯১.০%
৫.	বাংলা	৫২.৭%
	ক. পশ্চিম বাংলা	১৩.৪%
	খ. মধ্য বাংলা	৪৮.৮%
	গ. উত্তর বাংলা	৫৯.০%
	ঘ. পূর্ব বাংলা	৬৮.৮%
৬.	বিহার ও ওড়িশা	১০.৬%
৭.	বোম্বাই	২০.৪%
৮.	মধ্য প্রদেশ ও বেরার	১৮.৯%
৯.	কোর্গ	৭.৪%
১০	মাদ্রাজ	০.৭%
১১	উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৯২.৮%
১২	পাঞ্জাব	৫৪.৮%
১৩	আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশ	১৪.০%

উৎস : C.H.গেইট, Census of India, ১৯১১, ১ম খণ্ড।

বাংলাদেশের ইতিহাসের বিদ্যমান সাহিত্যে দু'টি প্রধান দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। প্রথমত, ভারতের ইতিহাসের অখণ্ডতা সম্পর্কে অকথিত পূর্ব-ধারণার কারণে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক ভিন্নতা অবহেলিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, তুলনামূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সম্ভাবনার প্রতি ঐতিহাসিকবৃন্দ সাধারণভাবে উদাসীন থেকেছেন। বাংলাদেশের ঐতিহাসিকদের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি করে সত্য। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জীবনধারার তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের ব্যর্থতার কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসের অনন্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চরম শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে এই ঘাটতি পূরণ করা দরকার। ঐতিহাসিক পরিবর্তনের তুলনামূলক বিশ্লেষণের একজন প্রবক্তা যথার্থই বলেছেন, "স্পষ্ট করেই বলা যায়, ইতিহাস এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা শুধুমাত্র পেশাজীবী ঐতিহাসিকদের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না" (Lorwin, ১৯৬৫, পৃ. ৬০৩)।

দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহাসিকগণ বড় বড় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র নিয়ে মগ্ন থেকেছেন; ফলে, তৃণমূল প্রতিষ্ঠানকে তাঁরা পুরোপুরি উপেক্ষা করেছেন। সামষ্টিক (Macro) ইতিহাসের জন্য কোনও ব্যষ্টিক (Micro) ভিত্তি তৈরি হয়নি। বার্টন স্টাইন দাক্ষিণাত্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা সমভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও

প্রযোজ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে শুধু সরকারের দু'টি স্তর আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। একদিক "নিজস্ব সৈন্যদল ও নিজস্ব আমলাতান্ত্রিক সংগঠন নিয়ে রাজা; আরেক দিকে স্থানীয় স্তরের সংগঠন। এই দু'স্তরের মধ্যকার সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে অত্যন্ত ভাসা-ভাসাভাবে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ছিল অনুমানের বিষয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ সংযোগকে পুরোপুরি অগ্রাহ্যই করা হয়েছে" (Burton Stein, ১৯৯৪, পৃ. ২৫৫)।

বক্ষমাণ সমীক্ষাটিতে বাংলাদেশের ইতিহাসের অনুপস্থিত এই পরিপ্রেক্ষিতের ঘাটতি পূরণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ-গঠনকারী এলাকা এবং বাংলাদেশ-সমীপবর্তী দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এ ঘাটতি মেটানো হবে। এই সমীক্ষার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, বাংলাদেশের আত্মপরিচয় এমন একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক আবহে লালিত হয়েছে যা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে যে আত্মপরিচয়ের সংকট প্রকাশ পেয়েছে তা কোনওক্রমেই অভিনব নয়। উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় এতদঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব ছিল সর্বদাই দুর্বল। মজার ব্যাপার হল, বাংলাদেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা একে যেমন একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করেছে তেমনি এটি তার সুনির্দিষ্ট আত্মপরিচয়ের প্রকাশকেও বিঘ্নিত করেছে।

যদিও বাংলাদেশ সুচিহ্নিত কোনও প্রাকৃতিক অঞ্চল নয়,[১] তবু প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি আলাদা অঞ্চলের মূলভাগ দখল করে আছে এ দেশটি। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এ অঞ্চলে তৃণমূল ও সামষ্টিক স্তরে প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল দুর্বল। চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তিকে গ্রাস করেছিল। এ অঞ্চলে জীবনযাত্রা প্রভাবিত ছিল এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার স্ববিরোধিতায় (isolation paradox)। কারণ গোষ্ঠীর চাইতে বিচ্ছিন্নভাবে একা উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অধিকতর লাভবান হত এ এলাকার বাসিন্দারা। ঐতিহাসিক কাল থেকেই বাংলা অঞ্চলে গ্রামের কাঠামোতে সুনির্দিষ্ট ধরন লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশ অঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকায়ই গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল শুধু সামাজিক সত্তা; প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা ছিল অত্যন্ত দুর্বল।

বক্ষমাণ সমীক্ষাটিতে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক — এ দু'স্তরের বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ব্যষ্টিক স্তরে স্থানীয় পর্যায়ের তৃণমূল প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশ অঞ্চলের সাম্প্রতিক ও অতীতকালীন গ্রামীণ-বসতির একটি জরিপ তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ের বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রথাগত ঐতিহাসিক পদ্ধতি থেকে ভিন্নতর। উল্টোদিক থেকে ইতিহাস শুরু করা হয়েছে এখানে; বাংলাদেশের গ্রামের বর্তমান চিত্র উপস্থাপন করে তার আলোকে অতীতকে

---

[১] বক্ষ্যমাণ সমীক্ষাটিতে বাংলা বলতে ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলা প্রদেশ বোঝানো হয়েছে। বাংলা অঞ্চল বলতে প্রাকৃতিক সীমান্ত দ্বারা বিভক্ত একটি সুস্পষ্ট ভৌগোলিক এলাকা (চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত) বোঝানো হয়েছে। বাংলা অঞ্চলে বাংলাদেশ-অঞ্চল বলতে সে সব এলাকাকে নির্দেশ করা হয়েছে যা মোটামুটিভাবে বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল দুর্বল। বাংলাদেশ বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বোঝানো হয়েছে)।

অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। মার্ক ব্লখের অনুসরণে (Bloch, ১৯৫৩) এই পদ্ধতির পক্ষে দু'টি যুক্তি দেয়া যেতে পারে। প্রথমত, সমস্ত গবেষণারই স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা হচ্ছে সবচেয়ে ভালোভাবে অনুধাবিত (বা সবচেয়ে কম দুর্বোধ্য) বিষয় থেকে সবচেয়ে অস্পষ্ট বিষয়ে। দ্বিতীয়ত, মার্ক ব্লখ যথার্থই লক্ষ করেছেন, "এখানে, এ মুহূর্তে, তাৎক্ষণিকভাবে মানব জীবনের যে স্পন্দন লক্ষ করা যায় তাকে শুধু কল্পনার বিশাল প্রয়াসই প্রাচীন পুঁথিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে"।

বাংলাদেশ অঞ্চলে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণ দিয়ে সমীক্ষাটির সূচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতি-কাঠামোর পরিমাণ ও গুণগত প্রমাণাদির জরিপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ অঞ্চল ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের গ্রামের তুলনামূলক আলোচনা ইঙ্গিত দেয় যে, উপমহাদেশের অধিকাংশ এলাকার তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার (corporateness) তুলনায় সাধারণভাবে বাংলাদেশের গ্রামের সংঘবদ্ধতার মাত্রা ছিল কম। বাংলাদেশ অঞ্চলের তৃণমূল প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা প্রচণ্ড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ লালন করেছে, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য তা ছিল প্রতিকূল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, গ্রামীণ বসতির নির্ণায়ক সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়েছে। সেই সাথে 'উন্মুক্ত' ও 'প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ' (Corporate) গ্রাম সম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব খতিয়ে দেখা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ অঞ্চলের গ্রামীণ বসতি কাঠামোর অনন্যতা মুখ্যত অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির আলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ অঞ্চলে তৃণমূল প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার সাথে রাজনৈতিক খণ্ডায়ন, অস্থিতিশীলতা, মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্য, চাঁদাবাজি ও উপদলীয় কোন্দলের যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। এতদঞ্চলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার পেছনে যা ক্রিয়াশীল তা হচ্ছে তৃণমূল প্রতিষ্ঠানের অভাব।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে ইসলামের অনন্য সাফল্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিদ্যমান সাহিত্যে বাংলাদেশ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরণের তুলনামূলক সাফল্যের কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়নি। আমাদের অনুকল্প হল, এতদঞ্চলের গ্রামীণ বসতির প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা একটি বহির্দেশীয় ধর্ম-মত প্রসারের জন্য অনুকূল ছিল। অন্য কথায়, যে সব এলাকায় গ্রাম সংগঠন শক্তিশালী ছিল সেখানেই ইসলামে ধর্মান্তরণ বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামের প্রসারের ফলে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে স্থানীয় ও বহির্দেশীয় আনুগত্যের যে টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ধর্মবিশ্বাস ও স্থানীয় সংস্কৃতির দ্বন্দ্বের পরস্পর-বিরোধিতা কীভাবে জোরদার হয়েছে তা-ও বর্ণনা করা হয়েছে। এতদঞ্চলে জাতিসত্তার সাম্প্রতিক ঘন ঘন মোড় পরিবর্তনের সাধারণ একটি ব্যাখ্যা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ ইঙ্গিত দেয় যে, শুধু উচ্চকোটির ব্যক্তিদের জারি-

জুরি হিসেবে বাংলাদেশের জাতিসত্তাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না; 'আদিকালিক' ও 'হাতিয়ার-স্বরূপ' এবং বিভিন্ন উপাদান এই জাতিসত্তার বাস্তবতাকে গড়ে তুলেছে।

উপসংহারে এই সমীক্ষার প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় একটি সুনির্দিষ্ট একক ছিল। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা এবং ফলে সামাজিক জীবনে ব্যক্তি-মানুষের প্রাধান্য যদিও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক ছিল, তবু তা ভ্রষ্টাচার, ভিন্নমত এবং বিদেশি ধর্মমত প্রসারকে উৎসাহিত করেছে এবং তার সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। এতদঞ্চলের ব্যষ্টিক প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণ তার ঐতিহাসিক বিবর্তনের উপলব্ধির জন্য অতি প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই উপলব্ধির আলোকে শুধু অতীতের প্রতিষ্ঠানসমূহই নয়, বর্তমানের নীতিসমূহও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আশা করা যায় যে, অতীতের অভিজ্ঞান বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারকদের অধিকতর বিচক্ষণ করবে।

অধ্যায় ১

গ্রামীণ বসতির গড়নের বিশ্লেষণ

ঐতিহাসিক কাল থেকেই আজকের বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহে অধিকাংশ মানুষ (১৯০১ সালে শতকরা ৯৭.৭ এবং ১৯৯০ সালে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ) গ্রামীণ বসতিতে বসবাস করেছে। ফলে বাংলাদেশের সত্যিকারের ইতিহাস আলো-ঝলমল রাজ-দরবারে সংঘটিত হয়নি, বরং দূরে দূরে অবস্থিত আটপৌরে লোকালয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে। গ্রামীণ বসতির গতি-প্রকৃতির যথার্থ অনুধাবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে বাংলাদেশের সমাজকে উপলব্ধির চাবিকাঠি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, বাংলা অঞ্চলের গ্রাম-সমাজ সম্পর্কিত প্রচলিত ধ্যান-ধারণা গ্রামীণ বসতির প্রকৃতি ও কাঠামো সম্পর্কে কোনও স্বতন্ত্র গবেষণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, বরং তা গড়ে উঠেছে ভারতীয় গ্রাম-সমাজের ওপর বিভিন্ন প্রজন্মের পণ্ডিতদের উপলব্ধি ও পূর্ব-ধারণার ওপর। ধরে নেয়া হয় যে, দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের গ্রাম-সমাজ ও বাংলার গ্রামীণ বসতি এক ও অভিন্ন। এই অনুমান শুধু ভ্রান্তই নয়, বিভ্রান্তিকরও বটে। এ-সব পূর্ব-অনুমান এতদঞ্চলের সামাজিক জীবনের গতি-প্রকৃতির সঠিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিকবৃন্দ কর্তৃক দক্ষিণ এশিয়ার গ্রাম-সমাজের সর্বব্যাপিতা এবং এর সর্বজনীনতাকে বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া গ্রহণ মোটেও বিস্ময়কর নয়। গত দু'শ বছর ধরে প্রশাসক ও পণ্ডিতকুলের ঐকমত্যের ওপর ভারতীয় গ্রাম-সমাজের ধ্যান-ধারণার প্রচলিত আদলটি গড়ে উঠেছে। ১৮১২ সালের *Fifth Report of the Select Committee of the East India Company* গ্রাম-সমাজকে সরল প্রকৃতির 'পৌর সরকার' হিসেবে বর্ণনা করেছে; বলা হয়েছে "এ সব সরকারের আওতায় আবহমান কাল ধরে জনসাধারণ বসবাস করছে" (Dutt-এ উদ্ধৃত, ১৯৬০, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫)। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের একজন সদস্য – চার্লস্ মেট্‌কাফ তাঁর ১৮৩০ সালের বিখ্যাত কার্য-বিবরণীতে ভাবাবেগ নিয়ে গ্রাম-সমাজের ভূমিকা উপস্থাপন করেছেন। মেট্‌কাফের বর্ণনা মতে "গ্রাম-সমাজ হচ্ছে ছোট ছোট প্রজাতন্ত্র; নিজেদের যা প্রয়োজন তার প্রায় সবই তাদের আছে; বলা চলে যে, বাইরের যোগাযোগ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। অন্য কিছু যেখানে স্থায়ী নয় সেখানে শুধু এ প্রতিষ্ঠানগুলোই টিকে থেকেছে" (Dutt, ১৯৬০, খণ্ড ১, পৃ. ২৭৫)। ব্রিটিশ প্রশাসকবৃন্দ কর্তৃক শান্তির নীড় হিসেবে গ্রাম-সমাজের এই বর্ণনা উনবিংশ শতাব্দীর বিবর্তনবাদীদের প্রভাবিত করেছিল। বিবর্তনবাদীদের মতে প্রাচীন ভারতীয় গ্রাম-সমাজ পৃথিবীর সকল দেশের গ্রাম-সমাজের আদিরূপ। একইভাবে, ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে কার্ল মার্কস্-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রচিত। তাঁর মতে এ সব স্বপ্ন-

সুখাচ্ছন্ন পল্লী সমাজ "সর্বদাই প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি ছিল" (Marx & Engels, ১৯৬২, পৃ. ৩৫০)। পল্লী সমাজের আদর্শায়িত ও স্বপ্নরাজ্যের চিত্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদেরও উদ্দীপিত করেছে; তাঁদের বিশ্বাস ছিল ভারতের সর্বব্যাপী দারিদ্র্যের সমাধান হচ্ছে প্রাচীন গ্রাম-সমাজে প্রত্যাবর্তন। বলতে গেলে এ বিষয়ে কোনও ভিন্নমত শোনাই যায়নি।

দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণা ভারতীয় গ্রাম সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার দু'টি সীমাবদ্ধতা বিশেষভাবে তুলে ধরেছে। প্রথমত, একথা ধরে নেয়া ঠিক নয় যে, উপমহাদেশের সর্বত্র গ্রাম একই ধরনের। বাস্তবে দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামীণ বসতি-কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক ভিন্নতা ছিল। প্রায় একশ বছর আগে বেডেন-পাওয়েল সতর্কবাণী উচ্চারণ করে লিখেছেন, "ভারতীয় পল্লী-সমাজের সকল লক্ষণকে কোনও একটি বিশেষ তত্ত্ব দ্বারা বা সাধারণীকৃত কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা সম্ভব নয়।" এখন পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামীণ বসতির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করার কোনও সুসম্বদ্ধ উদ্যোগ নেয়া হয়নি বললেই চলে।

দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিককালে পণ্ডিতদের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার স্বপ্নসুখাচ্ছন্ন পল্লী-সমাজের গতানুগতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিপরীতে সংশোধনবাদী ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছে। কোনও কোনও পণ্ডিত মত পোষণ করেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতে পল্লী সমাজ কোনওক্রমেই একটি সাধারণ লক্ষণ ছিল না। গ্রাম সমাজের অস্তিত্ব দিল্লি ও আগ্রার মধ্যবর্তী ছোট একটি এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল; মোগল শাসনের শেষের দিকে পার্শ্ববর্তী মরুভূমি এলাকার আক্রমণকারীদের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য সেখানে প্রতিরক্ষা-সংগঠনের প্রয়োজন ছিল। ডেনিয়েল থর্নার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কার্ল মার্কস্ বর্ণিত দক্ষিণ এশিয়ার গ্রাম-সমাজের সাধারণ গ্রাম সমাজ "সম্ভবত ছিল একটা ব্যতিক্রম" (Daniel Thorner, ১৯৬৬)। কোনও কোনও পণ্ডিত গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ সত্তার ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন; ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনে গ্রাম কোনও অর্থবহ একক কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন করা হয়েছে। ডুমন্ট ও পকক্ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ভারতে গ্রাম শুধুমাত্র স্থাপত্যগত ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সত্তা; গ্রাম "মুখ্য সামাজিক বাস্তবতা নয়" (Dumont & Pocock, ১৯৫৭)। এমনকি যারা গ্রামকে একটি পরম্পরাবদ্ধ-সমাজ বলে স্বীকার করেন তাঁরাও এ ব্যাপারে একমত যে, দক্ষিণ এশিয়ার স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লী-সমাজের চিত্রটি অতিরঞ্জিত (Srinivas, ১৯৮৭)।

দক্ষিণ এশিয়ার পল্লী-সমাজ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা-কাঠামোর সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতি – যা গ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত, তার কাঠামো পুনঃপরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে মূল সমস্যাটি হচ্ছে এতদঞ্চলের গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রতুলতা। ফলে, অতীতের গ্রামের চিত্র পুনর্নির্মাণ করার উদ্যোগ নেয়ার চাইতে বর্তমানের গ্রামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে শুরু করাই অধিকতর সুবিধাজনক।

বাংলাদেশের গ্রামের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এর সঠিক সংখ্যা আজও যেমন জানা নেই, সাম্প্রতিক অতীতেও তা জানা ছিল না । ৩নং সারণিতে ১৮৯১-১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে বাংলাদেশের গ্রাম সম্পর্কে আদমশুমারি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৩

বাংলাদেশের গ্রামের সংখ্যা, ১৮৯১-১৯৯১

সাল	গ্রামের মোট সংখ্যা	মোট আয়তন (বর্গমাইলে)	প্রতি বর্গমাইলে গড় গ্রাম সংখ্যা
১৮৯১	৭৮,৯১২	৫০,৮২৪	১.৩৪
১৯০১	৮৫,০৩৯	৪৮,৭০০	১.৭৪
১৯১১	৯১,২২১	৫৪,৫১৫	১.৬৭
১৯২১	৬০,৪৬৪	৫২,৪১১	১.১৫
১৯৩১	৬৪,৫৭৫	৫৩,৫০২	১.১৮
১৯৪১	৫৯,৩৯৩	৫৪,০৯১	১.০৯
১৯৫১	৬১,৪২৪	৫৪,১৪১	১.১৩
১৯৬১	৬৪,৪৯৩	৫৫,১২৬	১.১৭
১৯৭৪	৬৮,৩৮৫	৫৫,৫৯৮	১.২৩
১৯৮১	৮৩,৬৬৬	৫৬,৯৭৭	১.৪৬
১৯৯১	৮৬,০৩৮	৫৬,৯৭৭	১.৫১

সূত্র : বাংলা ও বাংলাদেশ সরকারের আদমশুমারি।

সারণি-৩ এ উপস্থাপিত গ্রাম সম্পর্কিত উপাত্তে কতগুলো অসামঞ্জস্য রয়েছে। লক্ষণীয়, কোনও কারণ ছাড়াই মোট গ্রামের সংখ্যায় ওঠানামা দেখা গেছে। সারণি-৩ হতে দেখা যায় যে, ১৮৯১ সালের গ্রামের মোট সংখ্যা ছিল ৭৮,৯১২; তা ১৯১১ সালে ৯১,২২১-তে উন্নীত হয়েছে। ১৯২১ সালে তা হঠাৎ করেই ৬০,৪৬৪-তে নেমে আসে। ১৯৩১ সালে আবার তা আবার ৬৪,৫৭৫-তে উন্নীত হয়। ১৯৪১ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ৫৯,৩৯৩-তে। সংশ্লিষ্ট সময়ে জনসংখ্যার অব্যাহত বৃদ্ধির সাথে এ ধরনের হ্রাসবৃদ্ধি কোনওক্রমেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় (সারণি-৪ দেখুন)।

সারণি-৪

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ১৮৯১-১৯৮১

সাল	মোট জনসংখ্যা (হাজারে)	প্রতি গ্রামের গড় লোকসংখ্যা
১৮৯১	২৬,৮১১	৩৪০.৬
১৯০১	২৮,৯২০	৩৪০.০
১৯১১	৩১,৫৫০	৩৪৫.৮
১৯২১	৩৩,২৫০	৫৪৮.০
১৯৩১	৩৫,৬০০	৫৬০.০
১৯৪১	৪১,৯৯৬	৭০৬.০
১৯৫১	৪১,৯৩২	৬৮২.০
১৯৬১	৫০,৮৪১	৭৮৮.০
১৯৭১	৭৯,৪৭৯	১১৬২.০
১৯৮১	৮৯,৯০০	১০৭৪.৫
১৯৯১	১১১,৫০০	১২৯৫.৯

সূত্র : বাংলা ও বাংলাদেশ সরকারের শুমারি প্রতিবেদন।

১৯৪১-৫১-এর দশক ছাড়া ১৮৯১-১৯৯১ সালের পরিসরে জনসংখ্যা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; অন্যদিকে গ্রামের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। মোট আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা গ্রামের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করা যায় না। অব্যাহত সিকস্তি ও পয়োস্তির কারণে বাংলাদেশের মতো একটি বদ্বীপ অঞ্চলের মোট আয়তন সবসময় স্থির থাকেনি। তদুপরি, ভূমি জরিপের (cadastral survey) ভিত্তিতে কোনও কোনও জেলার প্রকৃত আয়তনের প্রাক্কলনে হেরফের ঘটার কারণে বাংলাদেশের পুরো আয়তনের প্রাক্কলনেও ভিন্নতা ঘটেছে। এই হেরফের যাচাই করার জন্য ১৮৯১-১৯৯১ সালের পরিসরে প্রতি বর্গমাইলে গড় গ্রামের সংখ্যা সারণি-৩ এ সংকলন করা হয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে, ১৯০১ সালে প্রতি বর্গমাইলে গড় গ্রামের সংখ্যা ১.৭৪ থেকে ১৯৯১ সালে ১.৫১-এ হ্রাস পেয়েছে। প্রতি বর্গমাইলে গ্রামের সংখ্যা গড়ে কমে যাওয়ার কোনও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলে না।

এক শুমারি থেকে অন্য শুমারিতে গ্রামের সংখ্যার এই হেরফেরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে গ্রামের সংজ্ঞার ঘন ঘন পরিবর্তন। ১৮৭২ সালের জরিপের পর থেকে বার বারই গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে যে, উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের গ্রাম ভিন্নতর। বাংলাদেশের গ্রাম সংজ্ঞায়িত করার ব্যাপারে উদ্ভূত সমস্যাকে *১৯০১-এর আদম শুমারি প্রতিবেদনে* নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

> ''একটি গ্রাম আলাদা নাম-সম্বলিত কতগুলো বাড়ীর সমাহার হতে পারে, অথবা তা মৌজাও হতে পারে। মৌজা মানে জরিপের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এলাকা-যাকে গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মৌজার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট এককের সুবিধা বর্তমান; জরিপের সময় যে সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে তা যদি জানা থাকে তবে তার সম্পর্কে কোন সন্দেহ করার অবকাশ থাকে না। কিন্তু বর্তমানে তা কোনওক্রমেই আবাসিক গ্রামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কোনও একটি গ্রাম হয়ত দুই মৌজায় সম্প্রসারিত হয়ে পড়েছে, অথবা একই মৌজায় হয়ত দু'টি গ্রাম অবস্থিত; আবার কোনও কোনওটি হয়ত পুরোপুরি বসতিশূন্য। অন্যদিকে, জরিপের একক যদি অগ্রাহ্য করা হয় তবে সুনির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল কী নিয়ে গ্রাম গঠিত। অনেক বাড়ীগুচ্ছ আছে যাকে কেউ কেউ হয়ত একটি পৃথক গ্রাম বলছে, অন্য কেউ হয়ত তাকে অন্য গ্রামের পার্শ্ববর্তী অংশ হিসেবে ধরে নিচ্ছে। বাংলায় রাজস্ব জরিপের রেকর্ড হালনাগাদ সংরক্ষিত হয়নি, এবং অধিকাংশ জেলায় জরিপ-মৌজা এখন আর স্পষ্টভাবে খুঁজেও পাওয়া যায় না। ফলে, এই জরিপের ক্ষেত্রে একটি গ্রামকে সাধারণভাবে আবাসিক গ্রাম — তার মানে নির্ভরশীল পাড়াসহ আলাদা নামে চিহ্নিত বাড়ী-গুচ্ছ বলে ধরা হয়েছে''।

বাংলাদেশে গ্রাম সম্পর্কে তিন ধরনের ধারণা বিদ্যমান; যথা, জরিপের গ্রাম বা মৌজা, 'স্থানীয়' গ্রাম এবং আদমশুমারির গ্রাম। মৌজা হচ্ছে একটি কৃত্রিম একক; তফসিলভুক্তি জরিপের উদ্দেশ্যে তা সৃষ্ট হয়েছিল। দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, যশোর জেলায় আলাদা আলাদা ভূস্বামীর মালিকানাধীন জমিজমাকে (অর্থাৎ তালুক) একেকটি আলাদা মৌজা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল। এই পদ্ধতি বিহারের জরিপের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়েছিল। পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোর ক্ষেত্রে তা বর্জন করা হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলায় মৌজা হচ্ছে

একটি অবিভক্ত জমি (block) যা জরিপ করা সুবিধাজনক। ফলে, একটি মৌজার সীমানা চিহ্নিত করার জন্য একটি ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক চৌহদ্দী বিবেচনা করা হয়েছে; পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে মৌজা এবং স্থানীয় গ্রামের মধ্যে নিগূঢ় সহ-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আনশফতর Survey and Settlement Manual-এ (১৯৩৬, পৃ. ৩০৭) বলা হয়েছে যে, নতুন গ্রামের এলাকা "স্থানীয়ভাবে-স্বীকৃত চৌহদ্দী অনুসারে" নির্ধারণ করা উচিত। মৌজার মতো স্থানীয় গ্রাম সব সময় ভূখণ্ডের দিক থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ একক না-ও হতে পারে। মানচিত্রে সহজে তা চিহ্নিত করা না-ও যেতে পারে। স্থানীয় গ্রাম হচ্ছে একটি মানসিক সত্তা। বাইরের একজন লোকের পক্ষে একটি গ্রামকে চিহ্নিত করা অত্যন্ত কঠিন। শুধু একটি গ্রামের বাসিন্দাদেরই সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে কোনটি তাদের নিজেদের গ্রাম। গ্রামের সংজ্ঞা অবশ্য বিভিন্ন সময়ে বদলে গেছে। গোড়ার দিকে স্থানীয় গ্রামকে আদমশুমারির গ্রাম হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিল। ১৯২১ সালে গ্রামের সংজ্ঞা বদলে যায়। এ আদমশুমারিতে বসতিপূর্ণ গ্রামীণ মৌজাকে গ্রাম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। সংজ্ঞার এই পরিবর্তনের কারণে গ্রামের সংখ্যা ১৯১১ সালের ৯১,২২১ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯২১ সালে ৬০,৬৫৪-তে দাঁড়ায়। ১৯৭৪ সাল-পরবর্তী শুমারিগুলোতে গ্রামীণ মৌজাকে গ্রাম বলে ধরে নেয়া হয়েছে। সে জন্য ১৯২১ সালের পর থেকে গ্রামের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি শুধু শুমারি গ্রামের সংজ্ঞার পরিবর্তন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে, পূর্বেকার শুমারিগুলো ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং উপমহাদেশের বিভক্তির পর যে সব শুমারি পরিচালিত হয়েছে তার ফলাফল অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কারণ, ১৯৫১ সালের শুমারির পর থেকে গ্রামের সংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, জেলাভিত্তিক উপাত্ত আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করলে তার কোনও সামঞ্জস্যপূর্ণ ধরন লক্ষ করা যায় না। কিছু জেলায় জনসংখ্যার অব্যাহত বৃদ্ধি সত্ত্বেও কোনও কোনও সময় গ্রামের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সাম্প্রতিক শুমারিগুলোতে গ্রাম সম্পর্কিত উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য একটি জেলার গ্রামের সংখ্যার শতকরা পরিবর্তনের সাথে জনসংখ্যার শতকরা হার এবং সে জেলার আয়তনের শতকরা হারের পরিবর্তনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যদি গ্রামবিষয়ক পরিসংখ্যান নির্ভরযোগ্য হয় তবে জেলার গ্রামের সংখ্যার পরিবর্তনের শতকরা হারের সাথে জনসংখ্যার পরিবর্তনের শতকরা হারের উল্লেখযোগ্য ধনাত্মক সহ-সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে। একইভাবে গ্রামের সংখ্যার পরিবর্তনের শতকরা হার এবং জেলার আয়তনের পরিবর্তনের শতকরা হারের সম্পর্কও ধনাত্মক হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

গ্রামের সংখ্যার শতকরা হারের পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট জেলার জনসংখ্যার শতকরা হারের পরিবর্তনের সহ-সম্বন্ধ যদিও ধনাত্মক, ১৯৫১-'৬১ সালের পরিসরে তা পরিসংখ্যানগতভাবে গুরুত্বহীন। ১৯৬১-'৭৪ সালের পরিসরে এই সহ-সম্বন্ধ ঋণাত্মক। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যে সব জেলায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি-হার উচ্চ ছিল সে-সব জেলায় গ্রামের সংখ্যা-বৃদ্ধির হার ছিল নিম্ন। জনসংখ্যার হার-বৃদ্ধি ও গ্রামের সংখ্যা-বৃদ্ধির এই বিপরীত সম্পর্কের কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ১৯৭৪-'৮১ সালের সময়সীমায় এ দুটি চলক-এর (variable) সহ-সম্বন্ধ ধনাত্মক। তবে, তা

পরিসংখ্যানের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সারণি-৫-এ এ-ও লক্ষ করা যায় যে, গ্রামের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি জেলার আয়তনের পরিবর্তনের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পর্কিত নয়।

১৯৫১-'৬১, ১৯৬১-'৭৪ ও ১৯৭৪-'৮১, এই পরিসরে এসব চলকের (variable) সহগমনের সূচক (co-relation coefficient) সারণি-৫ এ দেখানো হল।

সারণি-৫

গ্রামের সংখ্যার শতকরা হারের পরিবর্তন এবং জনসংখ্যার শতকরা হারের পরিবর্তন ও জেলার আয়তনের শতকরা হারের পরিবর্তনের সহ-সম্বন্ধ।

কাল	গ্রামের সংখ্যার শতকরা হারের পরিবর্তন ও জনসংখ্যার শতকরা হারের পরিবর্তনের সহ-সম্বন্ধ	গ্রামের সংখ্যার শতকরা হারের পরিবর্তন ও জেলার আয়তনের শতকরা হারের পরিবর্তনের সহসম্বন্ধ
১৯৫১-'৬১	০.১৪৭	০.০৭২
	(০.৫৭)	(০.২৮)
১৯৬১-'৭৪	-০.২৯২	০.১৩৫
	(১.১৮)	(০.৫২)
১৯৭৪-'৮১	০.৪১২	-
	(১.৭৫)	(০.০০)

বন্ধনীর সংখ্যা 't' পরিসংখ্যান নির্দেশক; উৎস: খান, ১৯৮৭

১৯৫১-১৯৮১ সালের পরিসরে গ্রামের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলে না। গ্রামের শুমারি উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। এ সব উপাত্ত সুসামঞ্জস্যপূর্ণও নয়, নির্ভুলও নয়। উদাহরণস্বরূপ, খুলনা জেলার উপাত্ত তুলে ধরা যায়। ১৯৭৪-'৮১ সালের মধ্যে সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৮ লাখ, অথচ ১৯৭৪ সালে গ্রামের সংখ্যা ছিল ৩,৮৫৩ যা ১৯৮১ সালে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৩৫১২। ধারণা করা যায় যে, শুমারি কর্তৃপক্ষ গ্রামের যে সংজ্ঞা প্রণয়ন করেছিল স্থানীয় পর্যায়ে তা যথার্থভাবে অনুসরণ করা হয়নি। বিভিন্ন জেলায় গ্রামের বিভিন্ন সংজ্ঞা অনুসৃত হয়েছে। ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালে শুমারি প্রতিবেদনে 'গ্রামকে' 'গ্রামীণ মৌজা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কিন্তু এ সব জরিপে গ্রামের মোট সংখ্যা মৌজার সংখ্যার চেয়ে বেশি। একইভাবে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে মৌজার সংখ্যা ছিল ৬০,৩১৫; অপরদিকে গ্রামের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৮৩,৬৬৬।

এক শতাব্দী ধরে আদম শুমারির অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এখনও বাংলাদেশের গ্রামের কোনও সন্তোষজনক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। যে সব সংস্থা এ সব উপাত্ত সংগ্রহ করে এটি তাদের ত্রুটি নয় বরং ত্রুটি রয়েছে গ্রামের সংজ্ঞার মধ্যেই। বারতুচ্চির (Bertucci, ১৯৭০) কথা ধার করে বলা যায় যে, বাংলাদেশে গ্রাম ধরা

দেয় না, পালিয়ে বেড়ায়। যতদিন না গ্রামকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যাবে ততদিন এ বিষয়ে কোনও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান জোগাড় করা যাবে না।

মনরো (Munro), মেটকাফ (Metcafe), এলফিনস্টোন (Elfinstone) ও ম্যালকমের (Malcolm) মতো আদি ব্রিটিশ প্রশাসকদের গ্রাম-সমাজ সম্পর্কিত উৎসাহ-উদ্দীপনা সত্ত্বেও বাংলার ঔপনিবেশিক শাসকরা গ্রাম সরকারের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিহান ছিলেন। বাংলায় জমিদারদের গ্রামাঞ্চলের স্বতঃসিদ্ধ নেতা বলে ধরে নেয়া হত। ১৮৬৬ সালে ব্রাউনি পূর্ব বাংলার গ্রামীণ বসতির অনন্যতাকে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করে লিখেছেন, "গ্রামীণ পৌর প্রতিষ্ঠানের পরিপূর্ণ ঘাটতির ক্ষেত্রে ত্রিপুরা জেলা উল্লেখযোগ্য। বাংলার অন্যান্য জেলায় এটিই চল যে, গ্রামের অধিবাসীরা কোনও কোনও ব্যক্তিকে, সাধারণত বয়স্ক রায়তদেরকে এক ধরনের শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করে এবং সাধারণ কাজে-কর্মে পরোক্ষভাবে তাদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে...। কিন্তু এ জেলায় এ ধরনের কোনও নেতৃত্ব নেই, যদিও প্রভাবশালী লোকজন কিছুটা শ্রদ্ধা-ভক্তি পায়। অসংখ্য দাপ্তরিক সফরকালে স্বীকৃত গ্রামীণ কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি দেখে আমি যারপরনাই বিস্মিত হয়েছি; এই অনুপস্থিতির পেছনে কৃষকদের যাযাবর প্রকৃতি সক্রিয় বলে আমার ধারণা" (Schendel-এ উদ্ধৃত, ১৯৮০, পৃ. ২১৩)।

১৮৭২ সালে পরিচালিত বাংলার প্রথম আদম শুমারির মাধ্যমে এ প্রদেশে গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি সুশৃঙ্খল জরিপ সম্পাদিত হয়। শুমারি চলাকালে ঔপনিবেশিক প্রশাসকবৃন্দ জনসংখ্যা নিরূপণের জন্য বিরাজমান গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সমর্থন লাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রথম শুমারির তত্ত্বাবধায়ক বেভারলি লক্ষ করেন যে, বিহার ও পশ্চিম বাংলার কিছু অংশে গ্রাম-সরকার বা গ্রাম প্রতিষ্ঠানের এক ধরনের কাঠামোগত অস্তিত্ব বিদ্যমান; পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় প্রচলিত-ধারণার গ্রামের কোনও অস্তিত্বই নেই। ১৮৭১ সালে শুমারি প্রতিবেদনের স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতা ততই হ্রাস পেতে থাকে। তিনি পরিশেষে মন্তব্য করেছেন, "বাংলায় গ্রাম অত্যন্ত ছড়ানো-ছিটানো; উত্তর ভারতে তা একেবারেই দেখা যায় না; এখানে সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও সহমর্মিতার উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে" (Beverly, ১৮৭২, পৃ. ৪)।

১৯১১ সালে ভারতের শুমারি প্রতিবেদনে গেইট একদিকে পূর্ব বাংলার গ্রাম ও অন্যদিকে মধ্য ও পশ্চিম বাংলার গ্রামের মধ্যকার ভিন্নতাকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, "মধ্য ও পশ্চিম বাংলায় কদাচিৎ একসাথে গাদাগাদি করে বাড়ীঘর তৈরী করা হয়; প্রত্যেক বাড়ীরই সংলগ্ন জমিজমা থাকে; সাধারণত গ্রামের একটি অংশে বাড়ীঘর তৈরী করা হয়। এ রকম অনেক গ্রামই মজে যাওয়া নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে; বাঁশ ঝাড় আর গাছপালায় ভেতর এগুলো ডুবে আছে; তা অস্বাস্থ্যকরও বটে। অন্য দু'টি প্রাকৃতিক অঞ্চলে গ্রামে কোনও নিয়মিত বাস্তু-ভূমির এলাকা নেই এবং বাড়ীঘরগুলোও সেখানে ছড়ানো-ছিটানো" (Gait, ১৯১৩, পৃ. ৩২)।

ভারতবর্ষের ১৯২১ সালের আদমশুমারির ওপর প্রণীত প্রতিবেদনে জে. টি. মার্টিন ভারতের বিভিন্ন অংশে গ্রামীণ বসতির কাঠামোর পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখ

করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, ''বাংলা অঞ্চলের বিশেষ ধরনের প্রকৃতির জন্য এর অধিকাংশ এলাকায় কোনও সামাজিক ঐক্য বা প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে সর্বত্র বাড়ীঘর গড়ে তোলা হয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সাধারণ অর্থে যাকে গ্রাম বলা হয় তার কোনও অস্তিত্বই দেখা যায় না সেখানে। সুবিধের খাতিরে মৌজাকে গ্রাম অর্থে ধরা হয়েছে; মৌজা হচ্ছে শুধুমাত্র জমিজমার বড় একটি ভূমিখণ্ড – তা বসতি অধ্যুষিত হতে পারে, বসতিহীনও হতে পারে, যাকে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে একক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিতুলনায় উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের অঞ্চলসমূহে ভূমি পরিমাপের একক ও বসতের এককের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার কৃষকদের চাইতে পশ্চিম অঞ্চলের কৃষকরা দলবদ্ধ হয়ে থাকতে অধিক ভালবাসে। অংশত এ কারণে এবং মূলত অস্থিতিশীল সময়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনে উত্তর-পশ্চিম ভারত, যুক্ত প্রদেশের পুরো এলাকা এবং দাক্ষিণাত্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে গ্রামের একটি সুস্পষ্ট আবাসিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে; রাজস্ব প্রশাসনের একক নির্ধারণের সময় এ মাত্রাটিকে অনেকটা বিবেচনায় নেয়া হয়েছিল" (Martin, ১৯২৪, পৃ. ৭৮)। একই সুরে টমসন ১৯২১ সালের বাংলার আদম শুমারির ওপর লেখা তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, "ভারতে এবং আদতে পৃথিবীর সর্বত্রই গ্রামকে সাধারণত যেভাবে দেখা হয় বাংলায় গ্রামকে সেভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। গ্রাম বলতে যে চিত্রটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা হচ্ছে দু'তিন মাইল জুড়ে জমি-জিরাতে কাজ-করা চাষী ও কৃষি-শ্রমিকদের পাশাপাশি একগুচ্ছ বাড়ীঘর; তাতে আছে গ্রামের চৌকিদার, চাকর-বাকর, একজন সুদের কারবারি, কিছু দোকানদার, কারুশিল্পী, কুমার, চামার, কামার, ইত্যাদি; গ্রামের মাঝখানে ভূস্বামী বা মধ্যস্বত্বভোগীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ী, গ্রামের সবার জন্য বৈঠকের একটি জায়গা, প্রায়শ সবাই সেখানে গিয়ে গল্প-সল্প করে; বিচার-আচার, গ্রামীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রয়েছে একটি চত্বর, হিন্দু গ্রামে একটি মন্দির, মুসলমানদের গ্রামে একটি মসজিদ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। বর্ধমান জেলার কিছু এলাকা ছাড়া বাংলায় এ ধরনের গ্রাম খুঁজে পাওয়া যাবে না" (Thompson, ১৯২৩, পৃ. ৯৭)। *ইমপেরিয়েল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া*-তে (*Imperial Gazeteer of India*) ডব্লিউ. ডব্লিউ হান্টার গ্রামীণ পূর্ব বাংলায় সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা সম্পর্কে বিরাজমান ধ্যান-ধারণাকে পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বাংলার বিভিন্ন অংশে গ্রামের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হয়। বিহারে, বিশেষত গঙ্গার দক্ষিণে গ্রামে দালান-কোঠা ঠাসাঠাসি করে গড়ে উঠেছে। সেখানে বৃক্ষ বা বাগানের কোনও জায়গা নেই। যতই পূর্বদিকে এগোনো যায় ততই দৃশ্যপট বদলাতে থাকে; যদিও বাড়ীঘর গ্রামের একটি বিশেষ এলাকায় নির্মাণ করা হয় তবু তা হয় ছাড়া-ছাড়াভাবে, বসতবাটির জমির ওপর। সেখানে শাকসব্জির চাষ হয়; ফলের গাছ, বাঁশঝাড় গ্রীষ্মের খরতাপে সুশীতল ছায়া দিয়ে বাড়ীঘর শীতল রাখে। আরও পূবদিকে এগুলে, পূর্ব বাংলার নিম্নাঞ্চলে, প্রায়শই গ্রামের কেন্দ্রীয় এলাকার কোন আলামত খুঁজে পাওয়া যায় না; লক্ষ করলে দেখা যায় যে, নদীর পাড়ে উঁচু জায়গায় সারিবদ্ধভাবে বাড়ীঘর গড়ে উঠেছে, অথবা শুকনো মওসুমে সাময়িকভাবে যখন পানি শুকিয়ে যায় তখন কঠোর পরিশ্রম করে ১২ থেকে ২০ ফুট উঁচু মাটির স্তূপ গড়ে বিশৃঙ্খল সারিতে ছোট ছোট গুচ্ছে তৈরী করা হয়েছে বাড়ীঘর। একটি

গ্রামের গড় লোকসংখ্যা ৩৫৫; কিন্তু শুমারির উদ্দেশ্যে গ্রামের জনসংখ্যার এই গড় সর্বক্ষেত্রে এক নয়। কোনও কোনও অংশে জরিপ এলাকাকে একক হিসেবে ধরা হয়েছে; আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে নির্ভরশীল পাড়াসহ আবাসিক গ্রামকে ধরা হয়েছে একক হিসেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রায়শই সমস্যা দেখা দিয়েছে -- কোনও নির্দিষ্ট একগুচ্ছ বাড়ীকে একটি আলাদা সত্তা হিসেবে গণ্য করা হবে, না অন্য কোনও গ্রামের পাড়া হিসেবে বিবেচনা করা হবে, সে সমস্যা দেখা দিয়েছে অহরহ" (Hunter, ১৯৮৫, পৃ. ৩৪)।

গত দু'শ বছরের শুমারি প্রতিবেদন ও জেলা গেজেটিয়ার পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, দু'টি অনুকল্পের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। প্রথমত, বাংলা প্রেসিডেন্সীতে গ্রামের কাঠামো দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলায় গ্রামীণ সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার (corporateness) মাত্রা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। প্রথম অনুকল্পটি পরীক্ষা করার জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় গ্রামের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত প্রচলিত ধ্যান-ধারণা খতিয়ে দেখা দরকার।

সংস্কৃত ভাষায় *গ্রাম* বলতে বুঝায় 'গোষ্ঠী', 'সম্প্রদায়' বা 'দল' এবং 'সমাহার'। বাডেন-পাওয়েল আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে মত ব্যক্ত করেছেন যে, "গ্রাম হচ্ছে সীমিত সংখ্যক পরিবারের গোষ্ঠীভিত্তিক উপদল" (Baden-powell, ১৮৯৬, পৃ. ৭৪)। যদিও গ্রাম বা এর বিভিন্ন স্থানীয় নামের (যেমন, গাঁও) মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার বিরাট অংশে গ্রামীণ বসতির একককে বোঝান হয়, তবু অঞ্চলভেদে গ্রামের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হয়। বিভিন্ন ধরনের গ্রামের কাঠামো সম্পর্কে সম্পর্কে দু'টি প্রধান মতবাদ রয়েছে। এক ঘরানার ঐতিহাসিকদের মতে গ্রামের বিভিন্ন রূপ ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সর্বপ্রথম পর্যায়ে গোত্র ছিল যৌথভাবে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী। পরবর্তী পর্যায়ে গ্রামের এই রূপ বিলীন হয়ে যায় এবং যৌথ পরিবারের হাতে জমির স্বত্বাধিকার বর্তায়; যার ফলে বিভিন্ন ধরনের গ্রামের বিবর্তন ঘটে। অন্য একটি ঘরানার মতে বিভিন্ন অসম পরিবেশে ভিন্ন-ভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের গ্রামের উদ্ভব ঘটেছে; তবে কোন্ ধরনের গ্রামের উদ্ভব আগে ঘটেছে তা বলা মুশকিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক প্রশাসকবৃন্দ ভূমি রাজস্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামের বৈশিষ্ট্যকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে : ১. *রায়তওয়ারী* গ্রাম, এবং ২. যৌথ গ্রাম। রায়তওয়ারী গ্রাম ও যৌথ গ্রামের মধ্যে দু'টি প্রধান পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, *রায়তওয়ারী* গ্রামের নেতৃত্ব থাকত পারিবারিকসূত্রে নির্বাচিত গ্রাম-প্রধান-এর (প্যাট্রেল) হাতে। যৌথ গ্রাম শাসন করত বিভিন্ন বাড়ীর প্রধানদের নিয়ে গঠিত গ্রামীণ অভিজাতকূল (স্থানীয়ভাবে *পঞ্চায়েত* বলে পরিচিত)। দ্বিতীয়ত, *রায়তওয়ারী* গ্রামের পতিত জমির মালিকানা ছিল রাষ্ট্রের; তবে গ্রামবাসীরা সাধারণত তাদের ভিটার সংলগ্ন পতিত জমি ব্যবহার করতে পারত। যৌথ গ্রামে গ্রাম-সংলগ্ন পতিত জমিকে গ্রামের সম্পত্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হত, এবং অন্য জমির মতোই তা পুরোপুরি গ্রামের দখলে থাকত।

যৌথ গ্রাম দু'ধরনের, যথা, *পত্তিদারী* ও *ভাইয়াচারা*। এ দু'ধরনের গ্রামের মূল পার্থক্য নিহিত আছে ভূমিবণ্টন পদ্ধতিতে। *পত্তিদারী* গ্রামে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত

অংশের ভিত্তিতে জমি ভাগ করা হয়। অন্যদিকে *ভাইয়াচারা* গ্রামে একটি খানার (household) শ্রমশক্তির পরিমাণের ভিত্তিতে বা কোনও একজন দখলদারের মর্যাদার ভিত্তিতে জমি বিতরণ করা হয়। ফলে, *ভাইয়াচারা* গ্রামে *পত্তিদারী* গ্রাম হতে অধিকতর সমতাভিত্তিক ভূমিবন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। *পত্তিদারী* গ্রামের মধ্যে আবার যে সব গ্রাম জমিদারের স্বত্বাধিকারভুক্ত ছিল সে সব গ্রামে ভূমি বন্টন ছিল সবচেয়ে অসম। বাডেন-পাওয়েল-এর মতে (Baden-Powell, ১৮৯৬) *রায়তওয়ারী* গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছিল দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর লোকজন; তারাই প্রথম জমি সাফ করেছিল। হামলাকারী বহিরাগত গোত্রের লোকেরা পরে গ্রাম দখল করে যৌথ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে, বা কোনও এলাকার কর্তৃত্ব লাভ করে নতুন গ্রামের সৃষ্টি করে। তবে এটি এখনও একটি অনুমান মাত্র; ঐতিহাসিক প্রমাণাদির মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠার দাবি রাখে।

ভূমি রাজস্বের ভিত্তিতে গ্রামের শ্রেণীবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো পার্থক্যকে এড়িয়ে গেছে। সভ্যতার মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন গ্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুস্পষ্ট কাঠামো রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামের – এ ধরনের প্রাক্-ধারণা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন আঁন্দ্রে বেতেই। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন; ১. কেন্দ্রস্থল গ্রাম (core village) ও ২. প্রান্তিক গ্রাম (Peripheral village) (Andre Beteille, ১৯৮০, পৃ. ১০৮-১১৩)। কেন্দ্রস্থল গ্রাম প্রধানত ভারতীয় সভ্যতার মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী ঐতিহ্যে লালিত। 'কেন্দ্রস্থল' গ্রামের তিনটি পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, এই পদ্ধতিতে রয়েছে শ্রমের বিশদ বিভাজন এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত কৌলিন্যের বিভিন্ন ধাপ। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রস্থল গ্রামে পরিবার ও ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে অসংখ্য বিস্তৃত ও স্থায়ী উলম্ব প্রকৃতির বন্ধন বিদ্যমান। তৃতীয়ত, কেন্দ্রস্থল গ্রামের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে পুরোহিততন্ত্রের মূল্যবোধের একটি সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা ছিল। অপরদিকে, 'প্রান্তিক' গ্রাম ছিল সাধারণত ছোট এবং অধিকতর সমরূপী। এসব গ্রামে সামাজিক স্তরের সংখ্যা ছিল কম। এ সব গ্রাম আদিবাসী এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ-বহির্ভূত ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। বেঁতের শ্রেণীকরণে দু'টি প্রধান দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। প্রথমত, 'প্রান্তিক' ও 'কেন্দ্রস্থল' গ্রামের পার্থক্য নির্ণয়ার্থে কোনও সুস্পষ্ট মানদণ্ড নেই। এই শ্রেণীবিভাগ প্রান্তিক গ্রামসমূহের কাঠামোর আঞ্চলিক পার্থক্যকে বিবেচনায় নেয়নি।

ভারতীয় গ্রামের স্বরূপের ভিন্নতা সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার আদর্শ প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রামের তিনটি পরস্পরযুক্ত বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, গ্রাম হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট প্রশাসনিক একক। দ্বিতীয়ত, গ্রাম একটি আলাদা অর্থনৈতিক সত্তা। তৃতীয়ত, গ্রাম একটি সামাজিক সত্তা।

প্রশাসনিক একক হিসেবে গ্রামের রয়েছে তিনটি প্রধান দায়িত্ব। প্রথমত, প্রতিনিধিস্থানীয় একটি গ্রাম-সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে ভূমি রাজস্ব আদায় এবং গ্রামসংলগ্ন অনাবাদী জমির ব্যবস্থাপনা। দ্বিতীয়ত, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং আন্তঃগ্রামীণ বিরোধ মীমাংসা করা। তৃতীয়ত, গণপূর্তের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে সকল গ্রামবাসীর সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে (যেমন, সেচ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রাম্য মেলার আয়োজন)। ফলে, প্রতি গ্রামেই একটি কার্যকর সরকার বিদ্যমান ছিল। *রায়তওয়ারী* গ্রামে *প্যাটেল* ছিল উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রাম-

প্রধান। গ্রাম-প্রধানের বিচারের ক্ষমতা থাকত এবং অপরাধী ধরা ও গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা বিধানের বিভিন্ন দায়িত্বও বর্তাত তার ওপর। যৌথ গ্রামে গ্রাম-সরকারের দায়িত্ব পালন করত *পঞ্চাশেতা* *প্যাটেল* বা *পঞ্চায়েতকে* সহায়তা করত একদল গ্রামীণ কর্মচারি। গ্রামের হিসাবরক্ষক হিসেবে একজন *পাটোয়ারীকে* নিয়োগ করা হত। গ্রাম সরকার গ্রামের পাহারাদার এবং অচ্ছুৎ বর্ণের লোকদের মধ্য থেকে ভৃত্য নিয়োগ করত। ১৮১২ সালের ব্রিটিশ সংসদীয় প্রতিবেদনে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রামীণ কর্মচারিদের দায়িত্বাবলির বর্ণনা দেয়া হয়েছে নিম্নোক্তভাবে :

"*পোতাইল* বা প্রধান অধিবাসী সাধারণত গ্রামের কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করে; সে গ্রামবাসীদের বিরোধও মীমাংসা করে, পুলিশকে সহায়তা করে এবং গ্রামের ভেতরে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করে। এ কাজের জন্য সে-ই সবচেয়ে যোগ্য লোক; তার রয়েছে ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি, এবং পরিস্থিতি ও জনগণের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান। *কুরনুম (kurnum)* চাষাবাদের হিসাব রাখে এবং সেইসাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছু লিপিবদ্ধ করে। আর রয়েছে *তেলিয়ার (Tallier)* ও *তুতী (Totie)*। তেলিয়ারের দায়িত্ব হচ্ছে অপরাধ ও বেআইনি কাজের খবরাখবর সংগ্রহ করা এবং এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে ভ্রমণকারী মানুষজনের নিরাপত্তা প্রদান। তুতীর কাজ অনেকটা সরাসরি গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; অন্যান্য কাজের মধ্যে সে ফসল পাহারা দেয় এবং মাপ-জোকে সহায়তা প্রদান করে। সীমানা-রক্ষী গ্রামের সীমানা রক্ষা করে, বা বিরোধ দেখা দিলে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। জলাশয় ও নদ-নদীর তত্ত্বাবধায়ক সেচের পানি বিতরণ করে। ব্রাহ্মণ গ্রামের পুজো-আচ্চা করে। বিদ্যালয়ের মাষ্টারকে দেখা যায় গ্রামের ছাত্রদের পড়াচ্ছে, মাটিতে লেখা শেখাচ্ছে। আরও রয়েছে জ্যোতিষ; তাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ ও গণক। এ সব কর্মচারি আর চাকর-বাকর নিয়েই সাধারণত গ্রাম-প্রতিষ্ঠান গঠিত; কিন্তু দেশের কোনও কোনও অংশে ব্যবস্থাটি এত বিশদভাবে বিন্যস্ত নয়; ওপরে বর্ণিত কোনও কোনও একাধিক দায়িত্ব একই ব্যক্তিব ওপর বর্তায়; কোনও কোনও ক্ষেত্রে এদের সংখ্যা উক্ত সংখ্যার চাইতে আবার বেশিও হয়" (Marx & Engels-এ উদ্ধৃত, ১৯৬২, পৃ. ৩৪৯)।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে পরিচালিত নৃতাত্ত্বিক গবেষণা হতে দেখা যায় যে, গ্রাম-কর্মচারিরা অদ্যাবধি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। দুবে দেখিয়েছেন যে, "এখনও গ্রাম তার আধা-স্বায়ত্তশাসনের চরিত্র বজায় রেখেছে। ব্যতিক্রমহীনভাবে গ্রামের রয়েছে স্বীকৃত মোড়ল, আর সেই মোড়লের সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য" (Dube, ১৯৫৫, পৃ. ২)। তবে ম্যান্ডেলবাওম বলেছেন যে, "কর্মচারিরা আবশ্যিকভাবে গ্রামের নেতা নয়। তবে গ্রামের মোড়লের প্রকৃত প্রভাব-প্রতিপত্তির উৎস হল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও সামাজিক মর্যাদা" (Mandelbaum, ১৯৯০, পৃ. ৩৪৫-৩৪৮)।

গ্রামের আরেকটি ব্যাপকভাবে-স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য হল অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা। বেতেই লিখেছেন যে, গ্রামবাসীদের ধারণা ছিল একটি আদর্শ গ্রাম গড়ে তুলতে হলে বিভিন্ন ধরনের পেশার লোকজন থাকা দরকার। সেই আদর্শের আদলে তারা গ্রামকে গড়ে তোলার চেষ্টা করত। স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে একদল কারিগর ও চাকর-বাকরকে নিজেদের গ্রামে আকৃষ্ট করে আনত প্রতিটি গ্রাম; নগদ অর্থে তাদের মজুরি দেয়া হত

না, বরং নির্দিষ্ট পারিতোষিকের ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ করা হত। এই পারিতোষিক কোনও কোনও সময় দেয়া হত খাজনামুক্ত ভূমি-দানের মাধ্যমে, অথবা ফসলের মওসুমে কিছু ফসল দিয়ে। এ ধরনের কারিগরদের মধ্যে ছিল কামার, কুমার, চামার বা মুচি, ছুতার, নাপিত এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে গণক ও পুরোহিত। কার্ল মার্কস্-এর ভাষায় একটি প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রাম "প্রতিষ্ঠিত ছিল গৃহভিত্তিক শিল্পের ওপর; তাতে ছিল হস্তচালিত তাঁতের কাজ, হাতে সুতা কাটা, হাতে চালানো চাষাবাদ; এগুলোই গ্রামের স্বয়ম্ভরতার শক্তি জোগাত" (Marx & Engels, ১৯৬২, পৃ. ৩৫০)।

সম্প্রতি ভারতীয় গ্রামের স্বয়ম্ভরতা সম্পর্কে অতিকথন নৃতাত্ত্বিকদের প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হয়েছে। গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতার অতিকথনের ক্ষেত্রে শ্রীনিবাস নিম্নলিখিত দুর্বলতা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন, লবণ, মশলা, গুড়, পান, সুপারি, নারিকেল, তামাক, চুন, রুপা ও সোনা প্রতি গ্রামে উৎপাদিত হত না। ঐতিহাসিক সূত্রসমূহে দেখা যায় যে, সকল গ্রামেই এ সব জিনিসপত্র ব্যবহৃত হত। তা থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আন্তঃগ্রাম ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। সাপ্তাহিক বাজার ও মাঝে-মধ্যে আয়োজিত মেলার মাধ্যমে সেই ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণা মেনে নিলে ধরে নিতে হয় যে, গ্রামে সমস্ত প্রয়োজনীয় কারিগর ও সেবাদানকারী বর্ণের লোক রয়েছে। শ্রীনিবাসের হিসাব অনুসারে সে ক্ষেত্রে প্রতি গ্রামে অন্তত সাতটি বর্ণের মানুষ থাকতে হবে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় এক-চতুর্থাংশ গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা ৫০০-র নিচে। অধিকাংশ ছোট গ্রামেই অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বর্ণের বাসিন্দা ছিল না। শ্রীনিবাস যথার্থই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, যদিও গ্রাম অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না, তবু মনে হত যে গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ; কারণ, গ্রামবাসীরা যা উৎপাদন করত তা-ই ভোগ করত; কারিগর ও সেবাদানকারী বর্ণের লোকজনের মজুরি তারা পরিশোধ করত ফসলের মাধ্যমে, এবং এক ধরনের বিনিময় পদ্ধতিতে ফসলের ব্যবহারের সুযোগের কারণে অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবা লাভ করা যেত (Srinivas, ১৯৮৭, পৃ. ৫৫)।

গ্রামের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কেও মতপার্থক্য রয়েছে। ম্যান্ডেলবাওম-এর মতে, "গ্রাম সুস্পষ্টভাবে পৃথকযোগ্য ও ধারণাগত রূপ নয়; এতদসত্ত্বেও এটি একটি মৌলিক সামাজিক একক" (Mandelbaum, ১৯৭০, পৃ. ৩২৯)। সমালোচকরা অবশ্য মত পোষণ করেন যে, গ্রাম কোনও সুনির্দিষ্ট সামাজিক একক ছিল না, কারণ গ্রামে নিম্নবর্ণের লোকজনের অধিকার ছিল না কুয়ো ব্যবহার করার ও মন্দিরে প্রবেশের। ফলে কোনও গ্রামে বসবাসরত সকল লোককে গ্রাম তার অন্তর্ভুক্ত করত না (Dumont & Pocock, ১৯৫৭)। কুয়া ব্যবহার ও মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থেকে *দলিতদের* বঞ্চিত রাখার ব্যাখ্যা অবশ্য শ্রীনিবাস স্বীকার করেননি। তাঁর যুক্তি হল, "ধর্মীয় ক্ষেত্র থেকে বাদ-পড়া লোকজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে পার্থিব ক্রিয়া-কাণ্ডে", এবং "কোনও একটি ক্ষেত্র থেকে কোনও বর্ণের লোকজনকে বঞ্চিত করাকে স্থানীয় সমাজে তাদের সদস্যহীনতার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায় না" (Srinivas, ১৯৮৭, পৃ. ৫০-৫১)। গ্রামের সংহতির বহিঃপ্রকাশ ঘটত সামাজিক অনুষ্ঠান, গ্রামীণ আচার-অনুষ্ঠান ও মেলায়। প্রায়শই গ্রামের নিজস্ব একটি কেন্দ্র-স্থল থাকত। কোনও কোনও গ্রামে গ্রামপ্রধানের বাড়ী হত সামাজিক জীবনের

কেন্দ্রবিন্দু; অন্যান্য গ্রামে মন্দির বা মসজিদ হত সমাজ জীবনের প্রাণকেন্দ্র। তদুপরি, গ্রামবাসীদের মধ্যকার গভীর আন্তঃ-সম্পর্ক এক ধরনের সংহতি-চেতনা বা 'গ্রামবোধ' গড়ে তুলত। যা হোক, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ভারতে এক গ্রাম অন্য গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। বর্ণের বন্ধন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ব্যাপ্ত হয়েছে; উত্তর ভারতের অধিকাংশ এলাকায় গ্রামের বাইরে সমবর্ণে বিয়ের প্রথার (exogamy) এবং একই গ্রামে উচ্চতর বর্ণে বিয়ের প্রথার (hypergamy) অস্তিত্ব পরস্পর নির্ভরশীলতার সুস্পষ্ট প্রকাশ। তীর্থযাত্রা ও মেলায় অংশগ্রহণের প্রতি কৃষকদের আগ্রহ এ সত্যই প্রতিষ্ঠা করে যে, ভারতীয় গ্রাম সর্বদাই একটি বৃহত্তর নেটওয়ার্কের অংশ ছিল" (Srinivas, ১৯৮৭, পৃ. ৩৯)। যদিও ধ্রুপদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দক্ষিণ এশিয়ার গ্রাম-সমাজের ভূমিকাকে অতিসরলীকরণ করে উপস্থাপন করে তবু সমাজবিজ্ঞানীগণ অব্যাহতভাবে গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক সংঘবদ্ধতার ওপর জোর দেন। দক্ষিণ এশিয়ার গ্রাম সম্পর্কে মূলধারার দৃষ্টিকোণকে দুবে এ ভাবে তুলে ধরেছেন : "ভূখণ্ডগতভাবে এবং সেইসাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আচার-অনুষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাম একটি পৃথক ও সুস্পষ্ট সত্তা। গ্রামে বসবাসরত লোকজন তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সংঘবদ্ধ পরিচিতিকে স্বীকার করে; অনুরূপভাবে অন্যরাও তা শনাক্ত করতে পারে। নিজেদের বসত এলাকার প্রতি তাদের আবেগপূর্ণ আসক্তি খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। বিভিন্ন বিষয়ে গ্রাম একক হিসেবে কাজ করে" (Dube, ১৯৫৫, পৃ. ৭)।

ব্রিটিশ *রাজ*-এর শাসনের ফলে গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হয়েছে না দুর্বল হয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্য মতবিরোধ রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের ধ্রুপদী ব্যাখ্যা অনুসারে ভারতে আদর্শ গ্রামের অস্তিত্ব ছিল ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার আগে। যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নতুন নতুন পদ্ধতি চালুর পরিণামে গ্রামীণ অর্থনীতির মুদ্রায়নের ফলে গ্রাম-সমাজ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। এই ব্যাখ্যার পেছনে যে পূর্ব-ধারণাটি কাজ করে তা হচ্ছে – গ্রাম সমাজ হল প্রাকৃতিক অর্থনীতির প্রতিনিধি। দ্বিতীয় একটি ঘরানার প্রবক্তারা অবশ্য এ মতবাদের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন; তাঁদের মতামত হচ্ছে – ভূমি-রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রাম সমাজ সৃষ্টি করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ম্যাক্স ভেবার মনে করেন যে, রাশিয়ার *মীর* (গ্রাম) কোনও আদিম প্রতিষ্ঠান নয়, বরং তা 'কর পদ্ধতি ও ভূমি-দাস প্রথার সৃষ্টি' (Weber, ১৯৬১, পৃ. ৩৩)। রাশিয়ার গ্রাম-সরকার গ্রামের সকল অধিবাসী থেকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করত। রাশিয়ার কোনও গ্রামের (*মীর*-এর) কোনও অধিবাসী গ্রাম ছেড়ে অন্য কোনও পেশা গ্রহণ করলেও গ্রামের অধিকার থাকত সম্মিলিত প্রদেয় রাজস্বে তার অংশ প্রদানের জন্য যে-কোনও সময় তাকে ডেকে আনার। ফলে, রাশিয়ার ভূমি রাজস্ব পদ্ধতি গ্রামের সংহতিকে জোরদার করেছে। ব্রিটিশদের প্রবর্তিত ভূমি রাজস্ব পদ্ধতি সম্পর্কেও একই যুক্তি দেয়া যেতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার যে সব প্রদেশে সকল গ্রামবাসী যৌথভাবে ভূমি-রাজস্ব প্রদান করত সেখানে এই পদ্ধতি সূচনার কারণে গ্রাম-সমাজ উজ্জীবিত হয়েছে। যেখানে কোনও স্বীকৃত গ্রাম-প্রধান ছিল না ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ সেখানে *লম্বরদার*-এর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। *লম্বরদাররা* কার্যত গ্রাম-প্রধানের দায়িত্ব পালন করত। যদিও নতুন পদ্ধতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রামের স্বয়ম্ভরতাকে প্রচণ্ডভাবে খর্ব করে, তবু কোনও কোনও

প্রদেশে এই প্রশাসনিক উদ্যোগ উল্টো কাজ করে; গ্রাম সমাজকে তা উজ্জীবিত করে তোলে।

প্রায়শই বাংলাদেশের গ্রামকে আপাতদৃষ্টিতে উত্তর ভারতের গ্রামের অনুকরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। একজন অর্থনীতির ঐতিহাসিক মত পোষণ করেন যে, আবহমান কাল থেকে গ্রাম ছিল "দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল একক" (Islam, ১৯৮৪, পৃ. ১৮)। বাংলাদেশের গ্রামের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার কিংবদন্তিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেখানো হয়েছে যে, অধিকাংশ গ্রাম-সমাজের পক্ষেই অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর হবার সম্ভাবনা ছিল না। গ্রামের পরস্পরনির্ভরশীলতা বিষয়ে শ্রীনিবাসের যুক্তিসমূহ বাংলাদেশ অঞ্চলের গ্রামীণ বসতির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। উত্তর ভারতের গ্রামের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার প্রধান কারণ হচ্ছে টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব। মার্কস্ বলেছেন, "গ্রামের বিচ্ছিন্নতাই ভারতের সড়ক-ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণ, আর সড়কের অনুপস্থিতিই সৃষ্টি করেছে গ্রামের বিচ্ছিন্নতা। এই ব্যবস্থায় নিম্ন পর্যায়ের অবকাঠামো নিয়ে সমাজের জীবনযাত্রা বয়ে চলে – অন্য গ্রামের সাথে মিথস্ক্রিয়া ব্যতীত, সামাজিক অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য আকাঙ্ক্ষার অভাব নিয়ে ও উদ্যোগহীনতায় (Marx & Engels, ১৯৬২, পৃ. ৩৫৫)।

গ্রামের বিচ্ছিন্নতার এই চিত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সত্য বলে মনে হয় না। এই বদ্বীপ অঞ্চলে নদী-নালার মাধ্যমে প্রায় সব গ্রাম একে অপরের সাথে যুক্ত ছিল। এখানকার প্রায় সব নদ-নদীই সারাবছর নাব্য থাকত। নদী-নালা ছিল দীর্ঘযাত্রা ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রাকৃতিক সড়ক। ঐতিহাসিক দলিলাদি সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয় যে, সাপ্তাহিক হাট ও মেলার মাধ্যমে এখানে নিয়মিত আন্তঃগ্রামীণ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলিত ছিল (Majumder, ১৯৪৩, পৃ. ৫৫৯-৫৬০)।

উপরন্তু, প্রাপ্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রাম ছিল ক্ষুদ্র। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৯১ সালের শুমারি হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের শতকরা ৭৬.০৮ ভাগ গ্রামের প্রত্যেকটির অধিবাসী-সংখ্যা ছিল ৫০০-এর কম (সারণি-৬)। এমনকি ১৯৮১ সালেও বাংলাদেশের শতকরা ৩৮.৪৯ ভাগ গ্রামের জনসংখ্যা ছিল ৫০০-র নিচে। ১৯৮১-তে বাংলাদেশের ৩৩,৪২০টি গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল দু'শরও কম। কৌটিল্যের মতে একটি গ্রামে কৃষক ও সেবাদানকারী শ্রেণীর পরিবারের সংখ্যা একশ'-র কম ও পাঁচশ'-র বেশি হওয়া উচিত নয় (কৌটিল্য, ১৯৬৭, পৃ.৪৫)। যদি একটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ ধরা হয় তাহলে কৌটিল্যের হিসাব মতে গ্রামের জনসংখ্যা ৫০০ থেকে ২,৫০০-র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কৌটিল্যের মানদণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অধিকাংশ গ্রাম ছিল ক্ষুদ্র গ্রাম। বুকানন হ্যামিলটনের লেখাও ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলাদেশ-অঞ্চলে অধিকাংশ গ্রামই ছিল খুব ছোট। সন্দেহ করা চলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বর্ণ ও পেশার লোকজন বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামে ছিল না। ১৯০১ সালের শুমারি প্রতিবেদনেও গেইট্ এই বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছেন : "গ্রাম সংগঠনের পরিপূর্ণতার অংশ হচ্ছে চাকর-বাকর ও বিভিন্ন পেশার কারিগর। বাইরের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা থেকে তারাই গ্রামকে মুক্ত রাখে। ভারতের অন্যান্য অংশে এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। সম্ভবত

বাংলার অধিকাংশ এলাকায় এ ব্যবস্থা পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। এখানে স্থানীয় কারিগরের প্রচণ্ড অভাব। বিহার থেকে আগত অভিবাসীদের জমি-বন্দোবস্তি দিয়ে তার অভাব পূরণ কর: হচ্ছে।" একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিহার ও ওড়িশার বিপুল সংখ্যক গ্রাম স্বয়ম্ভরতার ধারণার কাছাকাছি অবস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিহার ও ওড়িশায় যখন একটি নতুন গ্রাম গড়ে তোলা হয়েছে তখন গ্রামের প্রতিষ্ঠাতারা গ্রামের ভৃত্য ও কারিগরের দল জোগাড় করে। প্রত্যেককে গড়ে প্রায় এক একর পরিমাণের জায়গা দান করে সেই গ্রামে বসতি স্থাপনের জন্য তাদেরকে প্রলুব্ধ করা হয়। যে গ্রামকে তারা সেবা দিত সে গ্রামে প্রচলিত পারিতোষিকও তারা পেত (Gait, ১৯০২)। এ সব তথ্য সুস্পষ্টভাবেই তুলে ধরে যে, বাংলাদেশে গ্রাম কোনও সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক একক নয়। ভারতীয় গ্রাম সম্পর্কে মূলধারার সিদ্ধান্তের সাথেও এই ধারণা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সারণি-৬
১৮৯১ ও ১৯৮১ সালের জনসংখ্যার আয়তনের সাথে গ্রামের শতকরা হারের তুলনা

জনসংখ্যা	১৮৯১ সালে গ্রামের শতকরা হার	১৯৮১ সালে গ্রামের শতকরা হার
৫০০-র নিচে	৭৬.০৮	৩৮.৪৯
৫০০ ও ৯৯৯ এর মধ্যে	১৬.২০	২৬.১১
১০০০ ও ১৯৯৯ এর মধ্যে	৬.৪০	১৯.৯৫
২০০০ ও ২৯৯৯ এর মধ্যে	০.৮৭	৬.৮৬
৩০০০ ও ৫০০০ এর মধ্যে	০.৩২	৫.৩২
৫০০০-র অধিক	০.১৩	৩.২৭

উৎস : ১৮৯১ সালের শুমারি ও ১৯৮১ সালের বাংলাদেশ জরিপের প্রাথমিক প্রাক্কলন।

উত্তর ভারতের গ্রাম ছিল একটি সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক একক; বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কখনও তা সত্য ছিল না। যে এলাকা নিয়ে এখন বাংলাদেশ গঠিত তাতে কখনও *রায়তওয়ারী, পত্তিদারী* বা *ভাইয়াচারা* গ্রাম গড়ে ওঠেনি। উত্তর ভারতে যে ধরনের গ্রাম-প্রধানের ধারণা বিদ্যমান তা বাংলাদেশে জানা ছিল না। উত্তর ভারতের গ্রাম থেকে বাংলাদেশের গ্রাম ছিল দু'দিক থেকে ভিন্ন। প্রথমত, দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গ্রাম-সমাজে যে ধরনের সংগঠিত ও সুস্পষ্ট প্রশাসন ছিল, বাংলাদেশের গ্রামে তা ছিল না। দক্ষিণ এশিয়ার একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গ্রাম-সমাজের দায়িত্ব ছিল ভূমি রাজস্ব আদায়, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, পতিত জমির ব্যবস্থাপনা এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, তা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা (যেমন, সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা)। পঞ্চম শতাব্দীর জাতকের গল্পে দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামে এ ধরনের প্রাণচঞ্চল গ্রামীণ জীবনের অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে (Basham, ১৯৫৯, পৃ. ১৯৯)। আবুল ফজল ও মনসেরাত-এর লেখায় মধ্যযুগীয় ভারতের গ্রাম-প্রধানের কার্যাবলির

বর্ণনা স্পষ্টতই তুলে ধরে যে, মোগল আমলে উত্তর ভারতের গ্রাম যৌথভাবে রাজস্ব পরিশোধ করত, এবং গ্রাম সরকার একটি যৌথ তহবিল পরিচালনা করত (Habib, ১৯৮৫, পৃ. ১৩৪-১৫৫)। *রায়তওয়ারী* গ্রামের প্রধান ছিল একজন *প্যাটেল,* উত্তরাধিকারসূত্রে সে-ই ছিল গ্রামের প্রধান। যৌথ গ্রামে প্রশাসন পরিচালনা করত *পঞ্চায়েত।* বাংলাদেশ অঞ্চলে এ ধরনের গ্রাম-সরকার ছিল অজ্ঞাত। পুরো গ্রামে জমির রাজস্বের কোনও যৌথ দায়িত্ব ছিল না। ফলে বিস্মিত হবার কিছু নেই, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসকরা বাংলায় এ ধরনের কোনও গ্রাম-সরকারের সন্ধান পায়নি। বাংলাদেশ হচ্ছে একমাত্র অঞ্চল যেখানে এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই যে ব্রিটিশ শাসকরা গ্রাম-সমাজ বা গ্রাম-প্রধানকে কোনও জমিদারির বন্দোবস্তি দিয়েছে (Government of East Pakistan, ১৯৫৯, পৃ. ৩২)। যেহেতু যৌথভাবে রাজস্ব পরিশোধ করা হত না তাই গ্রামে কোনও যৌথ তহবিলও ছিল না।

দ্বিতীয়ত, এতদঞ্চলে গ্রামীণ কর্মচারি নিয়োগ পদ্ধতির অস্তিত্ব একেবারেই ছিল না। এখানে গ্রাম কর্তৃক নিযুক্ত *পাটোয়ারী* বা গ্রামের হিসাব-রক্ষকের পদ ছিল অজানা। সময় সময় একমাত্র যে গ্রাম-কর্মচারিটিকে নিয়োগ দেয়া হত সে ছিল গ্রামের প্রহরী বা *চৌকিদার* । বাংলাদেশী গ্রামে অন্যান্য কর্মচারির পদ ছিল আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত।

দক্ষিণ এশিয়ার গ্রাম সমাজের সর্বজনীনতার পূর্ব-ধারণা বিদ্যমান থাকার কারণে কোনও কোনও ঐতিহাসিক যুক্তি দেখান যে, প্রাচীন বাংলায় গ্রাম-সরকারের উপাদান ছিল। একজন ঐতিহাসিকের মতে গ্রামের জমির স্বত্বাধিকারী ছিল সমগ্র গ্রাম বা গ্রাম-সভা, রাষ্ট্র নয়। ইসলাম এই অনুকল্পটির বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন (Islam, ১৯৮৪, পৃ. ১০৭-১০৯) এবং যথার্থই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, এই অনুকল্প গড়ে উঠেছে প্রাপ্ত শিলালেখের ভুল ব্যাখ্যার কারণে। অন্য একজন ঐতিহাসিকের মতে দামোদরপুর শিলালেখে (আনুমানিক ৬ষ্ঠ শতাব্দী) উৎকীর্ণ '*গ্রামীকা*' প্রাচীন বাংলায় গ্রাম-প্রধানের পদের অস্তিত্ব বুঝাতে পারে (রায়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ)। বাংলাদেশ অঞ্চলে উত্তর-ভারতের অর্থে গ্রাম-প্রধানের অস্তিত্বের অনুকল্প প্রত্যাখ্যান করার পেছনে দু'টি যুক্তি রয়েছে। প্রথমত, এতদঞ্চলে সম্পত্তি হস্তান্তরের বিষয়ে শিলালেখ সুস্পষ্টভাবেই ধারণা দেয় যে, গ্রামে একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ছিল না (Morrison, ১৯৭০)। দামোদর শিলালেখ হতে দেখা যায় যে, জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে *মহাত্তর* (গ্রামের মাতব্বর গোছের লোক), *অষ্টকুলাধিকরণ* (আট জনের পরিষদ), *গ্রামীকা* (গ্রাম-প্রধান) ও গৃহ প্রধানদের খবর দিতে হত। অনুরূপভাবে মল্লাসারুল ফলক হতে প্রতীয়মান হয় যে, ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে *অগ্রহরিণা* (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ), *মহাত্তর* (বয়স্ক সম্মানিত ব্যক্তি), *ভট্ট* (বিদ্বান মানুষ), *খড়গী* (অসিবিদ), *বহানায়ক*-কে (যোগাযোগ ব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ক) অবহিত করতে হত। ধর্মাদিত্য 'বি'ফলক-এও উল্লেখ আছে যে, ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে *বিশ*-এর (প্রশাসনিক অঞ্চল) নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দকে অবহিত করতে হবে। যদি গ্রাম-প্রধান থাকত তবে গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও গৃহ-প্রধানদের অবগত করার প্রশ্ন উঠত না। দ্বিতীয়ত, মল্লাসরুল ও ধর্মাদিত্য-'বি' ফলকে উৎকীর্ণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তালিকায় *গ্রামীকা*-র পদ অন্তর্ভুক্ত নেই। এ থেকেই বোঝা যায় যে, *গ্রামীকা* গ্রামীণ প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল না। আর তা ছাড়া এটিও

স্পষ্ট নয় *গ্রামীকা* কি কোনও সম্মানজনক পদবী, নাকি রাষ্ট্র নিয়োজিত কর্মচারির পদবী। শিলালেখ স্পষ্টভাবেই তুলে ধরে যে, বাংলাদেশের গ্রাম-প্রধান বা পঞ্চায়েত দ্বারা পরিচালিত হত না, বরং এতে *মহাত্তর, ভট্ট* এবং *কুটুম্ব*-দের প্রাধান্য ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকে; যার ফলে বাংলার ব্রিটিশ প্রশাসকগণ গ্রাম বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক সংঘবদ্ধতার অনুপস্থিতির বিষয়টি তুলে ধরেন (Thompson, ১৯২৩)।

যদিও বাংলাদেশ অঞ্চলের গ্রাম একটি সুস্পষ্ট প্রশাসনিক একক বা সুনির্ধারিত পৃথক অর্থনৈতিক সত্তা হিসেবে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল না, তবু সামাজিক সত্তার কোনও কোনও বৈশিষ্ট্য গ্রামে প্রতিফলিত হয়েছে। অধিকাংশ সময়ই গ্রামের পরিচিতির ধারণা সামাজিক অনুষ্ঠান (যেমন, যাত্রা) এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-এর (যেমন, মহামারী প্রতিরোধের জন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান) মাধ্যমে প্রতিভাত হত (তরফদার, ১৯৬৫)। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোথাও কোথাও গ্রাম-বোধের সন্ধান মেলে। *চৈতন্য চরিতামৃত*-তে উল্লেখ আছে একসময় এক কাজী চৈতন্যের শাসানির মুখে জবাব দিয়েছিল,

"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা।।"

(শহীদুল্লা-য় উদ্ধৃত, ১৯৬৭, পৃ. ১২২)

ঐতিহাসিক সূত্রে-ও দেখা যায়, গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করেছেন। সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা *সমাজ*-এর অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়; এক্ষেত্রে "সমাজ হচ্ছে একটি স্থানীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে গ্রাম তার সামাজিক জীবন ও গ্রহণযোগ্য আচার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মানের নিয়ম-কানুন তৈরী করত ও তা প্রতিষ্ঠা করত" (Adnan, ১৯৯০, পৃ. ১৬৯)। সাম্প্রতিক গ্রাম সমীক্ষাগুলো হতেও দেখা যায় যে, কিছু কিছু গ্রামে *শালিস* পদ্ধতির অস্তিত্ব আছে; গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে গঠিত হয় এই শালিস দরবার। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের স্বার্থপর আচরণের কারণে *সমাজ*-এর প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব ও কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে (Arens and Van buerden, ১৯৭৭)। *সমাজ*-এর সদস্যপদ স্থায়ী নয়। সমাজ প্রায়ই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, কখনও কখনও আবার একতাবদ্ধও হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে আবার সমাজ-এর প্রভাব প্রতিপত্তির মাত্রা হয় ভিন্ন। ঐতিহাসিক উপকরণসমূহ এই অনুকল্পকে সমর্থন জোগায়। অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হল, বাংলাদেশের গ্রামে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকজনের ক্ষেত্রে কোনও সাধারণ পদ-নাম নেই। কুমিল্লা জেলায় গ্রামের প্রভাবশালী লোকজন *সর্দার* আর *মাতব্বর* নামে পরিচিত। ঢাকা জেলায় তাঁরা *মুরুব্বী* হিসেবে পরিচিত। রংপুর জেলায় তাঁদেরকে বলা হয় *পরামানিক বা দেওয়ান*, বগুড়া জেলায় তাদের পরিচিতি হল *মন্ডল*। কোনও কোনও এলাকায় বয়স্ক মানুষ-জনের অনানুষ্ঠানিক পরিষদ আছে যাকে বলা হয় *পঞ্চায়েত* বা বিচার সভা। আরও আছে অনানুষ্ঠানিক সামাজিক গ্রুপ, যাদেরকে *সমাজ, রেওয়াই বা মানত* হিসেবে বর্ণনা করা হয়। পদ-নামের এ ধরনের ভিন্নতা হতে প্রতীয়মান হয় যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কোনও সমরূপ পদ্ধতি ছিল না। সাম্প্রতিক প্রায়োগিক গবেষণা

হতে দেখা যায় যে, এ সব সামাজিক দল কখনও গ্রাম সরকারের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করেনি। তুলনামূলক বিশ্লেষণ হতে বোঝা যায় যে, উত্তর ভারতের গ্রামের তুলনায় বাংলাদেশী গ্রামে প্রতিষ্ঠানিক সংঘবদ্ধতা ছিল দুর্বল (Thompson, ১৯২১)। বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য কোনও কেন্দ্রীয় স্থান ছিল না। প্রাপ্ত তথ্যাদি জোর ইঙ্গিত দেয় যে, ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক সংঘবদ্ধতা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশের গ্রামীণ বসতির চাইতে দুর্বল ছিল। জে. এইচ. লিণ্ডসে যথার্থই সিদ্ধান্ত পৌঁছেছেন যে, বাংলার ক্ষেত্রে গ্রাম-সমাজ হল একটি কিংবদন্তি; ব্রিটিশ-পূর্ব কালেও তার অস্তিত্ব ছিল না (Lindsay, ১৯৬৪, পৃ. ৫১২)।

ব্রিটিশ প্রশাসকদের দ্বিতীয় অনুকল্পটি হচ্ছে এই যে, গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সংঘবদ্ধতা বাংলার পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে ক্রমশ তীব্র হয়েছে; গুণগত তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এ অনুকল্প। সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ সমর্থিত হয়েছে। মাণ্ডিলবাউম-এর তত্ত্বানুসারে দক্ষিণ এশিয়ায় তিন ধরনের গ্রামীণ বসতি চিহ্নিত করা যায়। প্রথম ভাগে রয়েছে কেন্দ্রঘেরা (nucleated) গ্রাম, যেখানে কেন্দ্রের চারিদিকে গাদাগাদি করে একগুচ্ছ বাড়ী গড়ে উঠেছে, চারিদিকে গ্রামের মাঠ, হয়তবা তার সাথে রয়েছে একাধিক পাড়া। দ্বিতীয় ভাগে আছে রৈখিক বসতি (linear settlement) – এ ধরনের বসতিতে বাড়ীঘর থাকে ছড়ানো-ছিটানো; কোথায় একটি গ্রামের শেষ আর অন্য এক গ্রামের শুরু তার কোনও ভৌত সীমারেখা নেই। তৃতীয় ভাগের মধ্যে আছে ক্ষুদ্র পাহাড়ী বসতি – যেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু বাড়ীঘর গড়ে উঠেছে (Mandlebaum, ১৯৭৪, পৃ. ৩৩৭)।

নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষাদৃষ্টে দেখা যায় যে, পশ্চিম বাংলার গ্রাম মূলত কেন্দ্রঘেরা গ্রাম; প্রতিতুলনায় বাংলাদেশের বসতির ধরন রেখা-সদৃশ। কেন্দ্র-ঘেরা গ্রাম তুলনামূলকভাবে অধিক পুরাতন; স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী উচ্চ বর্ণের দখলে তার অধিকাংশ জায়গা-জমি। অপরদিকে রৈখিক গ্রামগুলো হচ্ছে তুলনামূলকভাবে নতুন বসতি; সেখানে জমির মালিকানা অধিকতর সমতাভিত্তিক। রৈখিক বসতিগুলোতে কোনও ব্যক্তি এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত না। এ ধরনের গ্রামে কোনও বিরোধ মীমাংসার জন্য বা জনগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য গ্রামের সমস্ত প্রভাবশালী লোকজনকে দাওয়াত করতে হত। নিশ্চিত করেই বলা যায়, বিচ্ছিন্ন রৈখিক বসতির চাইতে কেন্দ্র-ঘেরা গ্রাম নিয়ন্ত্রণ করা ছিল সহজতর। বাংলাদেশ অঞ্চল ছাড়া দক্ষিণ ভারতের কেরালা ও কঙ্কন-এ রৈখিক বসতির অস্তিত্ব ছিল।

ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক - উভয় ধরনের প্রমাণপঞ্জি বাংলাদেশ অঞ্চলে ছড়ানো-ছিটানো রৈখিক বসতির সংখ্যাধিক্যের ইঙ্গিত দেয়। দক্ষিণ বাংলার বরিশাল জেলার একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিস্থানীয় একটি গ্রামকে এভাবে বর্ণনা করেছেন : "বাড়ী-ঘরগুলোর অবস্থান ছড়ানো-ছিটানো; যৌথ গ্রামীণ জীবনের লক্ষণ তাতে নেই বললেই চলে। প্রতিটি বাড়ী আলাদা-আলাদাভাবে ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে; চারদিকে ফলমূলের ঘন বৃক্ষরাজি, ১০০ গজের ভেতর অন্য কোনও বাড়ী চোখে পড়ে না"। কুমিল্লা জেলার একটি গ্রামকে বর্ণনা করতে গিয়ে একই ধরনের

কথা বলেছেন বারতুচ্চি : "অন্যান্য জায়গায় প্রায়শ কৃষকদের গ্রামকে সীমানার দিকে থেকে আলাদা সুচিহ্নিত বসতি-পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, সে ধরনের গ্রামের দেখা মেলে না কুমিল্লায়। বলা চলে, বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটি একটি মধ্যবর্তী পর্যায়ে সংগঠন যা ভৌগোলিকভাবে প্রসারমান। নবাগত লোকজনের জন্য তাদের দ্বার অবারিত। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাত্রার বিবেচনায় এখানে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক গ্রুপের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক প্রাসঙ্গিক হতে পারে, অপ্রাসঙ্গিকও হতে পারে" (Bertucci, ১৯৭০)।

ঐতিহাসিক উপকরণাদি ইঙ্গিত দেয় যে, প্রাচীনকালে বাংলাদেশ অঞ্চলের গ্রাম পশ্চিম বাংলার চাইতে অনেক ছোট ছিল। গোবিন্দ কেশর-এর ভাট্টেরা তাম্রফলক (আনুমানিক ১৩শ শতাব্দী) ইঙ্গিত দেয় যে, সিলেট জেলায় গ্রামের গড় আয়তন ছিল ৪৬৮ একর (২৮টি গ্রামের উপাত্তের ভিত্তিতে) এবং প্রতি গ্রামে খানার গড় সংখ্যা ছিল মাত্র ১০.৫। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৯১ সাল থেকে পরিচালিত সকল শুমারিতেই দেখা গেছে সিলেটের গ্রামের গড় জনসংখ্যা বাংলাদেশের নিরিখে সর্বদাই সর্বনিম্ন ছিল। তপর্ণদীঘি তাম্রফলক অনুসারে (আনুমানিক ১২শ শতাব্দী) বিক্রমপুরের *বেলহিস্তি* গ্রামে ছিল ২০০.১ একর জমি। প্রতিতুলনায় পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলার গ্রাম ছিল আয়তনে বড় এবং তাতে ছিল অধিক সংখ্যক লোকের বাস। বল্লাল সেন-এর নৈহাটি তাম্রফলকে (১২শ শতাব্দী) লেখা আছে যে, বর্ধমানে বল্লালহিথা গ্রামে পতিত জমি ও নৌ চলাচলের জায়গাসহ ১৯১৬.১৫ একর জায়গা ছিল। লক্ষ্মণ সেনের (১২শ শতাব্দী) গোবিন্দপুর তাম্রফলকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্ধমানের বিদ্যাশাসন গ্রামের আয়তন ছিল ৪০০.৫ একর (পতিত জমি ও বনভূমিসহ), (রায়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ)। যদিও বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা অঞ্চলের গ্রামের আয়তন সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্যাদি অপ্রতুল, তবু এ ধরনের প্রমাণাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যে-সিদ্ধান্ত সমর্থন করে তা গ্রামীণ বসতির ধরন সম্পর্কিত সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধারণা করা যায়, বাংলাদেশে ক্ষুদ্র গ্রামের সংখ্যাধিক্য বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

পপকিনের অনুসরণে গ্রামীণ বসতিকে মোটামুটিভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : ১. প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংঘবদ্ধ গ্রাম, এবং ২. উন্মুক্ত গ্রাম। পৃথিবীর কৃষক-সমাজের অধিকাংশই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংঘবদ্ধ গ্রামে বাস করত; এদের অধিকাংশই এখন উন্মুক্ত গ্রামে বাস করে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রাম হচ্ছে একটি বদ্ধ সংগঠন, তাতে আছে "রাজস্ব পরিশোধের ক্ষেত্রে যৌথ দায়িত্ব, গ্রাম ও বহির্বিশ্বের সাথে সুস্পষ্ট সীমানা, জমির মালিকানার ওপর নিয়ন্ত্রণ, গ্রামের সদস্যপদের সু-নির্ধারিত ধারণা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রামের মালিকানাধীন জমি"। একটি উন্মুক্ত গ্রামের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে, "রাজস্ব পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব, গ্রাম ও বহির্বিশ্বের সীমানার অস্পষ্টতা, জমির মালিকানার ক্ষেত্রে কিছু-কিছু নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ন্ত্রণশূন্যতা, গ্রামের সদস্যপদ এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির ধারণার অস্পষ্টতা" (Popkin, ১৯৭৯, পৃ. ১-২, ৩২-৮২)। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ ও উন্মুক্ত গ্রাম হচ্ছে গ্রামের আদর্শ নমুনা-রূপ; কিন্তু তাকে হয়ত সর্বদা নির্ভেজালরূপে পাওয়া যাবে না। প্রায় সর্বদাই মাঝামাঝি কোনও অবস্থানের গ্রামের দেখা মেলে।

ব্রিটিশ প্রশাসকগণ যে গ্রামকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন তা ছিল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রাম। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও এলাকায় তার অস্তিত্ব ছিল। প্রতিতুলনায় আজকের বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত বাংলার বদ্বীপ এলাকার গ্রাম ছিল উন্মুক্ত গ্রাম। পশ্চিম বাংলা অঞ্চলের যে কেন্দ্র-ঘেরা গ্রাম ছিল তা ছিল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ ও উন্মুক্ত গ্রামের সংমিশ্রণ, সেখানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রামের উপাদান ছিল অধিকতর ক্রিয়াশীল।

অধ্যায় ২

গ্রামীণ বসতির গতিধারা

যে সব এলাকা নিয়ে আজকের বাংলাদেশ গঠিত – বাংলার এই পরিবর্তনশীল বদ্বীপ অঞ্চলের গ্রামীণ বসতির গড়নের বিশ্লেষণ ইঙ্গিত দেয় যে, একটি সাধারণ প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রামের বসতির ধরন ছিল রৈখিক ও ছড়ানো-ছিটানো। তুলনামূলকভাবে পশ্চিম বাংলায় অন্তর্ভুক্ত মৃতপ্রায় বদ্বীপে ছিল কেন্দ্র-ঘেরা গ্রাম। বাংলাদেশের গ্রাম ছিল প্রধানত 'উন্মুক্ত' (open); অপরপক্ষে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশের প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রাম ছিল 'প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ' (corporate)। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশ সব গ্রামই এক ধরনের ছিল। কোনও কোনও বিষয়ে কিছু গ্রাম সাধারণ ধরন থেকে ভিন্নতর ছিল; সেটাই স্বাভাবিক। এতদ্‌সত্ত্বেও গ্রামীণ বসতির পরিসংখ্যানগত সমরূপতার ব্যাপারে সাধারণভাবে মন্তব্য করা যায়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে হিকস্ যে পরিসংখ্যানগত সমরূপতার তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন তা এ ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য : "চাহিদা তত্ত্বের কথাই ধরা যাক; আমরা দাবি করি না যে, কোনও নির্দিষ্ট একজন ভোক্তার আচরণের প্রসঙ্গে আমরা অর্থপূর্ণ কিছু বলতে পারব। তার আচরণ হয়তবা তার নিজস্ব প্রণোদনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু আমরা দাবি করি যে, পুরো বাজারের আচরণের ব্যাপারে আমরা বক্তব্য রাখতে সক্ষম...। এ ধরনের 'পরিসংখ্যানগত আচরণই' সুনির্দিষ্টভাবে অর্থনীতির বিচরণক্ষেত্র" (Hicks, ১৯৬৯, পৃ. ৩-৪)। তাই এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমরা মুখ্যত জোর দিয়েছি বাংলার গ্রামীণ বসতির সাধারণ ধরনের ওপর।

গ্রামীণ বসতির কাঠামোর নির্ণায়কের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে দু'টি প্রধান ঘরানা রয়েছে : ১. মনস্তাত্ত্বিক ও ২. অর্থনৈতিক। মনস্তাত্ত্বিক ঘরানার অনুসারীগণ দাবি করেন যে, গ্রামের কাঠামো গড়ে উঠে জীবনের প্রতি গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে অবশ্য মতপার্থক্য রয়েছে। স্কট-এর মতো নৈতিকতাবাদী অর্থনীতিবিদগণ (moral economist) মনে করেন যে, কৃষকদের মধ্যে পরস্পরকে সহযোগিতা করার প্রবণতা রয়েছে এবং জীবনের প্রতি এ ধরনের সহযোগিতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানিকভাবে সংঘবদ্ধ গ্রাম। অন্য এক ঘরানার অনুসারীগণ দাবি করেন যে, কৃষকরা একজন অপরজনকে বিশ্বাস করে না; ফলে তারা উন্মুক্ত গ্রামে বাস করতে চায়।

নৈতিকতাবাদী অর্থনীতিবিদগণের ধারণা হচ্ছে – গ্রামের অধিবাসীরা ঝুঁকি নিতে চায় না, তাদের প্রধান এবং প্রথম বিবেচনা হচ্ছে নিরাপত্তা। তাঁদের মতে সম্ভাব্য গ্রাসাচ্ছাদনের সংকট থেকে গ্রামের অধিবাসীদের রক্ষা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রাম গড়ে তোলা হয়। এ ধরনের গ্রাম শ্রম বিনিময়, এতিম ও বিধবাদের প্রতিপালনের জন্য যৌথ সম্পত্তির ব্যবহার, ফসলহানির ক্ষেত্রে খাজনা হ্রাস, বিত্তশালী

ব্যক্তি (পৃষ্ঠপোষক) কর্তৃক দরিদ্রদের (পোষ্য) ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে উৎসাহিত করে। এর পেছনে মূল যে নীতি কাজ করে তা হচ্ছে সমাজে "সবারই একটি স্থান থাকবে, জীবিকার ব্যবস্থাও থাকবে; তবে সবাই সমান হবে এমন কোনও কথা নেই" (Scott, ১৯৭৬)।

স্কট-এর এই সাধারণীকৃত বক্তব্যের ভিত্তি হচ্ছে ইন্দোচীনের আন্নাম-এ গ্রামীণ বসতির ওপর তাঁর গবেষণা। গ্রামবাসীদের যৌথ কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষমতাকে তিনি অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করেছেন; এ ধরনের যৌথ কার্যক্রম কদাচিৎ নিরাপত্তা বিধান বা কল্যাণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। ইন্দোচীনের অন্যান্য অংশের অভিজ্ঞতা স্কট-এর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে না। কোচিনচীনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্যামুয়েল পপ্‌কিন বলেছেন যে, গ্রামবাসী কৃষকদের পক্ষে যৌথ কার্যক্রম সংগঠিত করা অত্যন্ত কঠিন।

নৃতাত্ত্বিক জর্জ ফস্টার কৃষকদের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে পুরোপুরি বিপরীতধর্মী এক মতবাদ উপস্থাপন করেছেন। তিনি মেক্সিকো থেকে তাঁর গবেষণার উপকরণ আহরণ করেছেন। তাঁর এই মতবাদ বিভিন্ন নামে পরিচিত – যেমন, 'সীমাবদ্ধ কল্যাণ-এর ধারণা' (Image of limited Good), 'ঘাটতি-সচেতনতা' (Scarcity Consciousness) বা 'কৃষকের হিসসা' (Peasant Pie) ইত্যাদি নামে পরিচিত। এই মতের অনুসারীগণ প্রাক-অনুমান পোষণ করেন যে, কৃষকরা বিশ্বাস করে সৌভাগ্য তাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত। এ ধরনের সমাজে সব ধরনের লেন-দেনকে হারজিতের খেলা (Zero sum game) হিসেবে দেখা হয় – তার মানে একজনের লাভ অন্যজনের সমপরিমাণ ক্ষতির সৃষ্টি করে। অবিশ্বাস, শত্রুতা ও সন্দেহের কারণে কৃষকদের মধ্যে সহযোগিতা অত্যন্ত বিরল (Foster, ১৯৬৪)। এ ধরনের গ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক সংঘবদ্ধতার মাত্রা কম হওয়াই স্বাভাবিক।

গ্রামীণ বসতির কাঠামোতে প্রভূত ভিন্নতার কারণে মেক্সিকোর ক্ষেত্রে ফস্টারের তত্ত্ব সকল কৃষক সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বিপজ্জনক। ফস্টার নিজেও স্বীকার করেছেন, বিপদ-আপদের পরিস্থিতিতে কৃষকরা সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা-প্রত্যাশী হয়ে উঠতে পারে (Foster, ১৯৬৫, পৃ. ৩০১)। পরিণামে অনেক এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রাম গড়ে ওঠে।

গ্রামীণ বসতি কাঠামোর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা গড়ে উঠেছে সামাজিক চয়ন তত্ত্বের ভিত্তিতে (social choice); এ তত্ত্ব বাজার-বহির্ভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই দৃষ্টিকোণের অন্তর্নিহিত প্রাক-ধারণা হচ্ছে – রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও দক্ষতা নির্ভর করে অর্থনৈতিক লাভালাভের ওপর। প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মূলত সামাজিক সেবার সুষ্ঠু সরবরাহ যথা, নিরাপত্তা বিধানের এবং ঋণাত্মক বহিঃপ্রভাব (externality) হ্রাসের উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু একটি চুক্তি ব্যবস্থা। এ ধরনের চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা সেখানেই সফল হয় যেখানে সামাজিক চুক্তির সুফল চুক্তির শর্ত নির্ধারণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন ব্যয় থেকে অধিক হয়। সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক সুফলের মধ্যে যদি ভিন্নমুখিতা দেখা দেয় এবং চুক্তিতে আবদ্ধ বিভিন্ন পার্টি যদি একে অন্যাকে অবিশ্বাস করে তবে এ ধরনের চুক্তির ফলাফলে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

জাপানী গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন হায়ামি। তিনি মনে করেন যে, গ্রাম হচ্ছে এমন "একটি জনগোষ্ঠী যা সামাজিক পণ্য সরবরাহ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে বহিঃপ্রভাবকে আত্মস্থ করার জন্য যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করে" (Hayami, ১৯৮১)। তিনি যে অনুকল্প উপস্থাপন করেছেন তা হচ্ছে এমন : গ্রামীণ বসতির কাঠামোতে প্রাতিষ্ঠানিক সংঘবদ্ধতার পেছনে যে মূল বাধ্যবাধকতা কাজ করে তা হচ্ছে তুলনামূলক অপ্রতুলতা–শ্রমের তুলনায় শ্রম-বহির্ভূত সম্পদের অপ্রতুলতা। বাজারের ব্যর্থতার কারণে মূল্য-পদ্ধতির মাধ্যমে এই অপ্রতুল সম্পদ বণ্টনের সমস্যা সমাধা করা যায় না। তিনি 'শিথিলভাবে কাঠামোবদ্ধ' থাইল্যান্ডের গ্রামের সাথে 'দৃঢ়ভাবে কাঠামোবদ্ধ' জাপানের গ্রামের তুলনা করে নিম্নোক্ত অনুকল্প উপস্থাপন করেছেন :

১. থাইল্যান্ডে জমিজমা ছিল প্রচুর এবং সম্পত্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। অপরপক্ষে, জাপানী গ্রামে জনসংখ্যার চাপ ছিল অত্যধিক; সেজন্য সম্পত্তি রক্ষা ও তাকে চিহ্নিত করার জন্য দক্ষ সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।
২. কোনও কোনও এলাকায় পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। যদি পরিবেশগতভাবে পানি নিয়ন্ত্রণযোগ্য না হয়, বা মনুষ্য প্রচেষ্টা দ্বারা অন্যত্র তা পুনর্বণ্টন না করা যায় তবে পানিকে অপ্রতুল সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। থাইল্যান্ডের বার্ষিক বন্যার নিয়ন্ত্রণ ছিল থাই গ্রামবাসীদের সাধ্যের অতীত। ফলে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য থাইল্যান্ডের কৃষকদের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে জাপানে ধান চাষ গড়ে ওঠে পাহাড়ের ধাপে এবং পাহাড় মধ্যবর্তী সমতল জমিতে। এ ধরনের ভূমিতে ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলে কার্যকরভাবে পানি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ ভিত্তিতেই হায়ামি যুক্তি দেখিয়েছেন, জাপানী গ্রামে দৃঢ়ভাবে কাঠামোবদ্ধ সামাজিক পদ্ধতি গড়ে ওঠার পেছনে প্রধান বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে সেচ ব্যবস্থা গড়া, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য দলীয় কার্মকান্ডের প্রয়োজনীয়তা থেকে।
৩. থাইল্যান্ডে বছরের প্রায় যে কোনও সময়ই ধান উৎপাদন করা যায়। জাপানে মাত্র গ্রীষ্মকালের একটি স্বল্প পরিসরে ধান উৎপাদিত হয়। জাপানে শ্রম ও পানি ব্যবহারের সময় ও পরম্পরার ক্ষেত্রে নিবিড় সহযোগিতার জন্য আট-সাট সময়সূচি মেনে চলার প্রয়োজন পড়ে। সে জন্যই জাপানী গ্রামে সুসংঘবদ্ধ সংগঠন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়।

কোচিনচীনের গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক সংঘবদ্ধতার অনুপস্থিতিকে পপ্‌কিন (Popkin, ১৯৭৯) অর্থনৈতিক আয়-ব্যয়ের (cost-benefit) পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে, চিরাচরিত কৃষক সমাজের সদস্যরা দলীয় স্বার্থের চাইতে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করে দেখে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, গ্রামের কাঠামো প্রকৃত সামাজিক আয় ব্যয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না, বরং তা নির্ধারিত হয় আয়-ব্যয় সম্পর্কে গ্রামবাসীদের ধারণার ভিত্তিতে। কৃষকরা উপলব্ধি করে যে, অনিশ্চয়তার ঝুঁকি থেকে বাচার জন্য গ্রামব্যাপী যদি কোনও কার্যক্রম হাতে নেয়া হয় তবে তা ভেস্তে যায়। যারা সেই কার্যক্রম থেকে সুফল প্রাপ্তির যোগ্য নয় এমন মাগনা-সওয়ারির (free rider) জন্য তা

ব্যর্থ হয়ে যায়; ব্যয়ের জন্য তাদের অংশ পরিশোধ না করেই এ সব মাগনা-সওয়ারি দলীয় কর্মকাণ্ডের সুফল হাতিয়ে নেয়। ফলে কৃষকরা ছোট দলে, যেমন পরিবারে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের নিশ্চয়তা চায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে স্বভাবতই গ্রামবাসীরা যৌথ কর্মকাণ্ডের সুফল সম্পর্কে সন্দিহান থাকে। ফলে গ্রাম শিথিল ও উন্মুক্ত হয়ে ওঠে।

হায়ামি ও পপ্‌কিনের অর্থনৈতিক তত্ত্ব তুলে ধরে যে, যৌথ কর্মকাণ্ডের লাভালাভের নির্ধারক অঞ্চলভেদে ভিন্ন হতে পারে। রবার্ট ওয়েইড (Wade. ১৯৮৫) বলেছেন যে, একই অঞ্চলে গড়ে-ওঠা বিভিন্ন গ্রামীণ সংগঠনে অর্থনৈতিক আয়-ব্যয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ফসলের ধরন, সম্পদের লভ্যতার সামান্য তারতম্যের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিন্ন হতে পারে। অন্ধ্র প্রদেশে মাঠ-পর্যায়ে গবেষণার ভিত্তিতে তিনি সকল যৌথ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মোটামুটি ছ'টি উপাদান চিহ্নিত করেছেন :

১. **যৌথভাবে বন্দোবস্তিযোগ্য সম্পদ** : যৌথভাবে বন্দোবস্তিযোগ্য সম্পদ যদি সুচিহ্নিত থাকে, সেইসাথে তা যদি পরিমাণে সামান্য হয় যা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়, তা হলে একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

২. **বাদ পড়ার মূল্য** : কোনও কর্মকাণ্ড হতে বাদ দেওয়ার খরচ (যথা বেড়া দেওয়া) যদি বেশি হয় তবে সফল যৌথ কার্যক্রম হাতে নেয়ার প্রণোদনা তীব্র হয়।

৩. **যৌথভাবে বন্দোবস্তিযোগ্য সম্পদ ও ব্যবহারকারী দলের সম্পর্ক** : নিম্নবর্ণিত উপাদানসমূহ কার্যকর যৌথ-কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে : ক. যৌথভাবে বন্দোবস্তিযোগ্য সম্পদ এবং ব্যবহারকারীর বাসস্থানের অবস্থানের নৈকট্য (কারণ তাতে ব্যবহারকারী ঐ সম্পদের ব্যবহারের দক্ষতায় অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠে), খ. বেঁচে থাকার জন্য সম্পদের অধিকতর চাহিদা ও অপরিহার্যতা, এবং গ. যৌথভাবে-বন্দোবস্তিযোগ্য সম্পদ টেকসই সুফল দেবে এইমর্মে উপলব্ধি।

৪. **ব্যবহারকারী দল** : কার্যকর সহযোগিতা দলের সমরূপতার ওপর নির্ভরশীল (ছোট দলের সমরূপ হবার সম্ভাবনা বেশি)। কার্যকর সহযোগিতা আরও নির্ভর করে যৌথভাবে-বন্দোবস্তিযোগ্য সম্পদে সুবিধাভোগীদের তুলনামূলক ক্ষমতা, আলাপ-আলোচনা ব্যবস্থার অস্তিত্ব এবং নিয়ম-ভঙ্গের জন্য শাস্তি – এমন সব উপাদানের ওপর।

৫. **শনাক্তীকরণ পদ্ধতি** : কার্যকর সহযোগিতার আরেকটি আবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে নিয়মভঙ্গকারী সুযোগ-সন্ধানীদের সহজে শনাক্ত করার পদ্ধতি।

৬. **রাষ্ট্র কর্তৃক স্থানীয় অধিকারের স্বীকৃতি** : রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা সংরক্ষণের অপারগতা তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করে।

হায়ামি, পপ্‌কিন ও ওয়েইড উপস্থাপিত অর্থনৈতিক মডেল স্পষ্ট ইঙ্গিত করে যে, গ্রামের কাঠামোর ক্ষেত্রে কোনও সাধারণীকরণই সম্ভব নয়। গ্রামীণ বসতি যে ভৌত ও সামাজিক আবহে ক্রিয়াশীল থাকে তা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের গ্রামের উন্মুক্ততা ব্যাখ্যা করার প্রথম চেষ্টা করেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় কর্মরত ব্রাউনি নামের একজন প্রশাসক। কৃষকদের ঘন ঘন অভিবাসনকে তিনি বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোর গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার কারণ বলে চিহ্নিত করেন। তাঁর মত হল, পূর্ব বাংলায় অভিবাসন ঘটত জনসংখ্যার স্বল্পতার কারণে; এ এলাকায় কৃষকরা ছিল "দেশান্তরী পাখীর মতো; জমির অপরিশোধিত খাজনার পরিমাণ যখন বেড়ে যেত এবং পরিশোধ করা জরুরি হয়ে পড়ত তখনই তারা তাদের আবাসভূমি ছেড়ে যেত" (Schendel-এ উদ্ধৃত; পৃ. ২১৩)। এই তত্ত্বের তিনটি দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। প্রথমত, জনসংখ্যার স্বল্পতা এককভাবে পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রাক-ব্রিটিশ যুগে দক্ষিণ এশিয়ায় জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বত্রই ছিল কম। ইরফান হাবিবের (Habib, ১৯৬৯, পৃ. ৩৪) ধারণা মতে মোগল ভারতে চাষাবাদের আওতায় জমির পরিমাণ ছিল, "এই শতাব্দীর প্রথম দিকে মধ্য-গাঙ্গেয় অববাহিকার জমির আনুমানিক অর্ধেক"। "এমনকী ১৮০০ সালের উপমহাদেশকেও একটি অনাবাদী দেশ" বলে বর্ণনা করেছেন মরিস ডি. মরিস (Morris D. Morris, ১৯৬৩, পৃ. ৬০৯)। পালিত-এর মতে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাংলায় চাষাবাদের আওতায় জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ৩০ লাখ একর; অপরপক্ষে, ১৮৬৭ সালে বাংলায় চাষাবাদের আওতায় জমির পরিমাণ ৭ কোটি একর বলে ধারণা করা হয়েছে (Palit, ১৯৭৫, পৃ. ১৫৪)। ব্রাউনির অনুকল্প যদি সত্য হয় তবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও উন্মুক্ত গ্রামের প্রাধান্য থাকা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, সময়ের দীর্ঘ পরিসরে উচ্চ হারে খাজনা ধার্যকরণ ভূস্বামীদের জন্য লাভজনক নয়। কারণ, এর ফলে কৃষকরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। শ্রম-ঘাটতির অর্থনীতিতে এ ধরনের ভূস্বামীরা যথেষ্ট সংখ্যক প্রজা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় না। অপরদিকে দেশান্তরী হবারও খরচ আছে, আছে বিভিন্ন ঝক্কি-ঝামেলা। যদি খাজনার অংক ন্যায্য হত তাহলে প্রজারা দেশত্যাগ করত না। উচ্চহারে খাজনা পরিশোধের কারণে কৃষকদের দেশত্যাগ কোনও গ্রামীণ সমাজের নিয়মিত বৈশিষ্ট্য হতে পারে না; এ ধরনের সম্ভাবনা ক্ষীণ। পরিশেষে বলা যায়, অভিবাসন ও উন্মুক্ততার কার্য-কারণ সম্পর্কের ক্রমও সুস্পষ্ট নয়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ একটি গ্রাম থেকে দেশত্যাগ কঠিন, কারণ গ্রামই যে কোনও লোকের দেশত্যাগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। ফলে দেশত্যাগ গ্রামের উন্মুক্ততার ফল হতে পারে, কারণ না-ও হতে পারে।

বাংলাদেশের গ্রামের আনুষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার অভাবের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের পটভূমিতে টার্নার প্রণীত সীমান্ত-তত্ত্বের অনুসরণে উপস্থাপন করা যেতে পারে। টার্নারের মতে, সীমান্ত সর্বদাই বিদ্রোহী; ভিন্ন-মতাবলম্বী ও সমাজের সাথে খাপ-না-খাওয়া লোকজনকে আকৃষ্ট করে। অব্যাহতভাবে 'খাপ-না-খাওয়া' মানুষজনের কেন্দ্র ছেড়ে সীমান্তে গমন সীমান্তের ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখে (Turner, ১৯৫৩)। সীমান্তে জীবন স্বাধীন, অনানুষ্ঠানিক ও সহজ। দু'কারণে সীমান্ত উন্মুক্ত গ্রামকে উৎসাহিত করতে পারে। প্রথমত, সীমান্তে অভিবাসীদের প্রবণতা হচ্ছে অস্থিরতা, কর্তৃপক্ষকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন এবং তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। এ ধরনের আবহ

আনুষ্ঠানিক-ভাবে সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে নিরুৎসাহিত করে। দ্বিতীয়ত, সীমান্তে বসতি থাকে নবীন। বাংলা বদ্বীপে নৃতাত্ত্বিকদের পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সীমান্তের 'নতুন' অঞ্চলের বসতিতে মধ্য ও নিম্ন জাতির লোকজনের বাস; সেখানে ভূমির স্বত্বাধিকার ন্যায্যভাবে বণ্টিত এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া খুব স্বল্প (Mandelbaum, ১৯৯০, পৃ. ৩৩৯)।

বাংলার মধ্য-যুগের ইতিহাস ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ইটন সীমান্ত তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, "তুর্কি-মোগল বিজয় ও অভিবাসনের অব্যাহত প্রক্রিয়ার শেষপ্রান্ত – বাংলা ছিল একটি সীমান্ত অঞ্চল" (Eaton, ১৯৯৪, পৃ. XXIII)। টার্নারের সীমান্ত তত্ত্বের "চাপ নিঃসরণের দ্বার" (safety valve) ব্যাখ্যানের যথার্থতা স্বীকার করেন ইটন। এ ব্যাখ্যান অনুসারে 'বিক্ষুব্ধ' ও অবাধ্য লোকজনকে সীমান্তে ঠেলে দিয়ে কেন্দ্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়। ইটনের ভাষায় বাংলা "দিল্লীর সামাজিক অবাঞ্ছিতদের জন্য আস্তাকুড়"-এ পরিণত হয়। তিনি সুলতান জালাল-আল-দীন কর্তৃক বাংলায় এক সহস্র অপরাধীর বিতাড়নের ঘটনা উল্লেখ করেন (১২৯০-'৯৬)। সুলতান আশা করেছিলেন যে, এ সব অপরাধী লক্ষ্মণাবতীতে বসবাস করতে বাধ্য হবে, ভবিষ্যতে আর কখনও দিল্লীর আশে-পাশের এলাকায় উপদ্রব করবে না (১৯৯৪, পৃ. ৪১)। তবে ইটন দু'টো বিষয়ে টার্নারের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। প্রথমত, টার্নারের তত্ত্ব ভৌগোলিক সীমান্তের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে। ইটন অপরপক্ষে তিনটি সীমান্ত চিহ্নিত করেছেন: কৃষি সীমান্ত (কৃষিকাজে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর সাথে বনভূমির বিভক্তি), রাজনৈতিক সীমান্ত (বাদ-বাকি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক সত্তা থেকে এর পার্থক্য) এবং ইসলামি সীমান্ত (যা অমুসলমান জনগোষ্ঠী থেকে মুসলমান জনগোষ্ঠীর পার্থক্য নির্ণয় করে)। টার্নারের সীমান্ত স্থির; ইটনের সীমান্ত চলমান।

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সীমান্ত-কাঠামো বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসের সন্তোষজনক কোনও ব্যাখ্যা প্রদান করে না। প্রথমত, সীমান্ত একটি আপেক্ষিক ধারণা। সীমান্ত পরিস্থিতি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থায়ী হয় না। সীমান্তে যখন উপনিবেশ স্থাপন করা হয় তখন তাকে কেন্দ্র থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না। ঐতিহাসিক সূত্র থেকে ইঙ্গিত মেলে যে, প্রায় দু'হাজার বছরের অধিককাল ধরে বাংলাদেশ বদ্বীপের বিভিন্ন অংশে অব্যাহতভাবে বসতি স্থাপিত হয়েছে। আরও দেখা যায় যে, বাংলাদেশ অঞ্চলের পুরোনো বসতি ও নতুন বসতির সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয়ত, আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের মতো বাংলা কখনও জনশূন্য দেশ ছিল না। ১৮৭২-এ ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলোর মধ্যে বাংলার জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি (৭নং সারণি দেখুন)। অতীতেও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলার জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল বেশি – এ ধারণার পেছনেও যথেষ্ট জোরালো যুক্তি আছে।

সারণি-৭
ভারতে প্রদেশওয়ারী জনসংখ্যার ঘনত্ব, ১৮৭২

প্রদেশ	প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব
আজমীর মারওয়ার	১৪৫
আসাম	৭৮
বাংলা	৪৩৩
বিহার ও ওড়িশা	৩১৮
বোম্বাই	১৩২
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৯৯
কোর্গ	১০৬
মাদ্রাজ	২১৯
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব	১৫৫
আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশ	৩৯১

সূত্র : Census of India, ১৯১১

জনসংখ্যাবিদদের অভিমত হচ্ছে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মধ্যে যে দু'হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছে সে-সময়ের পরিসরে দক্ষিণ এশিয়ার জনসংখ্যা মোটামুটি স্থির ছিল, এবং "সময়ের দীর্ঘ পরিসরে এর প্রবণতা কোনও সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় স্থিত হওয়াই স্বাভাবিক" (Davis, ১৯৫১, পৃ. ২৪)। প্রাক-শিল্প সমাজের জন্মের উচ্চহারকে প্রশমিত করে মৃত্যুর উচ্চহার; ফলে জনসংখ্যায় স্থিতি আসে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্ব সম্ভবত কোনও বিচ্যুতি নয়, পূর্বেকার প্রবণতারই ধারাবাহিকতা। জনসংখ্যার প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে ধারণা করা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের জনসংখ্যার চাইতে বেশি ছিল। সত্য বটে, বাংলা অব্যাহতভাবে উত্তরাঞ্চল থেকে অভিবাসী গ্রহণ করেছে। তবে, বাংলা বদ্বীপে অভিবাসনের ক্ষেত্রে দু'টি ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। প্রথমত, বাংলায় অভিবাসনের পরিধিকে ঐতিহাসিকগণ (যেমন, ইটন) অতিরঞ্জিত করেছেন। এই এলাকায় বসতিস্থাপনকারী পুরো জনগোষ্ঠীর সংখ্যার বিচারে কোনও নির্দিষ্ট সময়ে অভিবাসী জনসংখ্যার শতকরা হার খুব বেশি হবে বলে মনে হয় না। আর সে জন্যই অভিবাসীরা এই এলাকার সংস্কৃতির মূল চরিত্র ও ভাষা বদলাতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, অভিবাসন বাংলার ক্ষেত্রেই শুধু অনন্য ঘটনা নয়। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও একই ধরনের অভিবাসন ঘটেছে।

ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জি সুস্পষ্টভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশ অঞ্চলে জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের ইঙ্গিত দেয়। প্রাচীন বাংলার শিলালেখে অসংখ্য গ্রাম-বসতিতে প্রাণস্পন্দিত জীবনের উল্লেখ রয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর ভূমি-হস্তান্তর দলিলাদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে নীহার রঞ্জন রায় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে,

জনসংখ্যার চাপের কারণে কিছু কিছু গ্রাম প্রয়োজনীয় চাষযোগ্য জমির ঘাটতি অনুভব করতে শুরু করেছিল, এবং এই বাধ্যবাধকতা নতুন গ্রাম গড়ে তোলার পেছনে কাজ করেছিল (রায়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮৪)। চীনা পরিব্রাজক মা হুয়ান ১৪০৯-১৪১২ সালে পূর্বাঞ্চলীয় বাংলা পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে, বাংলাদেশ অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল অত্যন্ত বেশি (মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৬, পৃ. ৪৭২)। ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগীজ ঐতিহাসিক দ্যু ব্যারোস বলেছেন, গৌড় শহরের জনসংখ্যা "অত্যন্ত বেশি; মানুষজন আর গাড়ী-ঘোড়ার জটলায় ভরা রাস্তা-ঘাট; বিশেষ করে সেই-সব রাস্তায় জটলা আরও বেশি যে রাস্তা দিয়ে লোকজন রাজ-দরবারে আসে; ভীড় ঠেলে এগুনোই মুশকিল" (Ali, ১৯৮৫, খণ্ড IB-, পৃ. ৯৫০)। চতুর্দশ শতাব্দীর মরক্কোর পরিব্রাজক ইবনে বতুতা পূর্বাঞ্চলীয় বাংলায় মেঘনা কূলের গ্রাম বসতির বর্ণনা দিয়েছে এভাবে : "পনের দিন ধরে আমরা গ্রাম আর ফল-মূলের বাগানের মধ্য দিয়ে নদীর ভাটির টানে ভ্রমণ করেছি; মনে হয়েছে যেন আমরা একটি বাজারের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছি" (Ibn Batuta, ১৯৬৯, পৃ.২৭১)। ১৮০৭ সালের বাংলার জনসংখ্যাগত পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে ডা. ফ্রান্সিস বুকানন লিখেছেন : "জনসংখ্যা যে এখানে বিপুল হবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী মানুষের জীবনদৃষ্টিই মেয়েদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করে যে, মেয়েদের কর্তব্য হল অধিক সংখ্যক সন্তান উৎপাদন। আমি জোর দিয়ে এ কথা বলতে পারি যে, প্রাকৃতিকভাবে যতদূর সম্ভব ততদূর পর্যন্ত এ নির্দেশ প্রতিপালিত হয়। কোনও অবিবাহিত বালিকা রজঃবতী হলে স্থানীয় অধিবাসীরা তাকে বিরক্তি আর ঘৃণার চোখে দেখে, কিন্তু খুব স্বল্প সংখ্যক মেয়েকেই এ ধরনের অবমাননাকর অবস্থায় পড়ে থাকতে হয়" (Baverl-তে উদ্ধৃত, ১৮৭২, পৃ. ৮৩)। এ সব ঐতিহাসিক উৎস স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে বাংলায় বসতির ঘনত্ব কম হবে একথা মনে করার যুক্তি নেই। অবশ্য বাংলার সীমান্তে – জনবসতির প্রান্তিক এলাকায় বন-জঙ্গল ও নতুন জেগে-উঠা জমি ছিল। সন্দেহ করার অবকাশ নেই, বাংলাদেশ অঞ্চলের অধিকাংশ লোক বিগত এক হাজার বছর ধরে বনজঙ্গল-সাফ-করা নতুন জায়গা বা পুনরুদ্ধারকৃত জায়গার নয়, বরং পূর্ব-স্থাপিত বসতিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, ইটনের অগ্রসরমান এবং একাধিক সীমান্তের ধারণা কোনওক্রমেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইসলামি সীমান্তের ধারণাটিও অস্পষ্ট। মুসলমান ও অমুসলমান সমাজের ভেদ-রেখা হিসেবে এই সীমান্তকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উত্তর ভারতে দু'টি ইসলামি সীমান্ত ছিল (একটি পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর, অন্যটি বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর)। অধিকন্তু, এ ধরনের বিভক্তি শুধু যে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান ছিল তা-ই নয়, অধিকাংশ বসতির অভ্যন্তরেও এ ধরনের বিভক্তি ছিল। বাংলায় রাজনৈতিক সীমান্ত দক্ষিণ এশিয়ার সামাজিক-রাজনৈতিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে 'চাপ নিঃসরণের দ্বার' হিসেবে কাজ করেনি। উত্তর থেকে বিতাড়িত দুবৃত্তরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলায় তাদের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। তারা সবসময়ই দিল্লি পুনর্দখল করার চেষ্টা করত। ফলে, বাংলা বিদ্রোহীদের আস্তাকুড় ছিল না, বরং তা ছিল দিল্লির রাজনৈতিক শাসনের জন্য হুমকি। দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ

এলাকায় কৃষি সীমান্ত স্থির ছিল না, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে তা পরিবর্তিত হয়েছে; দক্ষিণ এশিয়ার সকল অঞ্চলে সকল কালেই অকর্ষিত বড় বড় ভূখণ্ড ছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে, বাংলার ক্ষেত্রে সীমান্ত কোনওক্রমেই অনন্য কোনও বিষয় নয়।

দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামীণ বসতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, গ্রামীণ বসতিতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে- সংঘবদ্ধ জীবনের জন্য তিনটি প্রধান বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান : ১. বাইরের আক্রমণকারীদের কাছ থেকে নিজেদের রক্ষা করা, ২. বন্য প্রাণীকূল থেকে আত্মরক্ষা, এবং ৩. গণ-পূর্ত ব্যবস্থাপনা, যেমন, সেচ ব্যবস্থা। যে সব এলাকার ঘন ঘন বাহির হতে আক্রমণের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মকাণ্ড। গোষ্ঠী, গোত্র ও গ্রাম-সমাজ প্রায় সর্বক্ষেত্রে এর সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান করে। দিল্লি-অঞ্চলে ছোট-বড় সব আকারের গ্রামই গ্রামের চারপাশে মাটির রক্ষা-দেয়াল নির্মাণ করত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সে সব দেয়াল রক্ষার জন্য পাহারা-স্তম্ভও নির্মাণ করা হত। মীরাট বিভাগে কয়েকশ' বছর ধরে জাটরা শত শত জাট-আধিপত্যাধীন গ্রামে যৌথ-প্রতিরক্ষা ও সরকারি প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ (regional council) পরিচালনা করেছে। জাট প্রতিষ্ঠানসমূহের নয়টি স্তর ছিল। প্রতি স্তরের সামাজিক একক অব্যবহিত নিম্নের স্তরের এককসমূহ নিয়ে গঠিত হত (Mandelbaum, ১৯৯০, পৃ. ২৮২-২৮৩)। রাজপুত, মারাঠা ও শিখরাও দৃঢ়বদ্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বজায় রেখেছিল। গ্রামীণ সংহতি বজায় রাখার জন্য যৌথ প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ছিল একটি অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান। বেডেন-পাওয়েল মন্তব্য করেছেন : "অশান্ত সময়ে কোনও গোষ্ঠী-প্রধানের দুর্গের আশ-পাশের এলাকা বা সাময়িক আশ্রয়স্থল ছাড়া কোনওক্রমেই কৃষিকাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যে সব প্রদেশে বিস্তীর্ণ খোলা সমতলভূমিতে বসতি গড়ে তোলা হয়েছে সেখানে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন পরিবার সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে। আকস্মিক আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য প্রতিটি দলকেই প্রস্তুত থাকতে হয়। ফলে, ভারতের অনেক জায়গায় গ্রামের বাড়ী-ঘরের চারিপাশে মাটির দেয়াল ও শক্ত ফটক তৈরী করা হয় যাতে গরু-বাছুর রক্ষা করা যায় এবং আকস্মিক হামলার সময় কৃষকরা আশ্রয় নিতে পারে" (Baden-Powell, ১৮৯৬, পৃ. ৬৭)। অন্যদিকে, বাংলায় তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিরক্ষার জন্য এ ধরনের বাধ্যবাধকতা দেখা যায় না। যে সব আক্রমণকারী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে উপমহাদেশ আক্রমণ করেছে তাদের গমনাগমন পথ থেকে দূরে অবস্থিত ছিল এই অঞ্চল। আক্রমণকারীদের প্রারম্ভিক রোষ সাধারণত বাংলা পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রশমিত হয়ে পড়ত। ফলে বিদেশি আক্রমণকারীদের কাছ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাংলায় প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে কম হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তবে, দক্ষিণ ও পূর্ব-বাংলার তুলনায় পশ্চিম বাংলার গ্রামবাসীদের যে অধিকতর শক্ত সংগঠনের প্রয়োজন ছিল তা অনুমান করা যায়। এ ক্ষেত্রে দু'টি কারণ উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলীয় বাংলার ভূ-প্রকৃতি আক্রমণকারীদের অব্যাহত দখলকে নিরুৎসাহিত করত। "এর জলাভূমি, খাল-বিল ছিল অনাকর্ষণীয়, নদী-নালার অন্তহীন জটাজাল সহজে পাড়িও দেয়া যায় না। পশ্চিম

থেকে স্থলপথে প্রবেশের পথও খুব বেশি একটা নেই...। উত্তরের আক্রমণকারীদের জন্য বাংলার বর্ষাকাল ছিল এক বিভীষিকা" (Imam, ১৯৮২, পৃ. ৭৫)। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশের তুলনায় পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় আক্রমণকারী সেনাদল ও লুণ্ঠনকারীদের লুট-তরাজের ঘটনা কমই ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম বাংলায় গ্রাম ছিল কেন্দ্র-ঘেরা; অপরপক্ষে, পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রামীণ বসতি ছিল রেখা-সদৃশ ও ছড়ানো-ছিটানো। রৈখিক ও বিচ্ছিন্ন কোনও বসতির চাইতে কেন্দ্র-ঘেরা বসতি রক্ষা করা সহজতর। আক্রমণ-আশংকার স্বল্পতা এবং প্রতিরক্ষার উচ্চ ব্যয়ের কারণে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলায় তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিরক্ষা সংগঠন গড়ে তোলা লাভজনক হয়ে ওঠেনি।

প্রায়শই অনুমান করা হয়, দু'কারণে বন-জঙ্গলের আশ-পাশের গ্রাম আনুষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রথমত, বন্য প্রাণীকুল জান-মালের প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করে; তাদের তাড়ানোর জন্য গ্রামবাসীদের ঐক্য প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ঘন জঙ্গল মনুষ্যবাসোপযোগী করার জন্য সামাজিকভাবে সংগঠিত কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ নিতে হয়।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক উৎসে বাংলার বিভিন্ন অংশে বন্য প্রাণীর সাময়িক আক্রমণের উল্লেখ রয়েছে। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ অঞ্চলের বসতিপূর্ণ এলাকায় বাড়ি-ঘরের গড়ন স্পষ্টভাবেই তুলে ধরে যে, জান-মালের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বন্য প্রাণীকে এখানে প্রধান হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। যে সব জায়গায় বন্য প্রাণীর আক্রমণের আশংকা খুব তীব্র সেখানে বাড়ি-ঘর তৈরি করা হয় খুঁটির ওপর। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় বাড়ি-ঘর খুঁটির ওপর নয় বরং তৈরী করা হয় মাটির ওপর। ফলে, এটি মনে করাই স্বাভবিক যে, বাংলাদেশ অঞ্চলে বন্য প্রাণী থেকে রক্ষা পাবার জন্য সামাজিক যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়নি।

এতদঞ্চলের ঘন জঙ্গলকে ধানী-জমিতে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত সাংগঠনিক দক্ষতা ও জনশক্তির প্রাচুর্যের গুরুত্বকে ইটন তাঁর লেখায় গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেছেন (Eaton, ১৯৯৪, পৃ. ২১১)। কিন্তু বাংলার বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ধরনের বনের পার্থক্য তিনি বিবেচনায় নেননি। মোটামুটি বলা চলে, এ অঞ্চলে তিন ধরনের বন ছিল : ১. পাহাড়ী বন, ২. অভ্যন্তরীণ বন এবং ৩. উপকূলীয় বন।

দেশের অভ্যন্তরীণ সমভূমির বন গ্রীষ্মাঞ্চলীয় আর্দ্র বাৎসরিক-পাতাঝরা বনের অংশ; স্থানীয়ভাবে তা শালবন নামে পরিচিত। বাংলা অঞ্চলের সর্বত্র বিশাল বিশাল শালবন ছিল। শালবনের অবশেষ এখনও ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লায় দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরনের বন পরিষ্কার করা সহজ। গাছ কেটে বন সাফ করা ছাড়াও, শুকনো মওসুমে গাছের মূল পোড়ানোর জন্য আগুন জ্বালানো হয়। (Government of Bangladesh, ১৯৯২, পৃ. ১০)। এ ধরনের বন পোড়ানোর ফলে যে ছাই হয় তা আশেপাশের জমিকে উর্বর করে। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও শালবন সাফ করা সম্ভব। পাহাড়ি বনে থাকে অনেক ধরনের গাছ - বিভিন্ন গ্রীষ্মাঞ্চলীয় চিরসবুজ বাৎসরিক-পাতাঝরা বৃক্ষ; তার সাথে আরও থাকে বাঁশের ঝাড়। পাহাড়ের বনাঞ্চল সাফ করার ফলাফল ক্ষতিকর (Khan, ১৯৮২, পৃ. ৩৯-৪৯)।

সাধারণত এ ধরনের বনময় উপত্যকা কৃষিকাজের জন্য সাফ করা হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আসামে বাঙালি অভিবাসীদের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, পাহাড়ি বনের উপত্যকায় কৃষিকাজের জন্য কোনও সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজন পড়েনি।

১৯২১ সালে আদম শুমারি কমিশনার আসামে বাঙালি অভিবাসীদের বসতি স্থাপনের অভিজ্ঞতাকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :

> "যেখানেই পতিত জমি পাওয়া গেছে সেখানেই ময়মনসিংহবাসীরা ছুটে গেছে। সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে, যেভাবে তারা খালি জায়গা দখল করেছে তা প্রায় রহস্যময় ঘটনার পর্যায়ে পড়ে। কোনও উত্তেজনা, হুড়োহুড়ি ছাড়া, জেলার রাজস্ব বিভাগের কর্মচারিদের জন্য অযথা কোনও বিপত্তি না ঘটিয়ে প্রায় পাঁচ লাখের এক বিশাল জনগোষ্ঠী গত পঁচিশ বছরে বাংলা থেকে আসাম উপত্যকায় নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে সরকারের একটি বিস্ময়কর প্রশাসনিক সাফল্য মনে হতে পারে, কিন্তু আদতে ব্যাপারটি তা নয়। এর সাথে শুধু বিপুল সংখ্যক পিঁপড়ের দলবদ্ধ যাত্রার তুলনা করা চলে" (Hazarika-য় উদ্ধৃত, ১৯৯৪, পৃ. ৭)।

আসামে বাঙালি অভিবাসীদের ইতিহাস স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলায় একই ধরনের পাহাড়ি বনাঞ্চল খুব কম খরচে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে আবাদযোগ্য করা সম্ভব হয়েছিল। তবে, বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে যে উপকূলীয় বন গড়ে উঠেছিল তা সাফ করা সহজ ছিল না। এ ধরনের বন পোড়ানো যায় না, এগুলো আপনাতেই আবার নতুন করে গজিয়ে ওঠে। এ সব জমি শুধু সাফ করলেই চলে না, লোনা পানির জোয়ার থেকে রক্ষা করার জন্য নতুন উদ্ধারকৃত জমির চারিপাশে বাঁধ দেয়ারও প্রয়োজন পড়ে। এ অঞ্চলে খাবার পানিও সহজে পাওয়া যেত না। তাই খাবার পানি সরবরাহের জন্য পুকুর খনন করতে হয়েছিল। ফলে উপকূলীয় বনে বসতি স্থাপন ছিল যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। তবে সে জন্য শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন আবশ্যক ছিল না। বরিশাল জেলার জমিদারেরা ঐ এলাকায় বন পরিষ্কার করার জন্য উপ-বন্দোবস্তি পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থ জুগিয়েছে। ফলে দক্ষিণ বাংলার নতুন বসতি এলাকায় তৃণমূল স্তরে শক্তিশালী ও সুসংহত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। বরিশালে বাড়ি-ঘর ছিল ছড়ানো-ছিটানো; যৌথ সামাজিক জীবন-যাপনের চরিত্র বা লক্ষণ ছিল তাতে খুবই কম। উক্ত বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ ও তার আশ-পাশের অঞ্চলে বন-জঙ্গলের অস্তিত্ব প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রামীণ বসতি গড়ে তোলাকে উৎসাহিত করেনি। যৌথ সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যয়ের তুলনায় লাভ ছিল কম।

সবসময় পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা যে কোনও মনুষ্য-বসতির অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক পূর্বশর্ত। মনুষ্য-বসতির কাঠামো ও পানির উৎসের সম্পর্ক একটি জটিল বিষয়। এই সম্পর্ক-বিষয়ক বিদ্যমান বিভিন্ন তত্ত্বে দ'টো উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, যেহেতু প্রাচ্য-স্বৈরাচার তত্ত্ব বিপুলভাবে স্বীকৃত, তাই বিদ্যমান তত্ত্বাবলি কৃত্রিম সেচ এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত রেখেছে। ফলে প্রচলিত সাহিত্যে পানির উৎস ও তৃণমূল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক সর্বদাই

অবহেলিত থেকেছে। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত তত্ত্বাবলি শুধু কৃত্রিম সেচ নিয়েই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে এবং রোজকার ব্যবহারের পানি – যেমন খাবার ও গোসলের পানির উৎস নিয়ে আলোচনা করেনি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দক্ষিণ এশিয়াতে বড় বড় সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকার কথা ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে। আটশঞ্চ বছর ধরে সেচের পানি জোগানোর ইতিহাস রয়েছে দক্ষিণ গুজরাটের সুদর্শন হ্রদের। ভোজপুর হ্রদ সৃষ্টি করা হয়েছিল একাদশ শতাব্দীতে। ওড়িশায় নন্দ-রা নির্মাণ করেছিল খাল; এ সব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অংশে রাষ্ট্র কৃত্রিম সেচের ক্ষেত্রে উৎসাহ জুগিয়েছিল। মেবারের উদয়সাগর জলাধার, দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর ও কামথানা দিঘী, ফিরোজ তুঘলকের যমুনা খাল, শাহজাহানের নাহার-ই-বেহেশত, 'শাহ নহর' খাল এবং সিন্ধুতে 'বেগারি-বাহ' খাল কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার নির্মাণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রমাণ দেয়। রাষ্ট্র পরিচালিত বৃহৎ সেচ-ব্যবস্থার অস্তিত্ব সত্ত্বেও কৃত্রিম সেচ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে তা মনে করার দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত, দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ জমি রাষ্ট্র-সৃষ্ট বিশাল সেচ ব্যবস্থার পরিবর্তে ছোট ছোট স্থানীয় উৎস হতে সেচের পানি পেত। ডেনিয়েল থর্নার যথার্থই বলেছেন, ভারতীয় শষ্য উৎপাদনে খালের নেটওয়ার্ক কখনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেনি; ভারতীয় চাষাবাদ মূলত নির্ভর করেছে বৃষ্টিপাত, স্থানীয় কুয়া বা গ্রামের পুকুরের ওপর (Thorner, ১৯৬৬)। তবে, ক্ষুদ্র ও স্থানীয় উৎস সম্পর্কিত ঐতিহাসিক প্রমাণাদি প্রতুল নয়। মুখিয়া যথার্থই বলেছেন, "সত্য বটে এ ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সূত্র খুবই স্বল্প; তবে তার মাধ্যমে এটি প্রমাণ হয় না যে, এ ব্যবস্থার সত্যি ব্যাপক প্রচলন ছিল না" (Mukhia ১৯৯৪, পৃ. ৭৪)। বাধ দিয়ে সৃষ্ট বৃষ্টির পানি-আধারকে স্থানীয়ভাবে দিঘি বলা হত; দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ এলাকায় তা সেচের পানি সরবরাহ করত। ১৮৬৬ সালে মহীশূরে পরিচালিত একটি জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহীশূরের শতকরা ৫৯.৭ ভাগ জমি দিঘির সেচের আওতায় ছিল। (Stein, ১৯৯৪)। এ সব দিঘির মধ্যে গুটিকয়েক ছিল বড় দিঘি; তার জন্য রাষ্ট্রের সহায়তার প্রয়োজন পড়েছিল। মহীশূর ছাড়াও তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, মালওয়া ও বুন্দেলখণ্ডে প্রভূতভাবে দিঘি ব্যবহৃত হয়েছিল। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক কে. এ. নীলকান্ত শাস্ত্রী দক্ষিণ এশিয়ার কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থাকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :

> "প্রাচীন কাল থেকেই সেচের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে অনুধাবিত করা হয়েছে; আড়া-আড়িভাবে নদ-নদীতে বাধ দেয়া হয়েছে; সম্ভবক্ষেত্রে সেগুলো থেকে খাল কাটা হয়েছে। যেখানে প্রাকৃতিক স্রোতস্বিনী ছিল না, সেখানে সেচ সুবিধা দেবার লক্ষ্যে বড় বড় দিঘি খনন করা হয়েছে; দিঘির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিতভাবে সহায়তাও প্রদান করা হয়েছে। যে সব লোক জমি পুনরুদ্ধার করেছে এবং প্রথমবারের মতো তা চাষাবাদের আওতায় এনেছে তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী বিশেষ সুবিধা ও রাজস্ব রেয়াত দিয়ে কৃষি সম্প্রসারণকে সর্বদা উৎসাহিত করা হয়েছে।" (Sastry, ১৯৬৬, পৃ. ৩২৮)।

উত্তর ভারতে কুয়া ছিল সেচের প্রধান উৎস। তবে কুয়া নির্মাণের খরচ মাটির প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন হত। ফলে, যেখানে কুয়া খননের জন্য জমি সুবিধাজনক ছিল সেখানে অধিক সংখ্যক কুয়া খনন করা হয়েছিল (Bayly, ১৯৯২, পৃ. ৮০-৮৩)। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র সেচের জন্য গ্রাম পর্যায়ে দলীয় কর্মকাণ্ড প্রয়োজন হত। সত্যিকার অর্থে, কিছু কিছু গ্রাম – যেমন দুবে-র সামিরপেত গড়ে উঠেছিল গ্রামের দিঘি নির্মাণ প্রক্রিয়ায় (Dube, ১৯৫৫, পৃ. ২৩)। একটি প্রতিনিধিস্থানীয় দক্ষিণ ভারতীয় গ্রামে দিঘি তত্ত্বাবধানের জন্য গ্রাম পর্যায়ে যে সংগঠন ছিল তাকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : "বর্তমানে গ্রামে তিনজন নিরুদি আছে, তার মধ্যে দু'জন হচ্ছে *মালো,* আরেকজন *মাদিগা* । দিঘির বাধের ওপর নজরদারি করা হচ্ছে তাদের কাজ; বিশেষ করে বাধের মুখের ওপর নজর রাখা ...। সময়মত দিঘিতে পানির বাড়তি-কমতির প্রতি লক্ষ রাখা; ঊর্ধ্বতন গ্রামীণ কর্মচারিদের অবহিত রাখাও তাদের কাজ (Dube, ১৯৫৫, পৃ. ৫২)। দ্বিতীয়ত, বৃহৎ আকারের সেচ প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বদা তৃণমূল পর্যায়ে সহযোগিতা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, ওয়েইড পরিচালিত অন্ধ্র প্রদেশের খাল-পদ্ধতির ওপর সমীক্ষার কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, শুধু সেচ-ব্যবস্থার অস্তিত্ব একটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রামের আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত নয়, এমনকি তা যথেষ্ট পূর্বশর্তও নয়। যৌথ সংগঠন সে সব গ্রামেই গড়ে ওঠে যেখানে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ খুব বেশি। আর এই ঝুঁকির মাত্রা তখনই বেড়ে যায় যেখানে যৌথ-সম্পদের সুবিধা থেকে বাদ পড়লে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় অধিকতর। ওয়েইড-এর প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তকে সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায় :

১. সেচের চ্যানেলের শেষ মাথায় অবস্থিত গ্রামে সেচের ঝুঁকি থাকে বেশি। এ ধরনের গ্রামে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন।
২. যে সব গ্রামের মাটি শুকনো কিন্তু তাতে পানি ধরে রাখার গুণ রয়েছে এবং সার্বিক বিবেচনায় তা ভালো, সে সব গ্রামে গো-চারণের ঝুঁকি থাকে বেশি। এ ধরনের গ্রাম মাঝারি মাত্রার 'প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ-সংগঠন'-এর জন্ম দেয়।
৩. যে সব গ্রাম সেচের উৎসের গোড়ায় থাকে তাদের ক্ষেত্রে সেচ ও গো-চারণের সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিত থাকে; এ ধরনের গ্রামে 'প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ-সংগঠনের' শক্তি হয় সবেচেয়ে নিচু মাত্রার (Wade, ১৯৮৮)।

উক্ত বিশ্লেষণ স্পষ্টতই ইঙ্গিত দেয় যে, স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র সেচ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বা স্থানীয় পর্যায়ে বড় ধরনের সেচ-ব্যবস্থা দক্ষভাবে পরিচালনার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অনেক গ্রামে দরকার হয়ে পড়েছিল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলার। বাংলায়, বিশেষত এর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের প্রচুর বারিপাত এবং এতদঞ্চলের বড় বড় নদীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিশাল জলধারার কারণে কখনও কৃত্রিম সেচের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। উত্তর ভারতের অনেক গ্রামে খাবার ও নিত্যব্যবহার্য পানির সরবরাহের জন্য সীমিত সহযোগিতার প্রয়োজন হত। উদাহরণস্বরূপ, বেইলীর প্রতিবেদন উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন যে, যেখানে মাটি নরম সেখানে শুধু পাকা কুয়া নির্মাণ সম্ভব। একটি

পাকা কুয়া নির্মাণের খরচ পড়ত একটি মাঝারি আয়ের কৃষক পরিবারের আনুমানিক বার্ষিক ব্যয়ের পাঁচ গুণেরও বেশি (Bayly, ১৯৯৩, পৃ. ৮০)। এ ধরনের গ্রামে সব গ্রামবাসীর পক্ষে কুয়া নির্মাণ সম্ভব ছিল না। নিত্যব্যবহার্য পানির ব্যবস্থা করার জন্য গ্রামবাসীদের দরকার হত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ এক নেতৃত্বের। পশ্চিম বাংলার বীরভূমে নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা ইঙ্গিত দেয় যে, গ্রামের দিঘি ও কুয়াতে সকল গ্রামবাসীর অবাধ অধিকার ছিল না। "এক্ষেত্রে পার্থক্য নির্ধারণ করা যেত এভাবে – নিচু বর্ণের লোকেরা শুধু তাদের বাড়ী-সংলগ্ন পুকুর ব্যবহার করত যাতে নিচু বর্ণের লোকজন কোন্ পুকুর ব্যবহার করে এবং অন্য বর্ণের লোকেরা কোন্ পুকুর ব্যবহার করে তা সহজে চিহ্নিত করা যায়। কুয়া ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও একই ধরনের অবস্থা। ত্রিশ বছর আগেও গ্রামে দু'টি মাত্র কুয়া ছিল, একটি জমিদারের আর একটি বৈদ্যদের" (Fukutake), ১৯৬৭, পৃ.১৪৯)। দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার প্রায় সব গ্রামেই প্রতি বাড়ির খাবার ও গোসলের পানির নিজস্ব উৎস ছিল। বাংলার বদ্বীপ এলাকায় নদীর পাড়ে প্রাকৃতিকভাবে-সৃষ্ট উঁচু জায়গায় বা মাটি ফেলে জমি উঁচু করে তার ওপর বাড়ি-ঘর তৈরি করা হত। নদীর পাড়ের বাসিন্দারা সহজেই নদীর পানি ব্যবহার করতে পারত। যে সব বাড়ি-ঘর নদীর পাড় ছাড়া অন্যত্র তৈরি করা হত তাদের নিজস্ব পুকুর থাকত, কারণ নদীর পাড়ের বাইরে নিচু জায়গায় বাড়ি বানাতে হলে মাটি ভরাটের জন্য পুকুর খনন করতে হত। বদ্বীপ এলাকার বাইরে অধিকাংশ পরিবার সামাজিক-মালিকানাধীন বা গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মালিকানাধীন কুয়া থেকে পানি সংগ্রহ করত। এ সব এলাকায় একঘরে লোকদের *বেঁচে*-থাকার-জন্য-জরুরি পানির উৎসে প্রবেশাধিকার বঞ্চিত করা হত। এই অবস্থা থেকে বোঝা যায়, পানির সরবরাহ বিভিন্নভাবে গ্রাম সংগঠনের কাঠামোকে প্রভাবিত করেছে। যা হোক, দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার গ্রাম পানির-কারণে-সৃষ্ট সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত ছিল। ফলে, এ এলাকায় গ্রাম উন্মুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

দক্ষিণ ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, অনেক গ্রামে গোচারণ-অধিকার নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ সংগঠন গড়ে উঠেছে। বদ্বীপীয় বাংলাদেশে গোচারণ অধিকারের নিয়ন্ত্রণ কোনও জরুরি বিষয় ছিল না। কারণ এখানে প্রধান প্রধান ফসলের চাষ করা হত বর্ষাকালের প্লাবিত জমিতে।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রামের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বাস্তবতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মতাদর্শগত প্রচারণার কারণে ধোঁয়াটে হয়ে পড়েছে। করমণ্ডলের *ব্রহ্মদেয়* গ্রাম এ ক্ষেত্রে একটি উপস্থাপনীয় বিষয়। *ব্রহ্মদেয়* আক্ষরিক অর্থে ব্রাহ্মণকে (প্রদত্ত) দান বুঝায়, বিশেষ করে গ্রামের আয় ও ব্যবস্থাপনা ব্রাহ্মণদের প্রদান করা। দক্ষিণ ভারতে *ব্রহ্মদেয়* গ্রামের উদ্ভব সম্পর্কে দু'ধরনের চিরাচরিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। প্রথমত, যুক্তি দেখানো হয় যে, ব্রাহ্মণ-শাসন প্রসারের লক্ষ্যে পল্লব রাজবংশ ব্রাহ্মণ-নিয়ন্ত্রিত গ্রাম চাপিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, একটি বিকল্প ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বলা হয় যে, কৃষকরা স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণদের আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। বাস্তবে এ ধরনের গ্রাম গড়ে উঠেছিল অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংকটের কারণে; উপজাতির (কালাভ্রা) আক্রমণের কারণে বসবাসরত কৃষক-সমাজের আধিপত্য তখন সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল এবং নতুন অভিবাসীদের শৃংখলাকে তা বিঘ্নিত করে তুলেছিল (Stein, ১৯৯৪, পৃ. ৮১-৮৫)।

ব্রাহ্মণ-নিয়ন্ত্রিত গ্রামের মতাদর্শের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল ভক্তিবাদী মন্দিরকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান। শৃংখলা বজায় রাখার লক্ষ্যে সীমান্ত এলাকায়ও হয়ত রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কৌটিল্য তার *অর্থশাস্ত্রে* এ ধরনের গ্রাম প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন। *ব্রহ্মদেয়* গ্রামের অভিজ্ঞতা আরও ইঙ্গিত দেয় যে, এ ধরনের গ্রাম "কেন্দ্রীয় অবস্থানের গ্রাম" হিসেবে কাজ করত; সামাজিক নিয়ম-নীতি মেনে চলার জন্য তারা ছোট ছোট এবং উপ-গ্রামকে প্রভাবিত করত (Stein, ১৯৯৪)।

উক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান যে, গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধতার মাত্রা নির্ণিত হত বিভিন্ন ধরনের উপাদানের প্রভাবে। তবে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্য এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতা গড়ে তোলার জন্য যে সব উপাদান বিদ্যমান ছিল, দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার এলাকায় তার কোনওটিরই অস্তিত্ব ছিল না। যে সব এলাকা নিয়ে এখন বাংলাদেশ গঠিত তার গ্রামীণ বসতিতে সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সুবিধা ছিল সীমাবদ্ধ। পানি বা গোচারণ সুবিধার মতো *যৌথ* সম্পদ ব্যবস্থাপনার কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না তাতে। বাইরের আক্রমণ, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং বন্য পশুর আক্রমণের হুমকি ছিল সীমিত। অপরদিকে, অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের খরচও ছিল বেশি। কারণ, যে সব ফাও সুবিধাভোগী ব্যয় বহন করত না তারা অন্যায়ভাবে এবং সহজে সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত করতে পারত। গ্রামীণ সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে যদি দুর্ভোগের মাত্রা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যায় তবে ফাও সুবিধাভোগ কমে যায়। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বদ্বীপীয় বাংলা অঞ্চলে একঘরে হওয়ার ব্যাপারটি ছিল শুধু একটি উপদ্রব; বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে তা কখনও বড় ধরনের কোনও বিপত্তি হয়ে উঠেনি। বদ্বীপীয় বাংলায় প্রচুর বসতিশূন্য ও পতিত জায়গা-জমি ছিল; সহজেই তা সাফ করা যেত; খুবই উর্বর ছিল এ সব জমি। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পানি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অঞ্চলের খানা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। নতুন বসতি স্থাপন ছিল সহজ; তাই বদ্বীপীয় বাংলায় একঘরে হওয়ার যন্ত্রণা অনেকটাই তার তীব্রতা হারিয়ে ফেলেছিল। সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে খরচ ছিল অনেক বেশি। পরিশেষে বলা যায়, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রামের নিপীড়নমূলক ক্ষমতা তখনই বৃদ্ধি পায় যখন চারিদিকের গ্রামও থাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ। এ ধরনের পরিস্থিতিতে একঘরে হওয়া লোক গ্রামীণ কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখায় না; তাদের ভয় থাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ অন্যান্য গ্রামে তারা গ্রহণযোগ্য হবে না (Popkin, ১৯৭৯, পৃ. ৪৩)। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ ও উন্মুক্ত গ্রাম দু-ই থাকে, সেখানে গ্রামীণ সংগঠনের নিপীড়নমূলক ক্ষমতার মাত্রা কম হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ, একঘরে-হওয়া ব্যক্তি সহজেই অসংঘবদ্ধ কাঠামোর গ্রামীণ বসতিতে নতুন জীবন শুরু করতে পারে।

গত একশ' বছরের ঐতিহাসিক সূত্রাদি ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলা অঞ্চলের গ্রামীণ বসতির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সংঘবদ্ধতার মাত্রা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের গ্রামের সংঘবদ্ধতার মাত্রার চাইতে অনেক কম ছিল। সূত্রাদি আরো নির্দেশ করে যে, বাংলার পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক সংঘবদ্ধতার মাত্রায় তারতম্য ছিল। উনবিংশ

শতাব্দীর শেষ পাদের বাংলার আদম শুমারি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পশ্চিম বাংলা, বিশেষ করে বর্ধমান বিভাগ, এবং বিহার-সংলগ্ন এলাকার গ্রামসমূহ পূর্ব বাংলার গ্রাম থেকে অধিকতর সংগঠিত ছিল। নৃতাত্ত্বিকদের মাঠ পর্যায়ের গবেষণা প্রতিবেদনও এ মত সমর্থন করে। এ সব গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে যে, পশ্চিম বাংলার গ্রামের বসতির ধরন ছিল কেন্দ্র-ঘেরা; অপরদিকে বদ্বীপীয় অঞ্চলে গ্রামীণ বসতি ছিল রেখা-সদৃশ এবং বিচ্ছিন্ন। এ সব সমীক্ষা আরও তুলে ধরেছে যে, রেখা-সদৃশ বসতির গ্রামের চাইতে কেন্দ্র-ঘেরা গ্রামের নেতৃত্ব ছিল অধিক শক্তিশালী (Mandelbaum, ১৯৯০)। অতীতেও গ্রামীণ কাঠামোতে যে একই ধরনের বিন্যাস বিদ্যমান ছিল তা মনে করার দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত, ঐতিহাসিক সূত্র ইঙ্গিত দেয়, পশ্চিম বাংলার গ্রাম ছিল পূর্ব বাংলার গ্রামের চাইতে বড় । দ্বিতীয়ত, পূর্ব বাংলার তুলনায় পশ্চিম বাংলার গ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার মাত্রা ছিল বেশি। এ ধরনের প্রত্যাশার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। প্রথমত, পশ্চিমাঞ্চলে অনাবাদী জমির উর্বরতা ছিল কম এবং গ্রীষ্মকালে পানি সরবরাহ ছিল অপ্রতুল। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নতুন সংসাব পাতা তাই পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে ছিল অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ। পার্শ্ববর্তী বিহারে অবস্থিত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ কিছুসংখ্যক গ্রাম পশ্চিম বাংলার লাগোয়া অঞ্চলকে প্রভাবিত করেছে। বাস্তবে এ সব গ্রামের কিছু কিছু ছিল পশ্চিমের বৃহত্তর গ্রামীণ বসতির উপ-গ্রাম। উপরন্তু পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে বিদেশী আক্রমণও হত ঘন ঘন। ফলে, পশ্চিম বাংলায় প্রতিরক্ষা সংগঠনের সুফল ছিল বেশি। এ সমস্ত উপাদান সম্মিলিতভাবে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার গ্রামীণ বসতির কাঠামোর প্রকৃতিতে ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে গ্রাম ছিল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ; অপরপক্ষে, বাংলার গ্রাম ছিল অসংঘবদ্ধ। বাংলায় গ্রামের সংঘবদ্ধতার ঘাটতির ক্ষেত্রেও মাত্রাগত ভিন্নতা ছিল। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের এই শিথিলতা ছিল কম, পূর্বাঞ্চলে ছিল অধিক।

অধ্যায় ৩

রাজনৈতিক স্থিতিহীনতার গতিধারা

চিরাচরিত প্রজ্ঞা মতে ইতিহাস কোনও তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত হয় না, বরং "নিরূপিত বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে লেখাজোখা-র ভিত্তিতে তা রূপলাভ করে।" কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা তাই পরিসংখ্যানের অভিধায় দৈবচয়ন নয়। ঐতিহাসিকগণ সর্বদাই তাঁদের মনের মধ্যে বিদ্যমান কাঠামো-সূত্রে ঘটনাকে নির্বাচন করেন। ঐতিহাসিক ঘটনা তাই, "একটি বস্তার মতো – এর মধ্যে কোনও-কিছু পুরে না দিলে তা কখনও দাঁড়ায় না" (Carr, ১৯৭২, পৃ. ৯)। তত্ত্বের প্রতি ঐতিহাসিকদের সোচ্চার বিরাগ সত্ত্বেও সমস্ত ঐতিহাসিক বর্ণনায়ই পরোক্ষভাবে তাত্ত্বিক কাঠামো বিদ্যমান থাকে। নর্থ যথার্থই বলেছেন, "ঐতিহাসিক গবেষণার দীর্ঘ যাত্রাপথ ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সৃষ্ট রাষ্ট্র-তত্ত্বের অস্থিতে আকীর্ণ" (North, ১৯৮১, পৃ. ২০)। রাজনৈতিক বৃত্তান্তে যে সব তত্ত্ব পরোক্ষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে বাংলার রাজনৈতিক বিবর্তনকে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করা যাবে।

মোটামুটিভাবে বলা চলে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ভূমিকার ব্যাপারে দু'ধরনের তত্ত্ব রয়েছে: চুক্তিমূলক তত্ত্ব এবং লুণ্ঠনমূলক বা শোষণমূলক তত্ত্ব। চুক্তিমূলক তত্ত্বাবলি এ কথা সত্য বলে ধরে নেয় যে, রাষ্ট্র হচ্ছে কিছু সেবা, যেমন, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার প্রতিষ্ঠান। সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের (যেমন, প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র এবং রাজবংশ) প্রতিযোগিতার মুখে তাকে বাসিন্দাদের সমর্থন নিশ্চিত করতে হয়। শোষণ-তত্ত্ব মতে রাষ্ট্র হচ্ছে কায়েমি-স্বার্থবাদীদের একটি হাতিয়ার। যদিও দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে রাষ্ট্রের চুক্তিমূলক তত্ত্ব গভীরভাবে প্রোথিত, তবু অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক শোষণমূলক তত্ত্বের পক্ষপাতী। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের ধ্রুপদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে একটি পৌনঃপুনিক ধুয়ো হচ্ছে স্বৈরাচারী সুবিশাল সাম্রাজ্য। কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী রাষ্ট্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের ঐকমত্যের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক দৃশ্যপটের আঞ্চলিক তারতম্য ঢাকা পড়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শোষণমূলক তাত্ত্বিক আদল (paradigm) দু'ভাগে ভাগ করা যায়: কেন্দ্রীভূত ও বিকেন্দ্রিক শোষণ-তত্ত্ব। মার্কস্ প্রথম কেন্দ্রীভূত শোষণের মডেল গড়ে তোলেন (Marx & Engels, ১৯৬২, খণ্ড-১, পৃ. ৩৪৩-৩৫৮)। এই তত্ত্বের চিন্তার উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ – এ্যাডাম স্মিথ, জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল এবং রিচার্ড জোনস্-এর লেখায়। তাঁরা এশীয় রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী ও কেন্দ্রীভূত প্রকৃতির ওপর জোর দিয়েছেন। মার্কস-এর মতে প্রাচ্যের কৃষি কৃত্রিম সেচের ওপর নির্ভরশীল ছিল, আর সেজন্যই বিস্তৃত জল অববাহিকাসমূহে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৃহৎ কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাঁর

ভাষ্যমতে, "পানির অর্থনৈতিক ও যৌথ ব্যবহারের এই প্রয়োজনীয়তা প্রতীচ্যে – উদাহরণস্বরূপ, ফ্লেন্ডারস ও ইতালিতে ব্যক্তি-উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবী যৌথ সংগঠন গড়ে তোলাকে প্রণোদিত করেছিল। অপরদিকে প্রাচ্যে সভ্যতা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে, এলাকার বিস্তৃতি ছিল বিশাল, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সংগঠন গড়ে তোলা ছিল দুষ্কর। সরকারের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হস্তক্ষেপকে তা আবশ্যকীয় করে তুলেছিল। আর এ ভাবেই অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার বাধ্যবাধকতার কারণে সকল এশীয় সরকারের ওপর গণ-পূর্ত অবকাঠামোর দায়িত্ব বর্তায়" (Marx & Engels, ১৯৬২, পৃ. ৩৪৭)। পানি সরবরাহের ওপর নিয়ন্ত্রণের কারণে রাষ্ট্র সেখানে এত বেশি ক্ষমতাশালী ছিল যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করে তা সমস্ত সম্পদের ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এ সব বৈশিষ্ট্য সম্মিলিতভাবে মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকদের কাছে এশীয় উৎপাদন রীতি নামে পরিচিত।

সাম্প্রতিক গবেষণা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এশীয় উৎপাদন রীতির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্নের অবতারণা করেছে। প্রথমত, দক্ষিণ এশিয়ার সেচের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে; কারণ অধিকাংশ সেচ-আওতাধীন এলাকা রাষ্ট্র পরিচালিত সেচ-প্রকল্প থেকে নয়, বরং স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ-ব্যবস্থা থেকে পানি পেত (Rudra, ১৯৮৮, পৃ. ১৭-১৮)। দ্বিতীয়ত, সর্ব-ভারতীয় সাম্রাজ্যের ক্ষমতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। শ্রীনিবাস যুক্তি দেখিয়েছেন, "সত্য বটে প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে বিশাল ও পরিশীলিত সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তবু আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনে হলেও বলা যায় বৈশিষ্ট্যের বিচারে তা ছিল সাদামাটা রাষ্ট্র (pedestrian state); রাষ্ট্রের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল শহর এলাকা ও বিদ্যমান ক'টি জনপথের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যে। এর সম্পূরক হিসেবে প্রভাবশালী বর্ণের লোকেরা স্থানীয় পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করত।" (১৯৮৭, পৃ. ৯)। তৃতীয়ত, এশীয় উৎপাদন রীতি দক্ষিণ এশিয়ার ভূমির জটিল সম্পত্তির সম্পর্ককে অতিসরলীকৃতভাবে উপস্থাপন করে। মার্কস-এর দাবি সত্ত্বেও ভূমিতে ব্যক্তি-মালিকানার অনুপস্থিতি আজকের দিনে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের কাছে সাধারণভাবে গ্রহণীয় কোনও মতবাদ নয় (Mukhia, ১৯৯৪, পৃ. ১২৫)। চতুর্থত, বাংলাসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অংশে রাজনৈতিক খণ্ডায়ন প্রাচ্য স্বৈরাচারের তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পঞ্চমত, মার্কস্ স্বয়ম্ভর গ্রাম-সমাজের অস্তিত্ব ধরে নিয়েছিলেন। পেরি এন্ডারসন যথার্থই সিদ্ধান্ত করেছেন, "ভারতীয় গ্রাম-সমাজের স্বয়ম্ভরতা, সাম্য এবং বিচ্ছিন্নতা সর্বদাই ছিল একটি কিংবদন্তি; সমাজের মধ্যকার বর্ণ-প্রথা এবং ওপরে অবস্থিত রাষ্ট্র এগুলোকে নিবারিত করত" (Anderson, ১৯৭৪, পৃ. ৪৮৯)। পরিশেষে বলা যায়, বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা সমরূপ থাকে না; অঞ্চলে অঞ্চলে তার ভিন্নতা থাকে। দক্ষিণ এশিয়ার বিশাল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল। কারণ, এতে ছিল উষর মরুভূমি, সুউচ্চ পর্বতমালা, আর্দ্র বদ্বীপ ও গভীর বনাঞ্চল। উত্তর ভারতের শুষ্ক এলাকায় হয়তবা কৃত্রিম সেচ প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু বাংলার আর্দ্র এলাকায় তা ছিল অনাবশ্যক।

অবশ্য ঐতিহাসিকদের একটি ঘরানা দাবি করে যে, প্রাচীন বাংলায় কৃত্রিম সেচ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। উইলকক্স-এর মতে প্রাচীন বাংলায় কৃষিকাজ

নির্ভরশীল ছিল কৃত্রিম সেচের বহুধাবিস্তৃত জালের ওপর। এ ধরনের সেচকে তিনি 'অধিপ্রবাহিত সেচ' (overflow irrigation) বলে চিহ্নিত করেছেন; বন্যার সময় খালের পাড় কেটে দিয়ে এ ধরনের সেচ পরিচালিত হত (Wilcox), ১৯৩০)। উইলকক্স-এর অনুকল্পে দু'টি প্রধান উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, পশ্চিম ও মধ্য বাংলায় সমস্ত মৃত নদী ছিল মনুষ্য-খননকৃত খাল। এত বিপুল সংখ্যক খাল খননের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই খালগুলি হয়তবা মৃত বদ্বীপের পুরোনো নদ-নদীর জটাজালের ধ্বংসাবশেষ; আর তা মনে করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। দ্বিতীয়ত, অধিপ্রবাহ সেচ শুধু বর্ষাকালে সম্পূরক সেচ হিসেবে প্রদান করা যেত। অথচ খরার সময় সম্পূরক সেচের প্রয়োজন পড়ে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় খরার সময় অধিপ্রবাহ সেচের জন্য খালে যথেষ্ট পানি থাকত না। ফলে সেচের উদ্দেশ্যে এ ধরনের খাল-খনন তাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। উইলকক্স নিজেই স্বীকার করেছেন, মুলত সেচের জন্য নয়, বরং পানি নিষ্কাশন ও নৌ চলাচলের জন্য বাংলায় খালের প্রয়োজন ছিল। সন্দেহ করা চলে, বদ্বীপীয় বাংলায় পানি নিষ্কাশন ও নৌচলাচলের জন্য খালের ব্যাপক নেটওয়ার্কের প্রয়োজন ছিল কি না।

কেন্দ্রীভূত শোষণ মডেলের দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যান তুলে ধরেছেন ভিট্‌ফগেল। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ভিট্‌ফগেল প্রণীত জলনিয়ন্ত্রিত সমাজের (hydraulic society) তত্ত্ব সেচ ও প্রাচ্য স্বৈরাচারের কার্য-কারণ সম্পর্কের মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভিট্‌ফগেল তাঁর মডেলে কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার ব্যবহার (hydroagriculture) ও সরকার পরিচালিত বৃহৎ সেচ ব্যবস্থার ব্যবহারকে (hydraulic agriculture) আলাদা বলে চিহ্নিত করেছেন। জলনিয়ন্ত্রিত সমাজে অবকাঠামোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত থাকে; দেশের গণমানুষের পুরোভাগ বা নিদেনপক্ষে এর সক্রিয় কেন্দ্রীয় অংশ তাতে জড়িত থাকে। ফলে, যারা এই নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করে তাদের বিশেষ সুযোগ ঘটে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের। তাঁর মতে এ ধরনের সরকার 'সমাজের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী' (Wittfogel, ১৯৫৭)।

বক্তব্যের লক্ষণীয় সাদৃশ্য সত্ত্বেও মার্কস্ ও ভিট্‌ফগেল দু'টি মূল ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। প্রথমত, মার্কস্-এর মতে প্রাচ্য স্বৈরাচার সৃষ্টি হয়েছিল সেচের বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি ও তা পরিচালনার জন্য। অপরপক্ষে ভিট্‌ফগেল মত পোষণ করেন যে, কৃত্রিম সেচ ছাড়াও রক্ষামূলক স্থাপনা (যেমন, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিষ্কাশনী খাল ও বাঁধ, খাবার পানির জন্য নালা এবং নৌ চলাচলের জন্য খাল) এবং পানির সাথে সম্পর্কহীন অন্যান্য পূর্ত কর্ম (যেমন, দেয়াল ও প্রতিরক্ষার জন্য কাঠামো নির্মাণ, জনপথ) কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র সৃষ্টিতে অবদান রেখেছিল। দ্বিতীয়ত, গ্রাম-সমাজের ভূমিকার ব্যাপারেও তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। মার্কস্-এর মতানুসারে প্রাচ্য স্বৈরাচারের শক্ত ভিত্তি ছিল গ্রাম-সমাজ। ভিট্‌ফগেল-এর মত হচ্ছে প্রাচ্য সমাজে গ্রামের অবস্থান ছিল প্রান্তিক; শুধু হ্রাসপ্রাপ্ত প্রশাসনিক সুবিধার কারণে তাকে বরদাস্ত করা হত। ভিট্‌ফগেল মত পোষণ করেছেন যে, প্রাচ্য স্বৈরাচারের ভিত্তি ছিল নির্ভেজাল একচেটিয়া আমলাতন্ত্র।

মার্ক্সীয় বিশ্লেষণে এশীয় উৎপাদন রীতি সম্পর্কে যে সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে, তা ভিট্‌ফগেল-এর তত্ত্বের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। ভিট্‌ফগেল বিশ্বাস করতেন যে, 'প্রাচ্য স্বৈরাচার হাজার বছর ধরে বেঁচে ছিল।' প্রাচ্যে বিশাল বিশাল সাম্রাজ্যের আধিপত্যের ঘন ঘন উঠতি-পড়তির আলোকে এই অনুকল্প সমর্থনযোগ্য নয়। নির্দেশ (Command) অর্থনীতি অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত কাজ করবে এ ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। হিকস্ যথার্থই বলেছেন, "একটি নির্ভেজাল বা প্রায়-নির্ভেজাল কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি জরুরি অবস্থা ছাড়া বড় একটা বাঁচে না; কারণ, শুধু জরুরি অবস্থায়ই কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আদেশ-নির্দেশ গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়।" (Hicks, ১৯৬৯, পৃ.১৫)। ভিট্‌ফগেল ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রাচ্য সমাজে সরকার-প্রদত্ত একমাত্র সেবা ছিল ভৌত অবকাঠামো। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাও ছিল সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পরিষেবা। শুধু সেচ সুবিধা প্রদান নয়, বড় ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার নিশ্চিত করা এবং বহিঃআক্রমণ প্রতিহত করার জন্যও বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে পারে। ভিট্‌ফগেলের তত্ত্বের পরিসর খুবই ক্ষুদ্র; আর এ জন্যই তার বাস্তবানুগ হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। পরিশেষে বলা যায়, যে সব এলাকায় কৃত্রিম সেচের প্রয়োজন ছিল তা থেকে বাংলার মতো বদ্বীপ এলাকায় ভৌত পরিস্থিতি ছিল লক্ষণীয়ভাবে ভিন্ন। এ অঞ্চলের কৃষি জীবনের প্রধান সমস্যা পানির অপ্রতুলতা নয় বরং পানির প্রাচুর্য। বন্যা-নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তা পরিচালনার জন্য বাংলায় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়েছিল – এ ধরনের মত উপস্থাপন করে ভিট্‌ফগেল তাঁর অনুকল্প প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ভিট্‌ফগেল আদতে বাংলায় বন্যা-নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর গুরুত্ব ও পরিধিকে অতিরঞ্জিত করেছেন। ভিট্‌ফগেল দাবি করেছেন যে, ১৯০০ সালের মধ্যে বাংলায় ১২৯৮ মাইল বাঁধ তৈরি হয়েছিল (Wittfogel, ১৯৫৭, পৃ. ২৪)। এ সব বাঁধ একটানা ছিল না; দূরে দূরে বিভিন্ন জায়গায় ছাড়ানো-ছিটানো ছিল এগুলো। বাংলার বন্যাপ্লাবিত শতকরা পাঁচভাগ এলাকায়ও এদের মাধ্যমে কার্যকর বন্যা-প্রতিরোধ সম্ভব ছিল না। স্থানীয় এবং দূরে দূরে অবস্থিত এই বন্যা-প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য কোনও কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন পড়ে না। বরং, উল্টো বলা যায়, বাংলার অধিকাংশ মানুষ আবহমান কাল ধরে বন্যার সাথে জীবনযাপন করেছে।

বিকেন্দ্রিত শোষণের ধারণা-কাঠামোর দু'টি প্রধান ব্যাখ্যান রয়েছে। প্রথম ব্যাখ্যানটির প্রবক্তা হচ্ছেন বার্টন স্টাইন (১৯৯৪)। আফ্রিকায় সাউথহল কর্তৃক পরিচালিত নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে তিনি দক্ষিণ ভারতের পটভূমিতে পিরামিড-সদৃশ ও বিভিন্ন-ভাগে-বিভাজিত কাঠামোর রাষ্ট্রের ছাঁচ উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানটির প্রবক্তা হচ্ছেন শর্মা (১৯৮৫)। মধ্যযুগীয় ভারতে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক গড়ন ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতির একটি ছাঁচ গড়ে তুলেছেন। ভারতের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য যে সর্বশক্তিমান কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ছিল না এ বক্তব্যের স্বীকৃতি মেলে এ সব ধারণা-কাঠামোতে; এটাই হচ্ছে এসব তত্ত্বের প্রধান শক্তি। মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ ছাড়া অন্য কোনও ভারতীয় রাষ্ট্র কখনোই মার্কস্ এবং ভিট্‌ফগেলের ধারণা-কাঠামো নির্দেশিত স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার ধারে-কাছে পৌঁছুতে সক্ষম হয়নি। যেহেতু শিল্প বিপ্লবই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার

জন্য প্রযুক্তি ও সম্পদ সরবরাহ করেছে তাই প্রশ্ন করা চলে – শিল্প বিপ্লবের আগে শোষণমূলক মডেলের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আদৌ সম্ভব ছিল কি না।

পিরামিড-সদৃশ বিভিন্ন-ভাগে-বিভাজিত রাষ্ট্রের প্রধান প্র ান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

ক. এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের জৈব অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। তাঁরা দাবি করেন যে, মহা-সাম্রাজ্যে (mega-empire) স্থানীয় এককসমূহ (বা যাকে তাঁরা বিভাজিত অংশ বলেন) সমগ্রের বিভাজিত অংশ হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। ফলে, কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক প্রান্তিক একক থাকে যার ওপর কেন্দ্র শুধুমাত্র সীমিত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কেন্দ্রের কর্তৃত্বের হেরফের ঘটে; কেন্দ্রে অবস্থিত অঞ্চলে সেই নিয়ন্ত্রণের মাত্রা দাঁড়ায় সবচেয়ে বেশি; মধ্যবর্তী অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ থাকে খুবই কম এবং প্রান্তিক অঞ্চলে তা থাকে নাম-মাত্র। এ ধরনের সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নির্দিষ্ট করা থাকে না বরং তা পরিবর্তনশীল ও অনির্ণিত থাকে।

খ. বিভাজিত রাজনৈতিক পদ্ধতিতে দ্বৈত সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান থাকে। তা গঠিত হয় প্রকৃত রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বা নিয়ন্ত্রণ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আধিপত্য বা ধর্মীয় সার্বভৌমত্ব নিয়ে। এ ধরনের রাষ্ট্রে আনুষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীভূত থাকে রাজায়; অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে বিভাজিত অংশসমূহ। স্টাইনের মতে ভারতীয় ধারণা -- *'ক্ষত্র' (Khastra)* হচ্ছে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের সমার্থক; তার অর্থ হল 'আঞ্চলিক পরিসরের ক্ষমতা; কোনও একটি রাজ্যাংশে তা ব্যবহার্য; সেই অংশের সীমান্ত পর্যন্ত তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ।' অপরদিকে, ধর্মীয় সার্বভৌমত্ব রাজধর্মের প্রাচীন ভারতীয় ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত; রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে তা। স্টাইন-এর মতে রাজার আনুষ্ঠানিক সার্বভৌমত্ব দক্ষিণ ভারতের পল্লব ও চোল সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয় ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল।

গ. কেন্দ্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থানীয় এককগুলোকে পিরামিডের মত সংগঠিত করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে পিরামিডসদৃশ ও সোপানভিত্তিক (hierarchical) সামাজিক কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। পিরামিডসদৃশ কাঠামোতে সর্ব স্তরেই সর্ব প্রকার বৈধ প্রকৃতির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয় ও নিয়ন্ত্রণ জারি রাখা হয়; কিন্তু ওপর থেকে নিচ সোপানে নেমে যাওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমানুয়ে তার প্রয়োগক্ষেত্র আনুপাতিকভাবে ছোট হয়ে আসে। কিন্তু সোপানভিত্তিক ক্ষমতা কাঠামোতে বিভিন্ন স্তর বা অংশ একই ধরনের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে না; স্তরভেদে নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতির বদল ঘটে। রাজনৈতিক সংগঠনের সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক কীভাবে উর্ধ্বক্রমে (Asscending order) রাজনৈতিক সংগঠনের বৃহত্তর এককের সাথে

সম্পর্কিত (তার মানে গ্রাম, অঞ্চল, অধি-অঞ্চল এবং রাজ্য) তা পিরামিডসদৃশ সম্পর্ক যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করে। দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক পদ্ধতির প্রাথমিক ভিত্তিভূমি ছিল নাড়ু; তাতে যাঁরা নেতৃত্ব দিত তাঁরা *উদয়ার, মুম্মাদি* এবং *মুমেন্দা-ভেলার* প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। চোল সাম্রাজ্যে একটি নাড়ুর আয়তন হত দশ থেকে তিনশ' বর্গমাইলের মত; তামিল সমভূমিতে একটি নাড়ুর গড় গ্রামসংখ্যা ছিল পাঁচ। তবে, কোনও কোনও নাড়ুতে মোট গ্রাম সংখ্যা চল্লিশ ছাড়িয়ে যেত। নাড়ুর ওপরে ছিল অধি-আঞ্চলিক পরিষদ – যা *পেরিয়ানাড়ু* বলে পরিচিত ছিল। অধি-আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান যে এলাকা ঘিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার আঞ্চলিক ভিন্নতা লক্ষ করা গেছে। অধি-আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানে আঠারো *নাড়ুর* প্রভৃত উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায়। কেন্দ্রে বিশেষায়িত প্রশাসনিক কর্মচারি ছিল; মধ্য ও প্রান্তিক স্তরেও স্বল্প সংখ্যায় একই ধরনের কর্মচারির পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়।

ঘ. খণ্ডিত রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তর সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক সার্বভৌমত্বের যৌথ স্বীকৃতির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ থাকত। খণ্ডিত রাষ্ট্রে নমনীয় সম্পর্ক ধর্মীয় প্রকৃতির শাসনের মাধ্যমে বৈধতা পেত, সে-শাসন গোষ্ঠীপতি বা রাজা – যারই হোক না কেন।

পিরামিডসদৃশ খণ্ডিত রাষ্ট্রের তত্ত্ব-কাঠামোর দু'টি মূল আকর্ষণ রয়েছে। প্রথমত, প্রাক্-শিল্প সমাজভিত্তিক সাম্রাজ্যের ক্ষমতা সম্পর্কে এটি অধিকতর বাস্তবভিত্তিক ধারণা প্রদান করে। শোষণ-তত্ত্বে যে ধরনের স্বৈরাচারী কেন্দ্রীভূত শাসনের কথা তুলে ধরা হয়েছে, তৎকালে প্রচলিত প্রযুক্তির মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, তৃণমূল প্রতিষ্ঠান কীভাবে কেন্দ্রের সাথে যুক্ত ছিল তার একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলে এই তত্ত্ব-কাঠামোতে। তবে, মধ্যযুগীয় দক্ষিণ ভারতের বাইরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে এই মডেল প্রযোজ্য নয়। প্রথমত, স্টাইন এই মডেলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মতাদর্শিক ভিত্তির ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে পিরামিড-সদৃশ খণ্ডিত রাষ্ট্রে শাসনের ধর্মীয় চরিত্র নমনীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থায়ীত্ব দেয়। তবে শাসক ও প্রজা যদি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মানুসারী হয় তবে শাসন-ব্যবস্থা ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। ফলে, ভারতের মুসলমান সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এখানে রাজা ছিল মুসলমান এবং অধিকাংশ প্রজা ছিল হিন্দু। বাংলায়ও একই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে শাসন করেছিল বৌদ্ধ রাজাকুল। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বে যে পিরামিডসদৃশ কাঠামোর কথা ভাবা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশে, বিশেষত বাংলায় তার সন্ধান মেলে না। বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রাম ছিল না; এ ধরনের গ্রামই পিরামিডসদৃশ ক্ষমতা কাঠামোর মূল উপাদান। তাই বিস্ময়কর কিছু নয় যে, বাংলাদেশ অঞ্চল কখনও দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যের উদ্ভব প্রত্যক্ষ করেনি।

শোষণ পদ্ধতির আরেকটি বিকেন্দ্রিত ছাঁচ উপস্থাপন করেছেন আর. এ. শর্মা (Sharma, ১৯৮৫)। তাঁর মতে ৩০০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দের পরিসরে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল সামন্তবাদ। রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকতর হারে বৌদ্ধ-বিহার, হিন্দু-মন্দির প্রতিষ্ঠা

এবং ব্রাহ্মণদের ভূমি-দানের মধ্য দিয়ে সামন্ত ব্যবস্থা বেড়ে ওঠে। এর ফলে কৃষককূল মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীন হয়ে ওঠে এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাটা পড়ে। ফলে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতিকে উৎসাহিত করে। পাশ্চাত্য সামন্তবাদী ব্যবস্থার সকল উপাদান, যেমন কৃষি-দাস, তালুকদারের খামার, স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক সত্তাসমূহ, এবং পেশা ও বাণিজ্যের সামন্তাধিকারকরণ বিদ্যমান ছিল ভারতে – এমতো ধারণা প্রতিষ্ঠা করার জন্য শর্মা যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। উপসংহারে তিনি বলেছেন – যে পাল সাম্রাজ্য প্রায় চারশ' বছরের অধিককাল পূর্ব-ভারত শাসন করেছে তার ভিত্তি ছিল সামন্ত ব্যবস্থা।

শর্মার মডেলের কয়েকটি দুর্বলতা রয়েছে। দান-প্রাপ্ত জমির রাজস্ব হতে অব্যাহতিপ্রাপ্তি অন্য লোকজন থেকে কর আদায় করার কর্তৃত্ব বুঝাত না। বরং উল্টো এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যার মাধ্যমে ইঙ্গিত মেলে, দানে-প্রাপ্ত জমির গ্রহীতাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হয়েছে (চক্রবর্তী, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ)। ফলে ভূমি-দান আবশ্যিকভাবে উপ-সামন্তায়নে রূপ লাভ করেনি। দ্বিতীয়ত মুখিয়া যথার্থই দেখিয়েছেন, য়ুরোপীয় অর্থে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব ভারতে একেবারেই ছিল না। দক্ষিণ এশিয়ার জমির উর্বরতার উচ্চ-মাত্রা এবং কৃষকদের নিম্ন জীবিকা-স্তরের জন্য রাষ্ট্র মুক্ত কৃষকদের কাছ থেকে কৃষি-উদ্বৃত্তের একটি বড় অংশ সংগ্রহ করতে পারত। অন্যদিকে ইউরোপে শ্রমের স্বল্পতার কারণে ভূমিদাসদের তালুকের মধ্যে আটকিয়ে রাখা ছাড়া যথেষ্ট উদ্বৃত্ত সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। তৃতীয়ত শর্মার ছাঁচ বাংলার অধিকাংশ এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। চক্রবর্তী বলেছেন, *শাসন* এবং *অগ্রহরা* নামের লাভজনক ভোগ-দখলের অধিকার বাংলার 'কৃষি জমির একটি ক্ষুদ্রাংশ ব্যতীত অন্য এলাকায় বিস্তৃত ছিল না; দেশের বিপুল সংখ্যক চাষীকে কখনও তা স্পর্শ করেনি' (Chakravarti, ১৯৪৩, পৃ. ৬৭)। উপরন্তু পূর্ব-বাংলায় ভূমি-দান পুরো গ্রাম ধরে হয়নি, কিছু কিছু ভূমি-খণ্ডের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতিতুলনায় বিহারে অনেক ক্ষেত্রে ভূমি-দান ঘটেছে শত শত গ্রাম নিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, নালান্দা বিহারের মালিকানা বিস্তৃত ছিল ২১৪টি গ্রামে। বিভিন্ন গ্রামে বিচ্ছিন্ন জমি-দান বাংলায় সামন্তপ্রথা গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক ছিল না। ফলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলে ভূমি-বন্দোবস্ত পাল সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ছিল।

উক্ত বিশ্লেষণ হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা অঞ্চলে রাষ্ট্রের উৎস ও ভূমিকা সম্পর্কে সন্তোষজনক কোনও ব্যাখ্যা শোষণ-তত্ত্বে মেলে না। এ সব তত্ত্ব নতুন, এবং পাশ্চাত্য সমাজ বিজ্ঞানের উপজাত (byproduct) ধারণা। প্রতিতুলনায় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে চুক্তিমূলক তত্ত্ব বাংলার ঐতিহ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। ধরে নেয়া ঠিক নয় যে, সামাজিক চুক্তির ধারণা লক্ ও রুশো-র আবিষ্কার। এ ধারণার সবচেয়ে আদি সূত্রের সন্ধান মেলে বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের *মহাসম্মত* (মহান নির্বাচিত পুরুষ) মতবাদের মধ্যে। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে যে, সভ্যতার সবচেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ পরম শান্তিতে বসবাস করত; সেখানে ক্ষুধা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরিবার বা সরকার ছিল না। শ্রেণীভেদ গড়ে ওঠার সাথে সাথে মানুষ তার আদিম পবিত্রতা হারিয়ে ফেলে। ফলে, অপরাধের ব্যাপ্তি ঘটে। এ সব সমস্যা সমাধানকল্পে জনগণ একত্রিত হয়ে কোনও

একজনের ওপর শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব অর্পণ করে; অঙ্গীকার করে যে, তাদের জমিতে উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ তারা তাকে প্রদান করবে। সে জন্য রাজাকে বলা হয় "মহান নির্বাচিত পুরুষশ্রেষ্ঠ" বা *মহাসম্মত*। বৌদ্ধ ধর্মতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা অনুসারে তিনিই *রাজা*, (*রাজা* শব্দটি *রঞ্জয়তি* হতে উদ্ভূত) যিনি জনগণকে তোষণ করেন; রাজার মূল কাজ হচ্ছে জনগণকে তুষ্ট করা (Basham, ১৯৫৯)। প্রাচীন ভারতে আরেকটি রাজনৈতিক মতবাদ ছিল যা *মাৎস্যন্যায়* (যেখানে বড় মাছ (ক্ষমতাশালী) ছোট মাছকে (দুর্বলকে) গিলে খায়, অর্থাৎ একে নৈরাজ্যকর অবস্থা বলা চলে) নামে পরিচিত ছিল। এই মতানুসারে নৈরাজ্যের অবসানকল্পে রাজার পদটি গড়ে তোলা হয়। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্র ফলকে এই মতবাদের কথা উৎকীর্ণ হয়েছে; এতে বলা হয়েছে যে, পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালকে *প্রকৃতিগণ* (যারা সম্ভবত স্থানীয় নেতৃবর্গ বা সাধারণ মানুষ) "*মাৎস্যন্যায়* অবসানকল্পে" রাজার পর্যায়ে উন্নীত করে (Khan, ১৯৮৯)। আসামে দশম শতাব্দীতে একই ধরনের নির্বাচিত নৃপতি ছিল বলে তথ্য মেলে (দত্ত, ১৯৮৬)। তাই যথার্থই বলা চলে, রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে চুক্তিমূলক তত্ত্ব বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীগণ যেহেতু সর্ব-ভারতীয় সাম্রাজ্য নিয়ে সম্পূর্ণভাবে মোহগ্রস্ত থেকেছেন তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা রাষ্ট্রের চুক্তিমূলক তত্ত্বকে অবহেলা করেছেন। *মহাসম্মত ও মাৎস্যন্যায়* -এর প্রাচীন মতবাদে চুক্তিমূলক তত্ত্বের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন চুক্তিমূলক তত্ত্বের অন্তর্নিহিত পূর্ব-অনুমান হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রের স্থায়ীত্ব রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ও তার ব্যয়ের ওপর নির্ভরশীল। তবে, চুক্তিমূলক তত্ত্বের অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ অর্থনীতিতে সামাজিক চয়ন (public choicc) তত্ত্বের উদ্ভবের আগে স্পষ্টভাবে উত্থাপন করা হয়নি। সাম্প্রতিক সাহিত্যে দু'ধরনের চুক্তিমূলক তত্ত্ব সহজেই চিহ্নিত করা যায় : ১. স্বতঃস্ফূর্ত শাসন, এবং ২. রাষ্ট্র সম্পর্কে নব্য-ধ্রুপদী (neo-classical) তত্ত্ব। স্বতঃস্ফূর্ত শাসনের তত্ত্ব দাবি করে যে, সমাজের সদস্যদের সাধারণ অভিজ্ঞতা ও সমঝোতার ভিত্তিতে নিয়ম-নীতি (convention) প্রতিষ্ঠা পায়। প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতি সর্বদা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়। এতদসত্ত্বেও নিয়ম-নীতি নিজেই নিজের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে এবং তা আদর্শ হয়ে দাঁড়ায় (Sagden, ১৯৮৯)। বহুকাল ধরে সুস্থিত ক্ষুদ্র রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য এই ধারণা-কাঠামো হয়ত প্রযোজ্য। তবে, বাংলা অঞ্চলের প্রচণ্ড অস্থিতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে এই ছাঁচ অপ্রাসঙ্গিক।

রাষ্ট্রের নব্য-ধ্রুপদী তত্ত্ব নিম্নোক্ত পূর্ব-অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত (North, ১৯৮০)। প্রথমত, রাষ্ট্র ও শাসিতের মধ্যে একটি লেন-দেন প্রক্রিয়া বিদ্যমান। রাজস্বের বিনিময়ে রাষ্ট্র কতিপয় সেবা প্রদান করে। শোষণমূলকতত্ত্ব ভৌত অবকাঠামো (যেমন, সেচ) নিয়ে আচ্ছন্ন ছিল; অপরদিকে, নব্য-ধ্রুপদীতত্ত্ব সামাজিক অবকাঠামোর সেবার – যেমন, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। একজন মানুষ তখনই রাষ্ট্রের সেবা ক্রয় করবে যখন সেই সেবা সে নিজে নিশ্চিত করতে অপারগ হবে বা নিজে সেই সেবা সরবরাহ করতে গেলে তার ব্যয় রাষ্ট্রকে

দেয় করের চাইতে বেশি হবে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে সম্ভবপর সবচেয়ে অধিক রাজস্ব সংগ্রহ করে তার সম্পদ বৃদ্ধি করা। তবে রাষ্ট্রের সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দু'টি বাধা রয়েছে : ১. প্রতিযোগিতার বাধা, এবং ২. লেন-দেনের ব্যয়জনিত বাধা। প্রথম বাধার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এ ক্ষেত্রে সর্বদাই সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্তিত্ব ছিল – তারা একই ধরনের সেবা প্রদান করতে পারত। প্রতিদ্বন্দ্বীরা বাইরে থেকে আসতে পারত; আবার ভেতর থেকেও গড়ে উঠতে পারত এই প্রতিযোগী। সামরিক শক্তি অর্জনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করতে পারলেই কোনও ব্যক্তি সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারত। সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোণঠাসা করে রাখার জন্য বিশেষ সুবিধা দিয়ে রাষ্ট্র তাদের কিনে ফেলত এবং কম খরচে ভালো সেবা সরবরাহ করে জনগণের সমর্থন আদায় করতে চাইত। শাসনের সুনির্দিষ্ট শর্ত থেকে লেনদেনের ব্যয় (transaction cost) নির্ধারিত হয়। এই ব্যয় মূলত খাজনা পরিবীক্ষণ, নির্ধারণ ও আদায়ের জন্য। খাজনা প্রদান যদি খাজনা-প্রদানকারীর স্বার্থের অনুকূলে যায় তবে সেই পদ্ধতি পরিচালনায় কোনও সমস্যা দেখা দেয় না। কিন্তু মানুষ সর্বদাই খাজনা ফাঁকি দিতে চায়। খাজনা আদায়ের জন্য রাষ্ট্রকে এজেন্ট নিয়োগ করতে হয়। ফলে, রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়। তৃতীয়ত, রাষ্ট্র হচ্ছে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান। নর্থ রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন যে, রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি "সংগঠন যার সহিংসতার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার সুবিধা আছে। এই সংগঠন একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বিস্তৃত; সমাজের বিভিন্ন অংশকে খাজনা দিতে বাধ্য করার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে তার সীমান্ত নির্ধারিত হয়।" সেবার মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বেশিরভাগ সময়ই বাছ-বিচারহীন একচেটিয়া সুবিধাবাদীর মতো আচরণ করে। কিন্তু বিকল্পের নিরিখে ব্যয়ের ভিন্নতা ও সমাজ গঠনকারী বিভিন্ন দলের দর-কষাকষি করার ক্ষমতার ভিন্নতার কারণে রাষ্ট্র বিভিন্ন দলের সাথে বিভিন্ন ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

রাষ্ট্র-কাঠামোর তারতম্য ব্যাখ্যা করার যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে পূর্বোক্ত পূর্ব-অনুমানসমূহের। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নব্য-ধ্রুপদী ছাঁচের নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে :

১. রাষ্ট্রহীন সমাজেও শৃংখলা বজায় থাকতে পারে। অনানুষ্ঠানিক সমাজ-কাঠামোসহ একটি ঘনসংবদ্ধ সামাজিক নেটওয়ার্ক এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও স্বীকৃত আইন-কানুনের বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের সমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তথ্যের ক্ষেত্রে ব্যয়বহুলতা। আদিম সমাজের নিরাপত্তা ও বিধান-প্রয়োগ ব্যবস্থার মূল প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে আত্মীয়তার বন্ধন।

২. রাষ্ট্রের আকার রাজস্বের প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেখানে রাজস্ব সংগ্রহ সহজ সেখানে রাষ্ট্র বড় আয়তনের হওয়াই স্বাভাবিক। উপরন্তু, রাজস্বের ধরনই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যাপ্তি নির্ধারণ করে। ফ্রিডম্যান যুক্তি দেখিয়েছেন যে, রাজস্বের প্রধান উৎস যদি বাণিজ্য হয়, তবে রাষ্ট্র হবে বড় আয়তনের; আর খাজনা যদি হয় প্রধান উৎস তবে রাষ্ট্র হবে ছোট।

৩. রাষ্ট্রের কাঠামোর ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা ততক্ষণই বজায় থাকে যতক্ষণ গঠনকারী (constituents) অংশের ক্ষেত্রে বিকল্পের নিরিখে ব্যয় একই থাকে, বা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসমূহে তুলনামূলক শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকে। এর অর্থ হল, বাহির থেকে কোনও আক্রমণ না হলে, বা ভেতর থেকে কোন অভ্যুত্থান না ঘটলে রাষ্ট্রের একাধিপত্য অবিঘ্নিত থাকে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, জনসংখ্যার পরিবর্তন ও শাসন পরিচালনার ব্যয়ে পরিবর্তন ঘটলে বিদ্যমান ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে। সাধারণত রাষ্ট্রের দমনমূলক ক্ষমতার কারণে জনগণের মধ্যে আইন সম্বন্ধে অনাগ্রহের সৃষ্টি হয়; এবং নির্মম হলেও সাধারণভাবে জনগণ তা মেনে চলে।

৪. একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতার মাত্রা কত হবে তা নির্ভর করে তার বিকল্প প্রতিষ্ঠানের ফলপ্রসূতার ওপর। নর্থ-এর ভবিষ্যদ্বাণী হল, 'বিকল্পটি যত সমপ্রকৃতির হবে, শাসকের স্বাধীনতার মাত্রা ততই কমে যাবে এবং তত বেশি করেই গঠনকারী অংশগুলো আয়ের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত-ভাগ নিজেদের কুক্ষিগত করতে সক্ষম হবে' (পৃ. ২৭)। শাসকের নিজস্ব প্রতিনিধিদের মধ্য থেকেই অভ্যন্তরীণ বিকল্প তৈরি হত; তাদের মধ্যে যারা বিদ্যমান রাজস্বের অধিকতর গ্রহণযোগ্য অংশ দেবার প্রস্তাব করে গঠনকারী অংশের মধ্যে সমর্থন সৃষ্টি করতে পারত, বা যে সব ধনী ব্যক্তি সামরিক শক্তি অর্জন করতে পারত তাদের মধ্যেই বিকল্প সৃষ্টি হত। স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যয় বিদ্যমান পদ্ধতির বৈধতার ধারণার সাথে উল্টোভাবে সম্পর্কিত। বিদ্যমান শাসন-ব্যবস্থা যদি ন্যায্য বলে মনে করা হয় তা হলে তার পরিচালনা ব্যয় কমে যায়।

রাষ্ট্রের নব্য-ধ্রুপদী তত্ত্ব ধারণা দেয় যে, ক্ষুদ্র প্রান্তিক পরিবর্তন শেষমেশ রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামোগত পুনর্গঠনের জন্ম দিতে পারে। সময়ের দীর্ঘ পরিসরে একটি রাষ্ট্রের কাঠামোও পরিবর্তিত হতে পারে। বিদ্যমান তথ্যাদির বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা-অঞ্চলে রাষ্ট্র-কাঠামো অপরিবর্তিত ছিল না। মুসলমান-পূর্ব আমলের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ছিল মুসলমানী শাসন ব্যবস্থা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন।

প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার তিনটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, প্রাচীন বাংলা কোনও সর্ব-ভারতীয় সাম্রাজ্যের জন্ম দেয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের অভিজ্ঞতার সাথে এর লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে; ঐ সব অঞ্চল ছিল বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি। দ্বিতীয়ত, বাংলার ভেতরেই রাজনৈতিক সংগঠনের শক্তি ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় আঞ্চলিক তারতম্য ছিল। প্রায়শই পার্শ্ববর্তী মহা-সাম্রাজ্যের প্রভাব পশ্চিম ও মধ্য বাংলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হত। প্রতিতুলনায়, পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার অভিজ্ঞতা হল আঞ্চলিক রাজনৈতিক খণ্ডায়ন। তৃতীয়ত, ঐতিহাসিক কালে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্বের অনুপস্থিতির ফলে বাংলা বদ্বীপে সর্বদা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করত। এতদঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বুনো ফুলের মতো ফুটে উঠত আর ঝরে পড়ত।

বাংলার ইতিহাসে রাজনৈতিক খণ্ডায়ন এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য; গতানুগতিক বিশ্লেষণে তা অবহেলিত থেকেছে। এ সব বিশ্লেষণের পূর্ব-ধারণা এই যে, এ অঞ্চলের ইতিহাসের গতিধারা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের মূলধারার সাথে অভিন্ন। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ তাঁদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিকে মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন; তাঁদের মতে খ্রিষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর গঙ্গাঋদ্ধি সাম্রাজ্য থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মোগল সাম্রাজ্য পর্যন্ত বাংলা অঞ্চলের রাষ্ট্রব্যবস্থা দু'হাজার বছরের অধিক কালব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন ছিল (Majumder, ১৯৮১)। এ সব সাম্রাজ্যের মধ্যে কিছু কিছু সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল উত্তর ভারতে এবং বাংলা পর্যন্ত তাদের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। তবে মনে করা হয় যে, অধিকাংশ সাম্রাজ্যই বাংলার মাটিতে জন্ম লাভ করেছিল। বাংলার এই সাম্রাজ্যকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শিলালৈখিক (epigraphic) প্রমাণাদি দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে; এই অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সত্যিকার উপলব্ধিকে এ ব্যাখ্যা ব্যাহত করেছে।

সাধারণত, কিবংদন্তির গঙ্গাঋদ্ধি সাম্রাজ্যকে বাংলার জনগণের রাজনৈতিক প্রতিভার আদি সাফল্যের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। ধ্রুপদী লেখকগণ গঙ্গাঋদ্ধিকে দক্ষিণ এশিয়ার 'সবচেয়ে মহান জাতি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। জনশ্রুতি অনুসারে মহামতি আলেক্সান্ডার গঙ্গাঋদ্ধি সাম্রাজ্যের ভয়ে তার অগ্রযাত্রায় নিরস্ত হয়েছিলেন। ধ্রুপদী লেখকবৃন্দ পূর্ব-ভারতে সমসাময়িক আরেকটি সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব প্রত্যয়ন করেন যা প্রাসিয়য় বলে পরিচিত । প্রাসিয়য় ও গঙ্গাঋদ্ধি কি একই সাম্রাজ্যের অংশ ছিল নাকি দু'টি স্বাধীন সাম্রাজ্য ছিল, তা স্পষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, কার্টিস গঙ্গাঋদ্ধি ও প্রাসিয়য়-কে একই রাজার অধীনে দু'টি জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। গঙ্গাঋদ্ধি যদি একটি স্বাধীন রাজ্য হয়ে থাকে তাহলে তার অবস্থান হবে প্রাসিয়য়-এর পূর্বে – যা গঙ্গা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একটি রাজ্য যদি গঙ্গার পূর্ব এলাকার বাংলা বদ্বীপ নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে তবে বিশাল এলাকা নিয়ে রাজ্যটির গঠিত হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

পরবর্তীকালে বাংলার কিছু কিছু অংশ মৌর্য সাম্রাজ্য (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১-১৮৫ সাল) এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের (৩৩১-৬০০ খ্রিষ্টাব্দ) দখলে ছিল। মৌর্য ও গুপ্ত উভয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল বিহার। শিলালৈখিক প্রমাণপঞ্জি তুলে ধরে যে, এ সাম্রাজ্যগুলোর প্রভাব পশ্চিম ও মধ্য বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল। উপরন্তু, ঐতিহাসিক প্রমাণাদি পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় স্বাধীন রাজত্বের অস্তিত্বের নির্দেশ করে (উদাহরণস্বরূপ ফরিদপুরের কোটালিপাড়া শিলালেখ)। পূর্ব-ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থলাভিষিক্ত হয় শশাঙ্কের সাম্রাজ্য (৬০০-৬৩৭ খ্রি.)। ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জি সুস্পষ্টভাবেই প্রতিপাদন করে যে, সম্রাট শশাঙ্ক নয়, ভদ্র রাজবংশই পূর্ব বাংলা শাসন করেছে। শশাঙ্কের কর্তৃত্ব পশ্চিম ও মধ্য বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল। পরিশেষে, দাবি করা হয় যে, পাল সাম্রাজ্যের (৭৫০-১১৬২ খ্রি.) শাসনকাল ছিল চারশ' বছরের অধিক; এটি বাঙালিদের সাম্রাজ্য ছিল। এ কথা ঠিক, পাল সাম্রাজ্যে মাঝে-মধ্যে উত্তর বাংলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যটি ছিল মূলত বিহারভিত্তিক। আদি পাল শাসকদের সমস্ত শিলালেখই বিহার থেকে জারি করা হয়; পাল শাসনের প্রথম দু'শ বছরের একটি শিলালেখও পাওয়া যায়নি যাতে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পাল অধিকার উল্লেখিত হয়েছে। প্রতিতুলনায় শিলালৈখিক

উপকরণসমূহ পূর্ব বাংলায় ভদ্রদের স্বাধীন রাজত্বের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ক্ষুদ্র একটি সময়কাল (১০৪৩-১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে) ব্যতীত পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলা পাল রাজাদের কর্তৃত্ব এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল (Chowdhury, ১৯৬৭)। উপরন্তু, সর্বশেষ পাল রাজা বাংলায় নয়, বিহারে রাজত্ব করতেন। পাল রাজাদের কোনও স্থায়ী রাজধানী ছিল না। শর্মা পাল রাজকীয় অধিষ্ঠানের নিম্নোক্ত নয়টি কেন্দ্রস্থল চিহ্নিত করেছেন : ১. পাটালিপুত্র, ২. মদগিরি, ৩. রামবতী (মালদহ জেলায়), ৪. বাটা পার্বতক (ভাগলপুর জেলা), ৫. বিলাসপুর, ৬. হরদাম, ৭. শাশাসা-গঙ, ৮. কাঞ্চনপুর, এবং ৯. কপিলভাষক (শর্মা, ১৯৮৫)। এদের কোনওটিই পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় অবস্থিত নয়; রাজকীয় অধিষ্ঠানের শুধু একটি কেন্দ্র মধ্য বাংলায় অবস্থিত। এ সব তথ্য সুস্পষ্টভাবেই নির্দেশ করে যে, পাল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল বিহার।

মধ্য ও পশ্চিম বাংলার অংশবিশেষ ছিল বিহার-সংলগ্ন। ফলে, বিহারভিত্তিক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য মাঝে-মধ্যে পশ্চিম ও মধ্য বাংলার সংলগ্ন এলাকাকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করত। তবে কেন্দ্রীয় শাসন যখন দুর্বল হয়ে পড়ত তখন এ সব এলাকা আবার স্বাধীন হয়ে যেত। এ সব বিহারভিত্তিক সাম্রাজ্যের প্রভাব কদাচিৎ দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলায় সম্প্রসারিত হত। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্র ছিল ক্ষুদে ক্ষুদে রাজত্বে আকীর্ণ। বাংলাদেশ অঞ্চলকে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল রাজবংশ শাসন করত, তাদের মধ্যে এগারোটি এলন পর্যন্ত চিহ্নিত হয়েছে : ১. বৈণ্যগুপ্তের রাজত্ব (৬ষ্ঠ শতাব্দী), ২. ফরিদপুর রাজবংশ (৬ষ্ঠ শতাব্দী), ৩. ভদ্র রাজবংশ (আনুমানিক ৬০০-৬৫০ খ্রি.), ৪. খড়গ রাজবংশ (আনুমানিক ৬৫০-৭০০ খ্রি.), ৫. নাথ রাজবংশ (আনুমানিক ৭০০ খ্রি.), ৬. রাত রাজবংশ (আনুমানিক ৭০০ খ্রি.) ৭. দেব রাজবংশ (আনুমানিক ৭৫০-৮০০ খ্রি.), ৮. হরিকেলের শাসককূল (আনুমানিক ৮০০-৯০০ খ্রি.), ৯. চন্দ্র রাজবংশ (আনুমানিক ৯০০-১০৪৫ খ্রি.), ১০. বর্মণ রাজবংশ (আনুমানিক ১০৮০-১১৫০ খ্রি.), এবং ১১. পট্টিকেরা রাজবংশ (আনুমানিক ১০০০-১১০০ খ্রি.)। ঐতিহাসিক প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করলে এই ইঙ্গিতই মেলে যে, এ সব রাজত্ব ছোট হলেও সার্বভৌম ছিল; তারা সর্ব-ভারতীয় সাম্রাজ্যের করদ রাজ্য ছিল না। ঐতিহাসিক সূত্রসমূহ তুলে ধরে যে, বাংলার বাইরে যে সব সর্ব-ভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল তাদের প্রভাব পশ্চিম থেকে পূর্বে ক্রমাগতহারে হ্রাস পেয়েছিল।

প্রাচীন বাংলায় পুরো সময় জুড়েই ছিল সতত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। ৫০০ থেকে ১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় একেকটি রাজবংশ গড়ে ৮০ বছরেরও কম সময় স্থায়ী হত। বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক বিবর্তন পার্শ্ববর্তী বিহার ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। প্রাচীনকালে বিহার নন্দ, মৌর্য, গুপ্ত ও পালদের বিশাল সাম্রাজ্যের উত্থান প্রত্যক্ষ করেছে। আসামে সমরবাদী অহম শাসকবর্গ একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়; তা প্রায় ছয়শ' বছর স্থায়ী হয় (ত্রয়োদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী)। অনুরূপভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলও বিশাল সাম্রাজ্যের উত্থান প্রত্যক্ষ করেছে (উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ ভারতের পল্লব ও

সেন সাম্রাজ্য)। প্রতিতুলনায় বাংলা অঞ্চলে – বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ এলাকায় রাজনৈতিক সত্তা সব সময়েই ছিল ক্ষুদ্র ও স্বল্পায়ু।

বৃহৎ সাম্রাজ্যের দীর্ঘকালীন অস্তিত্ব বৃহৎ সেনাবাহিনী প্রতিপালনের জন্য সম্পদ আহরণের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। প্রাচীন সাম্রাজ্যের সম্পদ সাধারণত আদায় করা হত ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি থেকে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বৃহৎ সাম্রাজ্যের মধ্যে দৃঢ় সহ-সম্পর্ক রয়েছে। তবে কার্য-কারণ সম্পর্ক উভয় দিক থেকেই সত্য হতে পারে। বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজস্বের জন্য বণিকের প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদিকে সম্পত্তি ও চুক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বণিকদেরও দরকার হয় শক্তিশালী রাষ্ট্রের। স্থলপথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে পণ্য চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়। স্থলপথে বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জন্য বৃহৎ রাষ্ট্র আবশ্যক। বাংলায় বাণিজ্যের বৃহদাংশ পরিচালিত হত নৌ পথে। বাংলার বদ্বীপ এলাকা অভ্যন্তরীণ নদী-নালার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সহজেই সমুদ্রে প্রবেশ করা যেত। ফলে, বাংলার বণিককুলের বৃহৎ সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হত না।

গতানুগতিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রাচীন বাংলায় সমৃদ্ধ বৈদেশিক বাণিজ্যের উল্লেখ করে (Islam, ১৯৮৪)। ঐতিহাসিক সূত্রাবলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন বাংলার বাণিজ্যের পরিমাণকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। প্রথমত, বিপুল আয়তনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের মুদ্রার প্রচলনে অবদান রাখত। ঐতিহাসিক সূত্র থেকে স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত মেলে যে, সহস্র বছরের অধিককাল – চতুর্থ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থনীতিতে মুদ্রার প্রচলন ছিল নগণ্য। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন উল্লেখ করেছেন যে, বাংলায় চতুর্থ শতাব্দীতে কড়ি ছিল লেন-দেনের প্রধান মাধ্যম। দ্বাদশ শতাব্দীর সেন শাসকদের দলিল-দস্তাবেজ নির্দেশ করে যে, রাজারা কড়িতে দান-কার্য সম্পাদন করতেন। তুর্কী ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন উল্লেখ করেছন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় সমস্ত অর্থনৈতিক লেন-দেন হত কড়িতে। মরক্কোর পরিব্রাজক ইবনে বতুতা চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলা ভ্রমণ করেছিলেন; তিনিও দেখতে পেয়েছেন যে, বাংলায় কড়ি হচ্ছে লেন-দেনের প্রধান মাধ্যম। পঞ্চদশ শতাব্দীর পরিব্রাজক মা হুয়ান বাংলার অর্থনৈতিক লেন-দেনে কড়ির প্রাধান্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যে স্থানীয় বণিকদের ভূমিকা ছিল খুবই নগণ্য; বাইরের বণিকরা তাতে একাধিপত্য বিস্তার করেছিল। বাংলায় বাণিজ্যের সুফল তাই সামান্য হওয়াই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর – অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যকার পাঁচশ' বছরের পরিসরে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবনতি লক্ষ করা যায় (রায়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ)। বাণিজ্যের এই ক্রমাবনতির কারণ হিসেবে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টির পরিণামে এশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যে আরব আধিপত্যের উদ্ভবকে চিহ্নিত করা হয়। পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা বদ্বীপে রাষ্ট্রের আয়তন নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের ভূমিকা ছিল নগণ্য।

নব্য-ধ্রুপদী তত্ত্বে প্রথাগত পূর্ব-অনুমান হচ্ছে, রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় (North, ১৯৮১, পৃ. ২৩)। যুক্তি উপস্থাপন

করা হয় যে, বৃহত্তর রাষ্ট্র অধিকতর বিস্তীর্ণ এলাকায় স্বল্পতর ব্যয়ে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান করতে পারে। বাংলাদেশ অঞ্চলের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, এখানে শাসন-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ছিল না। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ অঞ্চলের অভিজ্ঞতার ভিন্নতার চারটি কারণ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, বাংলাদেশ অঞ্চলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালন-ব্যয় বেশি। বাংলাদেশে স্পষ্টতঃই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না; সে জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বা রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কোনও তৃণমূল সংগঠনও ছিল না। বাংলাদেশের গ্রামে কোনও গ্রাম-প্রধান বা মোড়ল ছিল না। অধিকন্তু গতানুগতিক গ্রাম কর্মচারিরাও ছিল না এখানে। দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে গ্রাম-প্রধান এবং গ্রাম কর্মচারিবৃন্দ তৃণমূল পর্যায়ে প্রশাসন পরিচালনা করত। দক্ষিণ এশিয়ার বাদ-বাকি এলাকায় গ্রাম মধ্যবর্তী সংগঠন – যেমন, *নাড়ু* এবং *পেড়িয়ানাড়ু* দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যুক্ত ছিল। দুবে উল্লেখ করেছেন যে, "কয়েকটি গ্রামের গুচ্ছের ওপর ভিত্তি করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল; প্রতি গুচ্ছেরই স্বীকৃত নেতা থাকতঞ্জ (Dube, ১৯৫৫, পৃ. ২)। গ্রাম-সরকার বা গ্রাম-গুচ্ছ কোনওটির অস্তিত্বই বদ্বীপীয় বাংলায় ছিল না। দ্বিতীয়ত, বদ্বীপীয় বাংলায় প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তথ্যের আদান-প্রদান ব্যয় ছিল বেশি। এতদঞ্চলে গ্রামীণ বসতি ছিল বিচ্ছিন্ন। অপরপক্ষে, দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ এলাকায় গ্রামবসতি ছিল কেন্দ্রকে ঘিরে (nucleated)। কেন্দ্রকে ঘিরে গড়ে-ওঠা একটি বসতি থেকে সহজেই তথ্য সংগ্রহ করা যেত। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বসতি হতে চাষাবাদের তথ্য সংগ্রহের জন্য অধিকতর সময় ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন হত। তৃতীয়ত, বাংলা বদ্বীপে অনাবাদী জমির প্রতুলতা এবং এ সব জমি-জমা চাষাবাদের আওতায় আনার ক্ষেত্রে ব্যয়ের স্বল্পতার কারণে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় দেশান্তরি হওয়া ছিল সহজ। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মাত্রাতিরিক্ত শোষণ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক না হওয়াই স্বাভাবিক। পরিশেষে বলা যায়, বদ্বীপের ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের কারণে সেনা অভিযান চালানোর সুযোগ ছিল সীমিত। বাংলা বদ্বীপের অধিকাংশ এলাকাই ছিল জলাভূমি; অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল এ অঞ্চলে জালের মতো বিস্তৃত। এখানে যাতায়াতের বাহন কী হবে তা নির্ভর করত পানির উচ্চতার ওপর। যথার্থই বলা হয়েছে যে, "বাংলাদেশ হচ্ছে বিপুল দূরত্বের ছোট্ট একটি দেশ" (Novak, ১৯৯৩, পৃ. ৩৮)। বাংলা বদ্বীপ চলাচলের জন্য একটি সংকুল এলাকা। এ ধরনের ভূ-বৈশিষ্ট্যের একটি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যয় তার আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়ে যাবে এটিই স্বাভাবিক।

প্রাচীনকালে বাংলা বদ্বীপের রাজ্যগুলি শুধু ছোটই নয়, অস্থিতিশীলও ছিল। রাষ্ট্র ছোট হলেই অস্থিতিশীল হবে তেমন কোনও কথা নেই। যতক্ষণ না তারা কোনও সংকটের সম্মুখীন হয় ততক্ষণ তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। বাংলা বদ্বীপে ছোট ছোট রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রধান হুমকি এসেছে বিদেশী আক্রমণ থেকে। বাংলা বদ্বীপের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো বৃহৎ ও শক্তিশালী রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। আক্রমণকারীরা শুধু পশ্চিম দিক থেকেই আসেনি (যেমন, মৌর্য, গুপ্ত, পাল, রাষ্ট্রকূট, চোল ইত্যাদি), উত্তর দিক (যেমন, বর্মণ ও আসামের পালগণ), এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকেও (যেমন, আরাকান ও ত্রিপুরা) এসেছে তারা। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আরেকটি

দুর্বলতা হচ্ছে ভেতর থেকে সহজেই বিদ্রোহ করার সুযোগ। যখন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জনসাধারণ অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে তখন সহজেই তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। বাংলা বদ্বীপের ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ বাইরের আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দ্বারা সংকটাপন্ন হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের কোনও সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য তারা যথেষ্টভাবে প্রস্তুত ছিল না। এ সব সংকট হতে উত্তরণের জন্য ছোট ছোট রাষ্ট্রের প্রয়োজন হত যথেষ্ট সম্পদ আহরণ। কিন্তু প্রতিযোগিতা ও রাষ্ট্র পরিচালনার উচ্চ ব্যয় সেই সম্পদ আহরণকে বাধাগ্রস্ত করত। ফলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মৃত্যুহার ছিল খুব বেশি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা বদ্বীপে রাষ্ট্রের আয়তন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। মুসলমান শাসকগণ বাংলার অধিকাংশ এলাকাকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেন। বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক জীবনে এই নতুন প্রবণতার ক্ষেত্রে দু'টি কারণকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথমত, নতুন সামরিক প্রযুক্তি প্রবর্তনের ফলে সর্ব-ভারতীয় সাম্রাজ্যের আইন-শৃংখলা রক্ষার ক্ষমতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতে সেনাবাহিনী ছিল পদাতিক। স্থানীয় ঘোড়া ছিল অপর্যাপ্ত এবং অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য অনুপযুক্ত। ফলে, উচ্চ মূল্যে পারস্য ও আরব দেশ থেকে ঘোড়া আমদানি করতে হত। প্রথম দিককার মুসলমান শাসকদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব দ্রুত অশ্বারোহী বাহিনীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। অশ্বারোহী বাহিনীর তুলনামূলক সুবিধা খর্ব হয়ে যায় যখন দিল্লি-ভিত্তিক সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বীরাও অশ্বারোহী বাহিনী ব্যবহার করতে শুরু করে। পরবর্তী পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় আগত মোগলদেরকে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য অধিকতর শক্তিশালী প্রযুক্তির প্রবর্তন করতে হয়। এই প্রযুক্তি হল যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য কামান; তার মূল্যও ছিল অত্যন্ত বেশি (Rothermund, ১৯৮৮)। নতুন ধরনের কামানের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে মোগল সাম্রাজ্যকে প্রায়শই 'বারুদ সাম্রাজ্য' বলে অভিহিত করা হয়। পদাতিক সেনাদল থেকে দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনাদলে উত্তরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য কামান কেন্দ্রীয় সরকারের অভিযান পরিচালনার ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করে। বাংলার মতো দূরে দূরে অবস্থিত এলাকাকে দীর্ঘদিন কব্জা করে রাখাকে তা সম্ভবপর করে তোলে। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে একই সময়ে। আইন-শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দিল্লিভিত্তিক সর্ব-ভারতীয় সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে উজ্জীবিত করে। য়ুরোপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুভ্যুদয়ের অনুবর্তিতে ঘটার সাথে সাথে ভারত মহাসাগরেও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। বাণিজ্যের ব্যাপ্তি বাংলার শাসকদের রাজস্ব সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। রাজস্ব ছাড়াও বণিকরা ঋণের সহজলভ্য সুযোগ সৃষ্টি করে। ইটন্ উল্লেখ করেছেন যে, "প্রকৃতপক্ষে বাংলা জয় করার ক্ষেত্রে মারোয়াড়ী ও মোগলরা একে অপরের সহযোগীরূপে কাজ করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য মোগলরা মানোয়ারীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করে, আর মানোয়ারীরা উত্তর ভারতের সর্বত্র বসবাসকারী নিজ বর্ণের সদস্যদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে মোগলদের পুঁজি সরবরাহ করে" (Eaton, ১৯৯৪, পৃ. ১৫৬)।

ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কর্তৃক বাংলা অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ক্রম-বিলুপ্তিকে তার রাজনৈতিক ঐতিহ্যের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বলা যায়। এই পরিবর্তন চুক্তিমূলক রাষ্ট্র থেকে দখলদার বা শোষণমূলক রাষ্ট্রে উত্তরণ চিহ্নিত করে। নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নিশ্চিতভাবেই দু'টি শোষণমূলক উপাদান ছিল। প্রথমত, ইতিহাসের সকল যুগেই বাংলা অঞ্চল বিদেশী হানাদার কর্তৃক সম্পদের লুটতরাজ প্রত্যক্ষ করেছে। তবে পদাতিক সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশ ছিল বিক্ষিপ্ত ও স্বল্পকালস্থায়ী ঘটনা। ফলে, বাংলা বদ্বীপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য যে সম্পদ গড়ে তুলত তা ঐসব রাজ্যেই থেকে যেত। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে দিল্লির অধিপতিগণ উন্নততর সমর-প্রযুক্তিতে বলীয়ান হয়ে বাংলা অঞ্চল থেকে অব্যাহতভাবে সম্পদ পাচার করার একটি পদ্ধতি গড়ে তোলে। মধ্য যুগের বাংলায় দু'ধরনের শাসক ছিল; দিল্লিভিত্তিক সর্ব-ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিযুক্ত শাসক (governor) এবং স্বাধীন রাজা। প্রাচীন বাংলার স্বাধীন রাজাদের মতো মধ্যযুগীয় বাংলার শাসকরা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে পারত না। দিল্লিতে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকলে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হত। সে জন্য তারা উত্তর ভারতের রাজনীতির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকত। উত্তরের শক্তিশালী সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে অসম প্রতিযোগিতায় সর্বদাই তাদের সমস্ত সম্পদ ও শক্তি নিয়োজিত রাখতে হত। ফলে, রাজস্বের ক্ষেত্রে তাদের দাবি ছিল চির-অতৃপ্ত। মুসলমান সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের সুবেদারগণ উত্তরোত্তর অধিক অর্থ পাঠানোর জন্য অব্যাহত চাপের মুখে থাকতেন। দিল্লিভিত্তিক সাম্রাজ্যের উভয় সংকটকে বেইলী সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন, "আমীর-ওমরাহ ও কর্মচারি শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য নতুন দেশ জয় বা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অব্যাহতভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে হত শাসককূলকে। যদি তারা উচ্চপদ, সম্মান এবং ভূমি-দান করতে অসমর্থ হতেন তবে তাদের নিজস্ব কর্মচারিরাই দিল্লি-খেলায় অংশগ্রহণ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলত" (Bayly, ১৯৯৩, পৃ. ১১)। সমগ্র কৃষি উৎপাদনের শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগের মতো অংশ নগদ অর্থে সংগ্রহ করার ক্ষমতার ওপর এ পদ্ধতির অস্তিত্ব নির্ভর করত। ফলে, মধ্যযুগীয় বাংলায় অর্থনৈতিক শোষণ তীব্রতর হয়। এক হিসাব মতে বাংলায় মোগল শাসনের সর্বোচ্চ প্রতিপত্তির কালে রাজস্ব ও মোট জাতীয় উৎপাদের (GDP) অনুপাত ছিল শতকরা ৪৩.৮ (Khan, ১৯৯২)।

দ্বিতীয়ত মধ্যযুগের বাংলার শাসকগণ রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নতুন একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। আপাতদৃষ্টিতে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে এর মিল রয়েছে; কারণ শাসকবৃন্দ সহজেই রাজস্ব আদায়কারীদের বদলাতে পারতেন। সত্যিকার অর্থে এটি ছিল রাজস্ব আদায়ের জন্য এজেন্সি (প্রতিনিধি) নিয়োগের পদ্ধতি; কিন্তু তাদেরকে সামন্ত প্রভুর মতো অধিকার প্রদান করা হত না। বাংলায় মুসলমান শাসকরা সামরিক ও রাজস্ব কার্যক্রমকে আলাদা করে ফেলেছিল। সেনাবাহিনী পরিচালনা করত অভিবাসী মুসলমান সেনাপতিরা; রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হত হিন্দু ভূস্বামীদের, যারা চৌধুরী, মজুমদার এবং জমিদার নামে পরিচিত ছিল। মধ্যযুগের বাংলায় হিন্দু ভূস্বামীরা য়ুরোপীয় অর্থে সামন্ততান্ত্রিক বা উপ-সামন্ততান্ত্রিক ছিল না; তারা শুধু অভিবাসী শাসক ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সংযোগ-মাধ্যম ছিল।

বাংলার মুসলমান শাসকরা দু'টি কারণে রাজস্ব আদায়ে হিন্দু — বিশেষত কায়স্থদের নিযুক্ত করতে চাইত। প্রথমত, স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের কাছে তাদের এলাকার রাজস্ব সম্পর্কিত বিশদ তথ্য থাকত। সুনির্দিষ্ট গ্রাম-সংগঠনের ঘাটতির কারণে ছড়ানো-ছিটানো বসতি থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য এ সব স্থানীয় মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন পড়ত। দ্বিতীয়ত, হিন্দু জমিদাররা ছিল রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন; ওপরওয়ালারা সহজেই তাদেরকে নিজেদের কাজে লাগাতে পারত। সলিমুল্লাহ-র মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শাসক মুর্শিদ কুলী খান "রাজস্ব আদায়ের জন্য শুধুমাত্র বাঙালি হিন্দুদের নিযুক্ত করেছিলেন; কারণ, হুমকি দিলে বা শাস্তির ভয় দেখালে তারা খুব সহজেই তাদের দুষ্কর্ম ও দুষ্কর্মের সহযোগীদের সম্পর্কে তথ্য দিয়ে দিত। দুর্বল চিত্তের কারণে তারা বিদ্রোহ করতে বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একজোট হতে সাহস পেত না" (Rahim-এ উদ্ধৃত, ১৯৬৭, খণ্ড-২, পৃ. ১৬৩)। কায়স্থদের এ কাজে নিযুক্তির পেছনে আরেকটি বাস্তবতাও কাজ করেছে — মুসলমান বিজয়ের পূর্বে তারা ছিল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী প্রধান বর্ণ এবং বাংলার প্রাচীন শাসক রাজবংশের উত্তরাধিকারীদের তারা তাদের বর্ণে আত্মীকৃত করে নিয়েছিল।

বাংলার মুসলমান শাসকদের জন্য মধ্যস্বত্বভোগী পদ্ধতির প্রধান আকর্ষণ ছিল এই যে, তাদের সহজেই বদলে ফেলা যেত। অন্যদিকে, এ কাজের নিরাপত্তাহীনতার কারণে মধ্যস্বত্বভোগীদের লক্ষ্য স্বল্পমেয়াদে লাভের ওপর নিবদ্ধ থাকত। ফলে সবচেয়ে কম সময়ে যত বেশি খাজনা আদায় করা যায় সে চেষ্টাই করত তারা। তাদের সর্বদা ভয় থাকত পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রতিযোগীরা না আবার কখন তাদের স্থান দখল করে নেয়। সবসময়ই তারা সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করত যাতে তাদের নিজেদের এলাকায় তারা অপরিহার্য হয়ে থাকতে পারে। ফলে অনুপার্জিত মুনাফাবাজ এইসব মধ্যস্বত্বভোগী লাগাতার দলাদলির প্রসার ঘটিয়েছিল যা গ্রাম বাংলায় একটি কলা-র পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর একজন ব্রিটিশ প্রশাসক মন্তব্য করেছেন যে, "সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র গণ্ডীতে নেতৃত্বের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিদারের সৃষ্টি করেছে, এবং প্রতিটি গ্রামেই সাধারণত দলীয় ঝগড়া-ফ্যাসাদ দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে" (Carstairs,. ১৯১২, পৃ. ২৬)।

চুক্তিমূলক রাষ্ট্র থেকে লুণ্ঠনকারী রাষ্ট্রে পরিবর্তন সত্ত্বেও মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকে। প্রাচীনকালে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অভাব রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে স্থায়ী রূপ দেয়। মধ্যযুগীয় শাসকবৃন্দ তাকে আরও তীব্র করে তোলে। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে গ্রাম এলাকায় যে প্রশাসনিক শূন্যতা ছিল তারা তা দূর করেনি, বরং উল্টোদিকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য মধ্যসত্বভোগী হিসেবে কায়স্থদের নিযুক্ত করে এবং গ্রামাঞ্চলে প্রচণ্ড দলাদলির সৃষ্টি করে। তাতে সমস্যাটি আরও জটিল হয়ে ওঠে। সম্পদের অব্যাহত পাচার বাংলা অঞ্চলের রাষ্ট্রকে অধিকতর দুর্বল করে দেয়।

মুসলমান শাসনের প্রথম শতাব্দীতে একজন শাসকের গড় রাজত্বকাল ছিল ৫.৫ বছর : ১৩৪২ থেকে ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দের পরিসরে তা ছিল ৯ বছর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবিসীনীয় প্রাসাদ-রক্ষীরা এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে চারজন রাজাকে খুন করে। প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা রাজনৈতিক প্রভুদের ভাগ্যের ব্যাপারে সাধারণ

জনগণের উদাসীনতা প্রমাণ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট বাবুর উল্লেখ করেছেন যে, "বাংলায় একটি অনন্য প্রথা রয়েছে; সেখানে রাজত্বের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের প্রথা নেই বললেই চলে। রাজাকে খুন করে নিজেকে সিংহাসনে আসীন করতে পারলে যে-কেউ সাথে সাথেই রাজা হিসেবে স্বীকৃতি পায়; আমীর-ওমরাহ, সৈন্য এবং কৃষককুল কালবিলম্ব না করে তাকে মান্য করতে শুরু করে এবং তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। পূর্বতন রাজাকে তারা যেমন সার্বভৌম রাজা বলে গণ্য করত, একইভাবে নতুন রাজাকেও সমভাবে মান্য করে প্রশ্নাতীতভাবে তার আদেশ পালন করত। বাংলার জনসাধারণ বলে যে, 'আমরা সিংহাসনের প্রতি বিশ্বস্ত; সিংহাসন যিনি দখল করে থাকেন আমরা তারই বাধ্য, তারই প্রতি আমরা অনুগত" (Rahim-এ উদ্ধৃত, ৯৬৩; খণ্ড-১, পৃ. ২৪৪)। মোগল দরবারের ঐতিহাসিক আবুল ফজল বাংলাকে *বুলঘাকখানা* বা দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘর বলে বর্ণনা করেছেন। এই অঞ্চলের সতত বিভক্তির কারণ হিসেবে তিনি জনসাধারণের ওপর আবহাওয়ার খারাপ প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে শাহ নিয়ামতউল্লাহ ফিরোজপুরী লিখেছেন :

> বাংলা হচ্ছে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বেদনাকুল দেশ,
> কালবিলম্ব না করে যাও, মৃতদের কাছে দোয়া চাও।
> মাটিতে, পানিতে কোথাও শান্তি নেই, নেই স্বস্তি
> আছে শুধু বাঘের থাবা আর কুমিরের হাঁ।
>
> (Eaton কর্তৃক অনূদিত; তার বই-এ উদ্ধৃত, ১৯৯৪, পৃ. ১৬৯)

পর্তুগীজ পরিব্রাজক টম পিয়রেস (Tom Piores) ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় এসেছিলেন; তিনি উল্লেখ করেছেন যে, দূর-প্রাচ্যের লোকদের বিশ্বাস বাঙলিরা বিশ্বাসঘাতক। উনবিংশ শতাব্দীতে ম্যাকলে-ও কিছুটা অলংকারযুক্ত বাক্যবন্ধে একই ধারণা ব্যক্ত করে বলেছেন, "মোষের যেমন শিং আছে, মৌমাছির আছে হুল, গ্রিক-সঙ্গীতে ব্যক্ত যেমন মেয়েদের সৌন্দর্য, তেমনি বাঙালির আছে প্রতারণা। বড় বড় প্রতিশ্রুতি, মধুভাষী ওজর, বিশদ মিথ্যের বিস্তৃত মালা, ছল-চাতুরি, মিথ্যে হলফ, জালিয়াতি – এ সবই হচ্ছে নিম্ন-গঙ্গার লোকদের আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র" (Chaudhuri-তে উদ্ধৃত, ১৯৮৭, পৃ. ৩৮২)।

বাংলার রাজনৈতিক বিবর্তনের বিশ্লেষণ হতে প্রতিভাত হয় যে, রাষ্ট্রের প্রাচীন রূপ চুক্তিমূলক হওয়াই স্বাভাবিক। পরবর্তী পর্যায়ে, মধ্যযুগে লুণ্ঠনমূলক রাষ্ট্রকে এর ওপর প্রতিস্থাপন করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও যে সব শক্তি রাষ্ট্রের চুক্তিমূলক কাঠামো গড়ে তুলেছিল তাকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন বা দমন করা যায়নি। ফলে রাষ্ট্রের লুণ্ঠনমূলক কাঠামো সুসংহত হওয়া সত্ত্বেও বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকে।

অধ্যায় ৪

ধর্মান্তরের গতিধারা

ইসলামের প্রভাব-বলয়ে একটেরে অবস্থান বাংলাদেশের। যদিও পৃথিবীর প্রতি আটজন মুসলমানের মধ্যে একজন এ অঞ্চলে বাস করে তবু ইসলামধর্ম-বিশ্বাসীদের কেন্দ্রভূমি থেকে এ অঞ্চল ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন। মওরিতানিয়া থেকে পাকিস্তান, তুরস্ক থেকে সোমালিয়া—পৃথিবীর বিশাল এলাকা জুড়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বাস; ভৌগোলিকভাবে এ সব দেশ অবিচ্ছিন্ন ভূমিখণ্ড। বাংলাদেশ অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ইসলাম ও দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে কতগুলো অমীমাংসিত প্রহেলিকা সৃষ্টি করেছে।

বাংলার ভৌত পরিবেশ ও সামাজিক পরিস্থিতি একটি প্রতিনিধিস্থানীয় মুসলমান দেশের তুলনায় আমূল ভিন্ন। ইসলামের ভৌগোলিক প্রাণকেন্দ্র উষর এবং প্রায়-অনুর্বর অঞ্চলে অবস্থিত। অপরদিকে বাংলা হচ্ছে আর্দ্র একটি বদ্বীপ, অসংখ্য নদী-নালা জালের মতো বিস্তৃত এখানে; মৌসুমী আবহাওয়া খেলা করে এই দেশে। ইসলাম মরুযাত্রীদের শহরের ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশে প্রসার লাভ করেছিল। জেভিয়ার দ্য প্লানহোল ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, "এটি হচ্ছে বেদুইনদের দ্বারা প্রচারিত শহরবাসী ও ব্যবসায়ীদের ধর্ম; এরা জমি ও জমিতে-কাজ-করা মানুষকে ঘৃণা করে" (Planhol, ১৯৫৭, পৃ.১২৬)। প্রতিতুলনায় বাংলায় ইসলাম ধর্ম ছিল গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত কৃষিজীবী, কাঠুরে, জেলে ও মাঝিদের ধর্ম।

দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ এলাকায় অবিশ্বাসীদের ধর্মান্তরিত করার ব্যর্থতার বিপরীতে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয়ভাবে বিসদৃশ। টাইটাস উল্লেখ করেছেন যে, "... সামগ্রিকভাবে যদি ভারতের ধর্মান্তরণের কথা বিচার করা হয় তবে বলা যায়, ইসলাম লক্ষণীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। চীন ছাড়া অন্য যে সব দেশে ইসলামের সশস্ত্র বাহিনী ও ধর্ম-প্রচারকরা ঢুকেছে তার কোথাও জনগণের ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে এত কম সাফল্য অর্জিত হয়নি" (Titus, ১৯৫৯, পৃ.৭)। দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে হিন্দু-ধর্ম সফলভাবে নিজেকে রক্ষা করেছে অথচ বাংলায় ইসলামের বিপুল প্রসারকে রোধ করার ক্ষেত্রে কেন তা ব্যর্থ হল – এ প্রশ্নটি দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে একটি ধাঁধার সৃষ্টি করেছে।

বাংলায় ইসলামের প্রসারের ব্যাপারে ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজের কার্যত নীরবতা এই ধাঁধার উত্তরকে আরও জটিল করে তুলেছে। মধ্যযুগের সভাসদবৃন্দ কর্তৃক সচরাচর প্রভুদের সাফল্যের গুণ-কীর্তন করে প্রথাগত যে ঘটনাপঞ্জি লেখা হয়েছে তাতে বাংলায় ইসলামের ক্রমাগত প্রসারের বর্ণনা অবহেলিত থেকেছে। ঘটনাপঞ্জি, পীর-ফকিরদের জীবনোপাখ্যান এবং সাহিত্যকর্মে ইসলামের প্রসার সম্পর্কে শুধু বিচ্ছিন্ন কিছু উল্লেখ রয়েছে। ঐতিহাসিক উপাত্তের অপ্রতুলতার কারণে বাংলায় ইসলামের প্রসার সম্পর্কিত ইতিহাস মূলত অসম্পূর্ণ তথ্য এবং গল্প-কাহিনীর

অনুমানের ভিত্তিতে রচিত হয়। ফলে বাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে অধিকাংশ বিষয়ে মতামতের বিপুল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এক ঘরানার ঐতিহাসিকদের মতে বাংলার মুসলমানরা হচ্ছে পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত অভিবাসী মুসলমানদের বংশধর; তারা এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়ে এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। অপরদিকে, নৃতাত্ত্বিকদের বক্তব্য হচ্ছে — নরগোষ্ঠীর বিচারে বাংলার মুসলমানরা হিন্দুদের সমগোত্রীয় এবং সম্ভবত স্থানীয় ধর্মান্তরিতদের সন্তান। ইসলাম-ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার প্রণোদনার কারণ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কোনও কোনও সময় এই বিতর্কে বর্ণবাদী পক্ষপাতও দেখা যায়। বাংলায় নিম্ন-বর্ণ থেকে মুসলমানদের উদ্ভবের অনুকল্পকে বাংলার মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁদের পূর্বপুরুষদের মুখে কালিমা-লেপনের লক্ষ্যে ব্রিটিশ ও হিন্দু ঐতিহাসিকদের ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন (Rahim, ১৯৬৩, খণ্ড-১, পৃ. ৫৭)।

প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৭২ সালের আদম শুমারি বাংলায় মুসলমানদের উৎস সম্পর্কিত বিতর্কের সূত্রপাত করে। ১৮৭২ সালে পরিচালিত বাংলার প্রথম শুমারির আগে সাধারণভাবে ধরে নেয়া হত যে, বাংলায় জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক অনুপাত মোটামুটিভাবে দক্ষিণ এশিয়ার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য প্রদেশের সমরূপ — সুস্পষ্টভাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। সর্বজনবিদিত ধারণা ছিল যে, উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসকদের মতো বাংলার মুসলমানরাও "হাতে-গোনা কিছু বিদেশী" (Ali, ১৯৮৫, খণ্ড IB, পৃ. ৭৫০)। ১৮৭২ সালের শুমারির মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয় যে, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ১.৬ কোটিরও অধিক মুসলমান বাস করে। ১৮৭২ সালের শুমারির তত্ত্বাবধায়ক বেভারলি উপলব্ধি করেন যে, এত বিপুল সংখ্যক মুসলমানের উপস্থিতি বিদেশ থেকে আগত জনগোষ্ঠীর অভিবাসন দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিন্তু বাংলায় ইসলামের প্রসার সম্পর্কে কোনও প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তাই বেভারলিকে নির্ভর করতে হয় বাংলার মুসলমানদের সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক প্রমাণাদির ওপর। বেভারলির মতে মুসলমান ও নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক অবস্থান, শারীরিক গড়ন, চাল-চলন ও আচার-ব্যবহারে লক্ষণীয় মিল রয়েছে। ফলে বাংলায় ইসলামের প্রসারের কারণ হিসেবে তিনি বিপুল সংখ্যক নিম্ন-বর্ণের হিন্দুর ধর্মান্তরণকে চিহ্নিত করেন।

বেভারলির অনানুষ্ঠানিক অভিজ্ঞতাবাদ পরবর্তীকালে হার্বার্ট রিজলি পরিচালিত বিশদ ভৌত নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে সমর্থিত হয়েছে (Beverley, ১৯১৫)। দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসীদের তিনি তিনটি বৈশিষ্ট্যের বিচারে সাত ভাগে ভাগ করেন। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে — শির-সূচক (cephalic index; মাথার দৈর্ঘ্যের অনুপাতে প্রস্থের শতকরা হার), নাসিকা-সূচক (nasal index; নাকের দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থের শতকরা হার) এবং দৈহিক উচ্চতা। রিজলির মতে বাংলার মুসলমানরা মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত; এই নরগোষ্ঠী সম্ভবত দ্রাবিড় ও মঙ্গোল জাতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট; উচ্চ-বর্ণে হয়ত ইন্দো-আর্য রক্তধারার কিছু ছোঁয়া থাকতে পারে। তিনি বাংলার জনগোষ্ঠীকে চৌদ্দটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। নাসিকা-সূচকের ভিত্তিতে তিনি প্রস্তাব করেন যে, পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সাথে উচ্চ-বর্ণ — যেমন ব্রাহ্মণদের চাইতে নিম্ন-বর্ণের (যেমন, পোদ, কোচ, ও চণ্ডাল) লোকজনের মিল বেশি। ফলে রিজলি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, পূর্ব বাংলার মুসলমানরা নিম্ন-বর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

বাঙালি মুসলমানদের স্থানীয় উৎপত্তি সম্পর্কিত বেভারলি-রিজলি তত্ত্বের যথার্থতা সম্পর্কে প্রথমে প্রশ্ন তোলেন খন্দকার ফজলে রাব্বী (রাব্বী, ১৯৮৬)। তিনি নিজে অভিবাসী মুসলমান ও অভিজাত শ্রেণীর সন্তান ছিলেন: তাঁর যুক্তিসমূহকে দুভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে : ১. পরিমাপভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক জরিপের দুর্বলতা, এবং ২. বাংলায় মুসলমান অভিবাসনের ঐতিহাসিক প্রমাণ। রাব্বী রিজলির পরিমাপভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক জরিপের তিনটি দুর্বলতা তুলে ধরেন। প্রথমত, তিনি যুক্তি দেখান যে, রিজলির উপাত্ত পক্ষপাতদুষ্ট। বাংলার মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত রিজলির নমুনা ১৮৫ জন দরিদ্র মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যারা প্রায় সবাই ছিল জেলের কয়েদী। রাব্বী অভিযোগ করেন যে, রিজলি তাঁর সহকারীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন জরিপে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্যধারী মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত না করা হয়। দ্বিতীয়ত, রাব্বী দাবি করেন যে, সমস্ত মুসলমানকে একই শ্রেণীতে ফেলে রিজলি তাদের মধ্যকার পার্থক্যকে উপেক্ষা করেছেন। অপরদিকে রিজলি নিজে তের ধরনের হিন্দুর ভিন্ন ভিন্ন মাপ সংগ্রহ করে তাদের মধ্যকার পার্থক্য বিবেচনা করেছেন। তৃতীয়ত, রাব্বী যুক্তি দেখিয়েছেন, মুসলমান অভিবাসীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে; "অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে সংমিশ্রণ, আবহাওয়া, মাটি, খাদ্যভ্যাস, জীবন-যাপন পদ্ধতির প্রভাব ও সময়ের দীর্ঘ পরিসরে পেশা ও আচার-আচরণের পরিবর্তন এবং সেই সাথে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া দুঃসহ দারিদ্র-পীড়িত জীবনের কারণে ঘটেছে এই পরিবর্তন"। তিনি আরও দাবি করেছেন যে, এ সব মিশ্রণ সত্ত্বেও মুসলমান অভিবাসী আর হিন্দু বংশধরদের মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও চেহারার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

রাব্বীর যুক্তি হল ভারতে ৫৬২ বছরের অবিচ্ছিন্ন মুসলমান শাসনামলে এমন কোনও প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে না যার ভিত্তিতে বলা যায়, বাংলায় দলে দলে মানুষ হিন্দু-ধর্ম থেকে ইসলাম-ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। অপরদিকে আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, ইরান, আরব ও ভারতের দূরবর্তী অঞ্চল থেকে বাংলায় মুসলমানদের অভিবাসনের অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। বাংলায় মুসলমানদের বিদেশী উৎসের বিষয়ে তিনি দু'ধরনের পরোক্ষ প্রমাণও তুলে ধরেন। প্রথমত, দেখা যায় যে, অসংখ্য শহর, গ্রাম, বাজার, পরগণা এবং জেলা মুসলমান বসতি-স্থাপনকারীদের (settler) নামানুসারে রাখা হয়েছে। তাতে বোঝা যায়, বহু সংখ্যক মুসলমান বাহির থেকে বাংলায় এসেছিল। এই অনুকল্পের সমর্থনে বলা যায় যে, মুসলমান সুলতানরা মুসলমান অভিবাসীদের যে নিষ্কর জমি দিয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে। পরিশেষে রাব্বী দাবি করেন যে, বাঙালি মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষা ও তার উচ্চারণ বাঙালি হিন্দুদের থেকে ভিন্ন।

রিজলির পরিমাপভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক (দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণীকরণ) জরিপের দুর্বলতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে রাব্বী সফল হয়েছেন, কিন্তু সকল মুসলমানই বাহির থেকে আগত অভিবাসী এ কথা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে তিনি আদৌ সফল হননি। ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরের বিষয়টি অনুল্লেখিত থাকার কারণে আবশ্যিকভাবে ধরে নেয়া যায় না যে, ধর্মান্তরণ আদৌ ঘটেনি। মধ্যযুগের বাংলার ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ মূলত মুসলমান শাসক ও তাঁদের আমির-উমরাহর ক্রিয়া-

কাণ্ড নিয়ে রচিত হয়েছে; গণ-মানুষের জীবনকে তা পুরোপুরি অবহেলা করেছে। ফলে কোনওক্রমেই অস্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া যায় না যে, গ্রাম-বাংলায় হিন্দু-ধর্ম থেকে ধীরে ধীরে ধর্মান্তর পুরোপুরি অলক্ষিত থেকে যাবে। বাংলার বহু শহর ও গ্রামের মুসলমানি নাম শুধু এ কথা নির্দেশ করে যে, মুসলমানরা রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। এতে কোনওক্রমেই প্রমাণিত হয় না যে, মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। হিন্দু ও মুসলমানদের উপ-ভাষার ভিন্নতা বড় করে দেখার দরকার নেই। অঞ্চলভেদে উপ-ভাষার ভিন্নতা অবশ্যই একটি বাস্তবতা। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান উভয়েই যে একই উপ-ভাষায় কথা বলত তার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, অভিবাসীরাই শুধু উপ-ভাষা গড়ে তোলেনি।

অধিকাংশ মুসলমান পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত অভিবাসীদের বংশধর — এই মর্মে রাব্বীর বক্তব্যের সত্যতা অস্বীকার করে বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্যিক সূত্রসমূহ। ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীর লেখকগণ বাংলায় ইসলামি পুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। এই বাস্তবতাই আমাদের সামনে তুলে ধরে যে, তখনই যথেষ্ট সংখ্যক বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান ছিল (হক, ১৯৮৩)। ইসলাম-ধর্ম যদি শুধু অভিবাসীদের ধর্ম হত তবে দেশী-ভাষায় ইসলামি সাহিত্য রচনার দাবি উঠত না। কবি শেখ মুত্তালিবের লেখা পুস্তক *কিফায়াত-উল-মুসাল্লিন* এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। শেখ মুত্তালিব উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর গুরু মৌলভী রহমতউল্লাহ্ তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন পুস্তকটি রচনা করার। কোনও এক মাহফিলে মুসলমানরা বাংলায় একটি ধর্মীয় ব্যবহারিক পুস্তক রচনার জন্য মৌলভী রহমতউল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে, যাতে "তারা ধর্মগ্রন্থের নিয়মানুসারে তাদের কর্তব্য পালন করতে পারে" (Roy, ১৯৮৩, পৃ. ৭৬)।

রিজলির পরিমাপভিত্তিক-নৃতাত্ত্বিক (দৈহিক বৈশিষ্ট্যের শ্রেণীকরণ) জরিপের দুর্বলতা রাব্বী প্রথমে তুলে ধরেন; পরবর্তীকালে অন্যান্য সমীক্ষায়ও এই দুর্বলতা আরও জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পদ্ধতিগত এ সব ত্রুটি সত্ত্বেও রিজলির জরিপের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তকে বাতিল করা যায়নি; কারণ পরবর্তীকালে পরিচালিত সকল পরিমাপভিত্তিক-নৃতাত্ত্বিক জরিপের মাধ্যমে তা সমর্থিত হয়েছে। পি. সি. মহলানবিশ (১৯২৭) ও বি. এস. গুহ (১৯৪৪) সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, বাংলার মুসলমানরা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের স্বগোত্রীয়। ডি. এন. মজুমদার ও সি. আর. রাও ১৯৫০-এর দশকে মনুষ্যদেহের বৈশিষ্ট্য শ্রেণীকরণের একটি সুপরিকল্পিত জরিপ পরিচালনা করেছিলেন। এই সমীক্ষাটিতে বাংলার মুসলমানদের পনেরটি দলে ভাগ করা হয়। পনেরটি দলের একটিতে শুধু বাংলার উচ্চ-বর্ণধারীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে (তারা 'ঢাকার মুসলমান' বলে অভিহিত)। নয়টি মুসলমান দলের ক্ষেত্রে নিম্ন-বর্ণের দুটি দলের সমান গড় মান লক্ষ করা গেছে। পাঁচটি মুসলমান দলের সাথে বাংলার উপজাতি-দলের নিকট-সাদৃশ্য লক্ষ করা গেছে। প্রতিবেদনে উপসংহার টানা হয়েছে যে, বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার সম্ভাব্য উৎস উচ্চ-বর্ণের মধ্যে নয় বরং বাংলার অমুসলমান তফসিলি-বর্ণের লোকজনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, (১৯৬০, পৃ. ১৭)।

বাংলার মুসলমানদের গোষ্ঠীগত উৎসের ক্ষেত্রে রিজলির সিদ্ধান্ত রক্তমস্তু (Seroiogical) জরিপের দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রক্তের গ্রুপের সূচক দৈহিক বৈশিষ্ট্য শ্রেণীকরণের সূচকের চাইতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ, রক্ত-কণিকায় রক্তমস্তুগত পার্থক্য বংশানুক্রমের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়, পরিবেশের প্রভাবে তার পরিবর্তন ঘটে না। ডি. এন. মজুমদার সংগৃহীত রক্তমস্তুগত উপাত্ত ইঙ্গিত করে যে, বাংলার মুসলমানরা ভারতের বাইরের মুসলমান, এমনকি উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের থেকে নরগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে ভিন্ন। মজুমদারের মতে (১৯৬০) বাংলার মুসলমানদের রক্তের গ্রুপ বাংলার বর্ণ-বহির্ভূত হিন্দু এবং *মহিষ্যদের* অনুরূপ। উল্লিখিত মনুষ্য-গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসূচক জরিপ স্পষ্টতই তুলে ধরে যে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই স্থানীয়ভাবে-ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বংশধর এবং তা হওয়াই স্বাভাবিক।

পরিমাপভিত্তিক নৃতত্ত্বের প্রমাণপঞ্জি যদিও ইঙ্গিত করে যে, অধিকাংশ মুসলমানই নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের সাথে নরগোষ্ঠীর শ্রেণীর বিচারে সমরূপ, তবু বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান অভিবাসী যে বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিল সেই অবিসংবাদী প্রমাণ অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। বাংলার কিছু মুসলমানের জন্ম হয়েছে স্থানীয় ও অভিবাসী মানুষের সংমিশ্রণে। বিতর্কের মূল বিষয় তাই দাঁড়িয়েছে মুসলমান জনসংখ্যার কত অংশ অভিবাসী তা নির্ধারণ করা। ১৯০১ সালে এ. এ. গজনভী সাহস করে নিম্নোক্ত অনুমান ব্যক্ত করেছিলেন : "আমার ধারণা, মোটামুটিভাবে এখনকার শতকরা ২০ ভাগ মুসলমান বিদেশী অভিবাসীদের প্রত্যক্ষ বংশধর, শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমানের রয়েছে দেশী-বিদেশী মিশ্র রক্ত, আর বাকি ৩০ ভাগ সম্ভবত হিন্দু ধর্ম ও অন্য ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে — এ ধরনের সিদ্ধান্ত ভুল হবে না'' (Ali-তে উদ্ধৃত, ১৯৮৫, খণ্ড-IB, পৃ. ৭৮৮)। ১৯০১ সালের শুমারি প্রতিবেদনে প্রাপ্ত মুসলমান জনসংখ্যার উপাত্তের ভিত্তিতে গেইট্ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বিদেশী উপাদান "ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যার ছ'ভাগের এক ভাগের অধিক হওয়া সম্ভব নয়" (Gait, ১৯০২, পৃ. ১২৫)। আলীর অভিমত হচ্ছে বাংলায় অভিবাসী মুসলমানের সংখ্যা স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের চাইতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি" (Gait, ১৯৮৫, খন্ড-IB, পৃ. ৭৮৭)। বাংলায় অভিবাসী মুসলমান জনসংখ্যার পরিমাণ নির্ণয়ের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন রহিম (১৯৬৩)। তাঁর মতে ১৫৭০ সালে বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ২৭ লাখ; এর মধ্যে ১৯ লাখ ছিল স্থানীয়, বাকি ৮ লাখ অভিবাসী। রহিমের হিসাব মতে ১৭৭০ সালে বাংলায় মোট মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১.০৬ কোটি; তার মধ্যে ৩২.৭ লক্ষ ছিল অভিবাসী মুসলমান।

রহিম-এর হিসাব দু'টি সরল ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বাংলায় মুসলমান অভিবাসন সম্পর্কে রহিম কিছু অনুমান গড়ে তুলেছিলেন। তিনি হিসাব করে বের করেন যে, ১২২০ এবং ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ৩,৩৭,০০০ মুসলমান সৈন্য বাংলায় এসেছিল। তিনি ধরে নিয়েছিলেন আগত সৈন্যরা ফেরত যায়নি। এই অনুমান বাস্তবসম্মত নয় (Karim, ১৯৮৫, পৃ. ১৯৫)। মুসলমান শাসনামলে বাংলা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য কুখ্যাত ছিল। উপরন্তু অভিবাসী মুসলমানরা শহরে

থাকতে ভালবাসত। ফলে, দখলদার সৈন্যদলের সকল সদস্য গ্রামীণ বাংলায় বসতি স্থাপন করবে এটি বাস্তবসম্মত নয়। এ সব কারণে মুসলমান অভিবাসীদের ব্যাপারে তাঁর হিসাব বাস্তবের চেয়ে বেশি হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, ১৮৭২ সাল পরবর্তী শুমারির উপাত্তে দেখা যায় যে, বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দুর চাইতে অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ভিত্তিতে তিনি ধরে নিয়েছেন যে, প্রতি একশ' বছরে মুসলমান জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে এবং প্রতি শতাব্দীতে হিন্দু জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৬০ ভাগ।

রহিম-এর হিসাবে দু'টি উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা রয়েছে। রহিম বলেছেন যে, ১২২০ হতে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে যে ৩,৩৭,০০০ জন সৈন্য বাংলায় এসেছিল তাঁদের বংশধরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩২,৭১,৫০০-তে দাঁড়িয়েছিল। এই বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে মুসলমানদের সন্তান উৎপাদনের অধিক ক্ষমতা। এ যুক্তি যদি সত্যি হত তবে দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যান্য অঞ্চল — যেখানে অধিকাংশ মুসলমান অভিবাসী বসতি স্থাপন করেছিল — যেমন দিল্লি ও আগ্রায় মুসলমানরাই জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হত।

সারণি-৮ হতে দেখা যাবে যে, ১৮৮১-১৯৪১ সালের পরিসরে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি-হার ছিল বাৎসরিক শতকরা ১.০৬, আর বাংলার মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ হার ছিল শতকরা ১.০১। এই উপাত্ত ইঙ্গিত করে যে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশে অভিবাসী মুসলমানদের সংখ্যা বাংলার চাইতে দ্রুত হারে বেড়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে — মুসলমান রাজনৈতিক ক্ষমতার বলয়ে মুসলমানরা অনুল্লেখ্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে বিদ্যমান ছিল। স্পষ্টতই তা প্রমাণ করে যে, বাংলায় অভিবাসী মুসলমানদের বৃদ্ধি হারের ব্যাপারে রহিমের ধারণা বহুলভাবে অতিরঞ্জিত।

দ্বিতীয়ত, রহিম ধরে নিয়েছিলেন যে, ১৫৭০ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত মুসলমান জনসংখ্যা প্রতিবছর শতকরা ১ ভাগ ও হিন্দু জনসংখ্যা শতকরা ০.৬ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই ধারণা জনসংখ্যাতত্ত্বের প্রচলিত মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জনসংখ্যার পরিবর্তনের তত্ত্বানুসারে প্রাক্-শিল্প সমাজে জনসংখ্যা ছিল স্থির, কারণ এ ধরনের সমাজে উচ্চ জন্ম-হার উচ্চ মৃত্যু-হারের মাধ্যমে জনসংখ্যা স্থির থাকত। জনসংখ্যার ক্ষেত্রে উঠতি-পড়তি লক্ষ করা যেত, কিন্তু তা অব্যাহত বৃদ্ধির কোনও লক্ষণ প্রদর্শন করত না। সাধারণ প্রবণতাটি ছিল এমন — কিছুকাল অনুক্রমিক সংখ্যাবৃদ্ধি এবং অকস্মাৎ তার পতন। ফলে এটি ধরে নেয়াই স্বাভাবিক যে, ব্রিটিশ-পূর্ব বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা স্থির ছিল। মুসলমান জনসংখ্যার ক্ষেত্রে রহিম-এর প্রাক্কলন বিপুলভাবে অতিরঞ্জিত। পুরো মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে অভিবাসীদের সংখ্যা শতকরা ১০-এর কম হওয়াই স্বাভাবিক।

পূর্বোক্ত আলোচনা স্পষ্টতই তুলে ধরে যে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমানের উৎস এ দেশেই। তবে স্থানীয় হিন্দুরা কেন ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করা কঠিন। পৃথিবীর কোথাও বিদেশী ধর্মের প্রতি বিরোধিতা দক্ষিণ এশিয়ার মতো এত তীব্র নয়। আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনে হলেও সত্যি যে, দক্ষিণ এশিয়ার হিন্দুরা খুব সহজেই বিদেশী মুসলমান শাসকদের রাজনৈতিক আধিপত্য মেনে নিয়েছে কিন্তু তার

ধর্মীয় পরিমণ্ডলে যে কোনও অনুপ্রবেশকে ঐকান্তিকতার সাথে প্রতিহত করেছে। উইল ডুরান্ট ভারতে ধর্মের এই প্রাধান্যের জন্য জন্মান্তর সম্পর্কে বিশ্বাসকে দায়ি করেছেন। ডুরান্ট লিখেছেন, "হিন্দুরা একের 'ার এক বিদেশী সরকারকে তাদের ওপর আধিপত্য করার সুযোগ দিয়েছে; অংশত এর কারণ হচ্ছে — দেশী না বিদেশী কে তাদের শাসন বা শোষণ করছে সে ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন ছিল না; তাদের কাছে রাজনীতি নয় বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ধর্ম; —দেহ নয়, আত্মা, বর্তমানের জীবন নয়, পরবর্তী অনন্ত জীবন ছিল তাদের আরাধ্য" (Will Durant, ১৯৬৩, পৃ. ৫০৩)। আপাতদৃষ্টিতে উপমহাদেশের বাকি অংশ থেকে বাংলাকে আলাদা করে চিহ্নিত করার কিছু নেই। ফলে এখানে ইসলামের তুলনামূলক সাফল্যের পেছনে বোধগম্য কোনও ব্যাখ্যা মেলে না। বাংলার লোকজন কেন ভারতের অন্যান্য জায়গার লোকজনের চাইতে অধিকতর পরিমাণে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বিদ্যমান বিশ্লেষণে বাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্যের ক্ষেত্রে চার ধরনের অনুকল্প চিহ্নিত করা যায় :

- মুসলমান শাসকদের হস্তক্ষেপ।
- ব্রাহ্মণ্যবাদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া।
- হিন্দু নিপীড়নের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের প্রতিক্রিয়া।
- মুসলমান পীরদের ধর্ম প্রচার।

বাংলায় ইসলামের প্রসারের ক্ষেত্রে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চলক (variable) হিসেবে কাজ করেছে — এ ধরনের অনুকল্পের সমর্থনে দু'টি যুক্তি তুলে ধরা যেতে পারে। প্রথমত, প্রাক্-মুসলমান যুগে যদিও ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরের বিচ্ছিন্ন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় তবু বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইসলাম-ধর্মে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধর্মান্তর ঘটেনি। ফলে সিদ্ধান্ত করা চলে, বাংলায় মুসলমান শাসকগণ সক্রিয়ভাবে ধর্মান্তরকে উৎসাহিত করেছিলেন।

সারণি - ৮

বাংলা ও ভারতে সম্প্রদায়ভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনা, ১৮৯১-১৯৪১

সম্প্রদায়	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৮৮১ হতে ১৯৪১ সালের পরিসরে বৃদ্ধিহার (প্রতি বছরে শতকরা হার)
ভারতের হিন্দু (সংখ্যা, মিলিয়নে)	১৮৭.৮৪	২০৭.৫৬	২০৬.৮৬	২১৭.১৯	২১৬.২৪	২৩৮.৬	২৭০.১৮	০.৬০
পুরো জনসংখ্যার শতকরা হার	৭৫.০৯	৭৪.২৪	৭২.৮৭	৭১.৬৮	৭০.৭৩	৭০.৬৭	৬৯.৪৬	-
বাংলার হিন্দু (সংখ্যা, মিলিয়নে)	১৭.২৫	১৮.০৬	১৯.৮১	২০.৫৭	২০.৪১	২১.৭৯	২৫.৩১	০.৬৩
পুরো জনসংখ্যার শতকরা হার	৪৮.৪০	৪৭.২০	৪৭.০০	৪৫.২৩	৪৩.৭২	৪৩.৪৮	৪১.৯৮	-
ভারতের মুসলমান (সংখ্যা, মিলিয়নে)	৪৯.৯৫	৫৭.০৬	৬২.১১	৬৭.৮৩	৭১.০০	৭৯.৩০	৯৪.৪৪	১.০৬
পুরো জনসংখ্যার শতকরা হার	১৯.৯৭	২০.৪১	২১.৮৮	২২.৩৯	২৩.২৩	২৩.৪৯	২৪.২৮	-
বাংলার মুসলমান (সংখ্যা, মিলিয়নে)	১৭.৮৬	১৯.৫৮	২১.৫৭	২৩.৮১	২৫.০০	২৭.২৮	৩২.৭৪	১.০১
পুরো জনসংখ্যার শতকরা হার	৫০.১৬	৫১.১৫	৫১.১৯	৫২.৩৪	৫৩.৫৫	৫৪.৪৪	৫৪.৩০	-
ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায় (সংখ্যা, মিলিয়নে)	১২.৩৪	১৪.৯৪	১৪.৮৮	১৭.৯৭	১৮.৪৭	১৯.৭৪	২৪.৩৬	০.৭৮
পুরো জনসংখ্যার শতকরা হার	৪.৯৪	৫.৩৫	৫.২৫	৫.৯৩	৬.০৪	৫.৮৪	৬.২৬	-
বাংলার অন্যান্য সম্প্রদায় (সংখ্যা, মিলিয়নে)	০.৪৯	০.৬২	০.৭৬	১.১০	১.২৭	১.০৪	২.২৪	০.৭৩
পুরো জনসংখ্যার শতকরা হার	১.৪৪	১.৫৫	১.৮১	২.৪৩	২.৭৩	২.০৮	৩.৭২	
ভারতে পূর্ণ জনসংখ্যা (সংখ্যা, মিলিয়নে)	২৫০.১৫	২৭৯.৫৭	২৮৩.৮৬	৩০৩.০০	৩০৫.৭২	৩৩৭.৬৭	৩৮৮.৯৯	০.৭৩
বাংলার পূর্ণ জনসংখ্যা (সংখ্যা, মিলিয়নে)	৩৫.৬০	৩৮.২৭	৪২.১৪	৪৫.৪৯	৪৬.৭০	৫০.১১	৬০.৩০	০.৭৮

সূত্র : ১. Davis, Kingsley, The Population of India and Pakistan (New York: Russel and Ressel, ১৯৬৮), পৃ. ১৭৯।

২. Dutch, R.A., Census of India, ১৯৪১, খণ্ড এট (দিল্লি: ম্যানেজার পাবলিকেশনস, ১৯৪১), পৃ. ৪৮-৪৯।

টীকা : বাংলার উপাত্তে শুধু ব্রিটিশ শাসনাধীন এলাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; বাংলার রাজ্যসমূহ তাতে বাদ পড়েছে।

পর্তুগীজ বণিক বারবুসা-র বিবরণের মাধ্যমে এ অনুকল্প সমর্থিত হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীতে "রাজা ও গভর্নরদের আনুকূল্য পাবার জন্য বাংলার হিন্দুরা মুসলমান হয়েছে" (মুখোপাধ্যায়, ১৯৮০, পৃ. ৩৪৬)। দ্বিতীয়ত, কোনও কোনও ঐতিহাসিক যুক্তি দেখিয়েছেন যে, "নবীর ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের

মুসলমান শাসক এবং গোঁড়া ইসলামি-আইনবিদ কর্তৃক কোনও কোনও ধরনের শক্তির ব্যবহার সর্বদাই যথাযথ ও বৈধ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে" (Titus, ১৯৫৯, পৃ. ৩)। ফলে ধারণা করা হয়, বাংলার মুসলমান শাসকগণ বাংলার কাফের প্রজাদের ধর্মান্তরিত করার জন্য 'শক্তি ও তরবারি' নীতি অনুসরণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বেভারলী উল্লেখ করেছেন যে, "কোরানের বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে মুসলমানরা দেশ জয়ে যেমন সদাপ্রস্তুত ছিল, তেমনি প্রস্তুত ছিল তরবারি হাতে। বলা হয়ে থাকে, সুলতান জালালউদ্দিনের (জাদু) শাসনামলে তার অত্যাচারে হিন্দুরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে" (Beverley, ১৮৭২, পৃ. ১৩২)। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বাংলায় মুসলমান শাসন ইসলামের প্রসারকে সহজ করেছে। তবে এই প্রক্রিয়ায় তা কোনও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল কি না তা নিয়ে প্রশ্ন করা চলে। আবির্ভাবের ছ'শ বছর পর ইসলাম বাংলাদেশে আসে; তত দিনে ধর্মান্তরণের ক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের তীব্র উদ্দীপনা বাস্তব রাজনৈতিক প্রয়োজনের বিবেচনায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। ইসলামের ধ্রুপদী বিশ্বাস অনুসারে কাফেরদের ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকদের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে সে সম্পর্কে দক্ষিণ এশিয়াতে প্রচলিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হতে এ অনুমানটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ট্রটস্কীবাদের মতো ইসলামের ধ্রুপদী ধর্মীয় আইন নির্দেশ দেয় যে, যতদিন না সারা বিশ্ব ইসলামের আওতায় আসবে ততদিন *জিহাদ* (ধর্মযুদ্ধ) করা মুসলমান শাসকদের জন্য অবশ্য-কর্তব্য। পৃথিবী দুই শিবিরে বিভক্ত: *দারুল ইসলাম* (শান্তির দেশ), আর *দারুল হারব* (যুদ্ধের দেশ)। মুসলমান শাসকদের প্রতি ধর্মের নির্দেশ হল *দারুল হারব-কে দারুল ইসলাম*-এ রূপান্তরিত করতে হবে। যদি কাফেররা মুসলমান শাসন মেনে নেয়, যদি তারা জিম্মি হয় এবং *জিজিয়া* ও *খরজ* পরিশোধ করে তবেই জিহাদ স্থগিত রাখা যায়। তবে কাফেরদের সাথে এ ধরনের আপোষ-রফা সর্বক্ষেত্রে অনুমোদন করা হয় না। ধ্রুপদী বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা অনুসারে জিম্মি হিসাবে শুধু তাদেরকেই গণ্য করা যায় যাদের ধর্মগ্রন্থ ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত (*আহলুল কিতাব*)। যথাযথভাবে বললে এ ধরনের সুযোগ হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; ইসলামি আইনে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ স্বীকৃত নয়। হিন্দুদের মতো পৌত্তলিকদের সামনে দু'টিই মাত্র পথ খোলা — ইসলাম ধর্ম গ্রহণ বা মৃত্যুবরণ। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানরা যখন সিন্ধু অধিকার করে তখন বিতর্ক দেখা দেয় — একটি মুসলমান রাষ্ট্রে হিন্দু-ধর্মের সাথে সহাবস্থান করা বৈধ কি না। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, হিন্দুরা তাদের ধর্ম-কর্ম চালিয়ে যেতে পারে এবং প্রজা হিসেবে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে যদি তারা মুসলমান শাসন মেনে নেয় এবং *জিজিয়া* ও অন্যান্য কর পরিশোধ করে (Titus, ১৯৫৯)। তাতে বোঝা যায় যে, বাংলায় ইসলামের আগমনের বহু পূর্বেই ধর্মান্তরণের ধ্রুপদী নির্দেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমজোর হতে দেখা যায়।

অনুকল্প গড়ে তোলা হয়েছে যে, ইসলামের প্রসারে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে; দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় মুসলমান জনসংখ্যার তুলনামূলক হার সুস্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত দেয় যে, এ অনুমান সমর্থনযোগ্য নয়। এই অনুকল্প যদি সত্য হত তবে মুসলমান শাসনের কেন্দ্রে ও তার আশে-পাশে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ করা যেত। দিল্লি অঞ্চলে মুসলমানরা নগণ্য ও সংখ্যালঘু; মুসলমানরা ছ'শ' বছরেরও অধিককাল এ অঞ্চল শাসন করেছে। তাতে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়নি। বাংলায়ও মুসলমান-শক্তির অধিষ্ঠানস্থল হতে দূরবর্তী অঞ্চলে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত ছিল অধিক। মুসলমান শাসকদের রাজধানী-এলাকা — মালদহ, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমান জনসংখ্যার চাইতে দূরবর্তী জেলা —

বগুড়া, নোয়াখালী জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি (সারণি ৯ দেখুন)।

বাংলায় হিন্দুদের ওপর মুসলমান শাসকদের নিপীড়নমূলক ক্ষমতা দু'কারণে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথমত, বাংলার মুসলমান শাসকদের অনেকেই দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য তাদেরকে স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থন আদায় করতে হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ,

সারণি - ৯

বাংলায় জেলাওয়ারী বিভিন্ন ধর্মানুসারী জনসংখ্যা, ১৮৮১

অঞ্চল/জেলা	মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা হার	মোট জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হার	অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের শতকরা হার (বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, উপজাতি ও অন্যান্য)
বর্ধমান	১৮.৯	৮০.৫	০.৬
বীরভূম	২০.৫	৭৭.৭	১.৮
বাঁকুড়া	৪.৪	৮৭.৪	৮.২
মেদিনীপুর	৬.৫	৮৮.৮	৪.৭
হুগলি	১৯.৪	৮০.৫	০.১
চব্বিশ পরগনা	৩৭.৩	৬২.০	০.৭
কলকাতা	৩১.৮	৬২.৮	৫.৬
নদীয়া	৫৫.৭	৪২.৮	১.৫
মুর্শিদাবাদ	৪৮.১	৫১.৭	০.২
যশোহর	৬০.৩	৩৯.৬	০.১
খুলনা	৫১.৪	৪৮.৪	০.২
রাজশাহী	৭৮.৪	২১.৫	০.১
দিনাজপুর	৫২.৫	৪৭.৩	০.২
জলপাইগুড়ি	৩৫.৮	৬৩.২	১.০
দার্জিলিং	৫.৩	৮১.৭	১৩.২
রংপুর	৬০.৯	৩৮.৯	০.২
বগুড়া	৮০.৮	১৯.১	০
পাবনা	৭২.৪	২৭.৫	০.৪
মালদহ	৪৬.৩	৫৩.৩	০.৪
কোচবিহার রাজ্য	২৮.৯	৭০.৯	০.২
ঢাকা	৫৯.১	৪০.৪	০.৫
ময়মনসিংহ	৬৬.৮	৩২.৩	০.৯
ফরিদপুর	৫৯.৭	৪০.১	০.২
বাখেরগঞ্জ	৬৬.৬	৩২.৮	০.৬
ত্রিপুরা	৬৬.৩	৩৩.৬	০.১
নোয়াখালী	৭৪.১	২৫.৭	০.২
চট্টগ্রাম	৭০.৮	২৪.৩	৪.৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৭.১	১৯.৯	৭৩.২
ত্রিপুরা রাজ্য	২৮.১	১০.২	৬১.৭
বাংলা	৪৯.৬	৪৮.৮	১.৬

সূত্র : Census of India, ১৯৩১, vol-V, Part-I, পৃ. ৪১১।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সুলতান ইলিয়াস শাহ-কে (১৩৩৯-১৩৫৮ খ্রি.) তার সেনাদলে হিন্দু সৈন্য নিযুক্ত করতে হয়েছিল। শাহদেব নামের একজন হিন্দু সেনাপতিকেও তিনি সৈন্যদলে নিযুক্ত করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলায় একজন হিন্দু সভাসদ – গনেশ (কানস) মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে সফল অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায়, হিন্দু বেসামরিক আমলা এবং সামরিক নেতৃবৃন্দ মুসলমান বাংলায় অব্যাহতভাবে ক্ষমতাবান ছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলায় মুসলমান শাসনামলে হিন্দুরা স্থানীয় প্রশাসনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ক্ষমতা প্রয়োগ করত। মুসলমান শাসনের তিনশ' বছর পরও যশোরের প্রতাপাদিত্য, বরিশালের কন্দর্প নারায়ণ, নোয়াখালীর লক্ষণ মানিক্য, বিক্রমপুরের কেদার রায়, পাবনার মধু রায়, মানিকগঞ্জের বিনোদ রায় এবং বরিশালের রাম চন্দ্রের মতো শক্তিধর হিন্দু জমিদাররা গ্রাম-বাংলার ওপর কর্তৃত্ব করত।

রাজনৈতিক দিক থেকে হিন্দু-মুসলমানদের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা বাংলার মুসলমান শাসকদের জন্য অত্যন্ত জরুরি ও কাম্য ছিল। সে কারণে মুসলমান শাসকরা সচেতনভাবে হিন্দুদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করত। বর্ণ-হিন্দুরা ধর্মীয় গ্রন্থাদির অনুবাদকে নিরুৎসাহিত করলেও মুসলমান শাসকরা *মহাভারত, রামায়ন* ও *ভগবত গীতা*-র অনুবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৫-১৪৩৪ খ্রি.) বা রুকনউদ্দিন বারবাক শাহ-এর (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) পৃষ্ঠপোষকতায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃত্তিবাস রামায়ণ অনুবাদ করেন। সুলতান নুসরাত শাহ (১৫২০-১৫৩৮ খ্রি.) এবং একজন মুসলমান সামন্ত পৃথক-পৃথকভাবে *মহাভারত* অনুবাদের জন্য পণ্ডিত নিয়োগ করেন। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রি.) *ভগবত গীতা*-কে বাংলায় রূপান্তরের জন্য মালাধর বসুকে নিয়োগ করেন। তিনিই *শ্রীকৃষ্ণ বিজয়*-এর রচয়িতা। অভিযোগ করা হয়, সুলতান জালালউদ্দিন হিন্দুদের হত্যা ও নিপীড়ন-নির্যাতন করেছিলেন। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, তিনি হিন্দু ধর্মীয় পণ্ডিত বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পর্তুগীজ বণিক বারবুসা ধারণা করেছিলেন, ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দুরা রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় ইসলাম-ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল; কিন্তু আদতে স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের প্রতি রাজকীয় দান-দক্ষিণার উদাহরণ বিরল। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ থেকে প্রমাণ মেলে যে, বাংলায় মোগল শাসকগণ ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের উদ্যোগের প্রতি পুরোপুরি উদাসীন ছিলেন। মির্জা নাথান উল্লেখ করেছেন যে, একবার মোগল সুবেদার ইসলাম খান (১৭শ শতাব্দী) হিন্দুদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য তাঁর কর্মচারিদের শাস্তি প্রদান করেছিলেন। অগাষ্টিনীয় ধর্ম-প্রচারক মানরিক ১৬৪০ সালে ঢাকা পরিভ্রমণ করেছিলেন; তিনি লিখেছেন, খ্রিষ্টান ধর্ম-প্রচারকগণ শুকরের মাংস ও মদ খেয়ে ইসলামি আইন অগ্রাহ্য করলে মোল্লারা অভিযোগ রুজু করে। কিন্তু মোগল সম্রাট শাহজাহান খ্রিষ্টান ধর্ম-প্রচারকদের শাস্তি প্রদান করেননি। সত্যিকার অর্থে, বাংলায় মুসলমান শাসনের ফলে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরাই লাভবান হয়েছে বেশি। মুসলমান-শাসিত বাংলায় রাজনৈতিক ও সামরিক পদসমূহে পশ্চিম এশীয় অভিবাসীদের একাধিপত্য ছিল; অন্যদিকে রাজস্ব কাঠামোর পদসমূহ অধিকার করে ছিল হিন্দুরা; বিশেষত,

হিন্দুদের একটি উপবর্ণ — কায়স্থরা যারা সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। রাজস্ব-কর্মে তাদেরকে নির্বাচন করার মূল বিবেচনা ছিল তাদের অভিজ্ঞতা। তারা ছিল অত্যন্ত অনুগত। শুধু স্থানীয় নব-দীক্ষিত লোকজনকে পৃষ্ঠপোষকতা দানের জন্য মুসলমান শাসকগণ তাদের রাজস্ব প্রশাসনে কোনও অব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করতে চাননি। পরিণামে, মুসলমান শাসনামলে হিন্দু রাজস্ব-আদায়কারী কর্মচারিরা স্থানীয়ভাবে-ধর্মান্তরিত মুসলমানদের শোষণ করেছে। এটি স্পষ্ট ইঙ্গিত করে যে, ইসলাম-ধর্মে ধর্মান্তরকে উৎসাহিত করার জন্য কোনও সুপরিকল্পিত নীতিমালা ছিল না। বাংলার বর্ণ-নিয়ন্ত্রিত সমাজে স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা ধর্মান্তরের পরও তাদের পুরোনো পেশায় নিয়োজিত থাকত। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরামের বর্ণনা থেকে জানা যায় বাংলার মুসলমানরা তুচ্ছ ও নিচু মানের পেশায় নিয়োজিত ছিল -- তাদের মধ্যে গোয়ালা, জোলা, মুকেরী, পিতারি, কাবারি, ভিখারি, রংরেজ, দরজি, কসাই, হাজাম এবং কলন্দর অন্যতম (Karim, ১৯৮৫, পৃ. ২০৪-২০৫)। ফলে, মধ্যযুগের বাংলায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর উল্লেখযোগ্য কোনও অর্থনৈতিক লাভ বয়ে আনেনি।

দ্বিতীয় অনুকল্পে অনুমান করা হয়েছে যে, বাংলায় ইসলামের প্রসার হচ্ছে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। ধরে নেয়া হয়, হিন্দুদের অনন্য বর্ণপ্রথা "বাংলার প্রায়-উভচর (semi-amphibious) আদিবাসীদেরকে প্রভুগোষ্ঠীর সেবার উদ্দেশ্যে কাঠুরে আর পানিবাহকে পরিণত করেছিল; এই প্রভুদের দৃষ্টিতে তারা ছিল নোংরা পশু, ঘৃণিত জীব মাত্র" (Beverley, ১৮৭২)। যুক্তি দেখানো হয় যে, এক অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিত জনগোষ্ঠীর সামনে ইসলাম তুলে ধরেছিল ঈশ্বরের একত্ব ও মানুষের সাম্যের ধারণা; এরই ফলে নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণে প্রণোদিত হয়েছিল (Arnold, ১৯১৩)।

দু'ধরনের বিপরীতধর্মী পরিপ্রেক্ষিত থেকে এই অনুকল্পের সমালোচনা করা যায়। প্রথমত, যুক্তি দেখানো হয়, মধ্যযুগের বাংলায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে শোষণের ধারণার অস্তিত্ব ছিল না। প্রাক্-আধুনিক যুগে উচ্চ বর্ণের হিন্দু কর্তৃক নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের শোষণকে শোষণ হিসেবে দেখা হত না; বরং মনে করা হত এটি প্রাকৃতিক নিয়ম-রীতিরই অংশ। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের ধারণা য়ুরোপের আলোক সম্পাতের (Enlightenment)-এর ফসল। ফলে এই অনুকল্পকে ইটনের বর্ণনানুসারে "উল্টো দিক থেকে ইতিহাস পাঠ" বলা চলে (Eaton, ১৯৯৪, পৃ. ১১৭)। দ্বিতীয়ত, লক্ষ করা গেছে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশে উচ্চ বর্ণ কর্তৃক শোষণের ধারণা বিদ্যমান অস্তিত্বে থাকলেও বাংলায় তার অস্তিত্ব ছিল না। বাংলায় সমাজে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব এত দুর্বল ছিল যে, তাদের পক্ষে শোষণ চালানো সম্ভব ছিল না। বাংলায় অনেক ব্রাহ্মণ নিজেদেরকে ভেজাল ও দো-আশলা মনে করত। কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যে, ব্রাহ্মণদের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য আদিশূরকে কণৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আমদানি করতে হয়েছিল, (মজুমদার, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯৪-১৯৫)। কোষ্ঠী-তালিকার সাহিত্য হতে এ-ও জানা যায় যে, সেন রাজা — বল্লাল সেন ও বর্মণ রাজা — শ্যামল বর্মা তখনকার ব্রাহ্মণদের বাংলার বাইরের অঞ্চল থেকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। হলায়ুধ (১২শ শতাব্দী) উল্লেখ করেছেন যে, স্থানীয়

ব্রাহ্মণরা বৈদিক ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনায় সুশিক্ষিত ছিল না। বাংলার স্থানীয় ব্রাহ্মণরা প্রধানত দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : *শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ* ও *বর্ণ ব্রাহ্মণ*। *শ্রোত্রিয়* ব্রাহ্মণরা *বর্ণ* ব্রাহ্মণদের অস্পৃশ্য মনে করত এবং তাদের হাতের জল স্পর্শ করত না। *বর্ণ* ব্রাহ্মণদের নিজেদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন ক্রমবিন্যাস ছিল। চাষী কৈবর্তদের পুজো-আচ্চা করে যে সব বৈদিক ব্রাহ্মণ তারা পদমর্যাদায় এত নিচে যে, তাদের যজমানরাই তাদের বাড়িতে খাদ্য গ্রহণ করে না। *অগ্রদানী* ব্রাহ্মণরা মৃতের সৎকার করে এবং মৃতের অর্ঘ্য গ্রহণ করে; তাঁদেরকে দূষিত মনে করা হয়। *গ্রহ-বিপ্র বা আচার্য* যারা গণক, হস্তরেখাবিদ, কোষ্ঠী-লেখক হিসেবে কাজ করত তাদেরকে ভেজাল ব্রাহ্মণ মনে করা হত। *ভট্ট* ব্রাহ্মণরা ধনী লোকদের গুণ-কীর্তন করে জীবিকা নির্বাহ করত; তারা ছিল মিশ্র বিবাহজাত সন্তান; তাদেরকে *পতিত* বলে গণ্য করা হত। রিজলীর মতে, বাংলার বর্ণ ব্রাহ্মণরা আর্য ছিল না, "স্থানীয় দেব-দেবীর গোষ্ঠী-পুরোহিতকে ব্রাহ্মণ পদবী প্রদান করে স্থানীয়ভাবে একটি সহজ পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছিল এ রকম অনেক ব্রাহ্মণ" (Risley, ১৯১৫, পৃ. ৩৩)। বাংলায় অনেক ব্রাহ্মণ নিজেরাই নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের মতো নিপীড়িত ছিল। ফলে এটি মেনে নেয়া কঠিন যে, বাংলায় ব্রাহ্মণদের অত্যাচার নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের ইসলাম ধর্মের দিকে ঠেলে দেয়।

নিচু বর্ণের ধর্মান্তরের অনুকল্প মধ্যযুগের বাংলায় ইসলামের সাম্য ধারণাকেও অতিরঞ্জিত করে। তাত্ত্বিকভাবে ইসলামের সকল অনুসারীরাই আল্লাহ ও তার নবীর চোখে সমান। তবে বাংলায় মুসলমানরা নিজেরাই হিন্দু বর্ণ প্রথা দ্বারা সংক্রমিত হয়েছিল। বাংলায় মুসলমানদের দুটি প্রধান সামাজিক ভাগ ছিল :'আশরাফ' ও 'আজিলাফ'; বাংলায় বিকৃত হয়ে 'আজলাফ' 'আতরাফ'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায়, বাংলায় উচ্চ বর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত লোকজনকে বিদেশীদের-সন্দেহাতীত-বংশধরের সমকক্ষ বলে ধরে নেয়া হত এবং 'আশরাফ' বা সম্ভ্রান্ত বলে গণ্য করা হত। পেশাজীবীসহ নিচু শ্রেণী থেকে ধর্মান্তরিত অন্য সকল মুসলমানদের অবজ্ঞাপূর্ণ ভাষায় 'আজলাফ', 'জঘন্য' বা 'ছোটলোক' বলে অভিহিত করা হত। তাদেরকে 'কামিনা' বা 'ইতর' বা রাজেল-ও (রিজাল-এর বিকৃত রূপ, যার অর্থ অকর্মণ্য) বলা হত (Gait, ১৯০২, পৃ. ৪৩৯)। ফলে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আপনাআপনি ভ্রাতৃত্বের সাম্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েনি। ধর্মান্তরের কারণে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এমনকি তাদের সামাজিক মর্যাদাও উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়নি। বাস্তবিকপক্ষে, মুসলমান-বাংলায় নিম্নতম বর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়েছে। গেইট উল্লেখ করেছেন যে, "কোনও কোনও ক্ষেত্রে তৃতীয় একটি শ্রেণী – আরজল বা 'সর্বনিম্ন শ্রেণী' এতে যুক্ত করা হয়।" সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর লোকজন – যেমন, হালালখোর, লালবেগী, আবদাল ও বেদেরা এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের সাথে অন্য মুসলমানরা কোনও সম্পর্ক রাখত না; মসজিদে ঢোকা বারণ ছিল তাদের; সর্বসাধারণের কবরস্থানও তারা ব্যবহার করতে পারত না (Gait, ১৯০২)। এ ধরনের বৈষম্যের কারণে এবং মুসলমানদের আদত আচরণ দেখে নিচু বর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হতে নিরুৎসাহিত বোধ করবে – এটিই স্বাভাবিক।

পরিশেষে বলা যায়, ব্রাহ্মণদের অত্যাচার কোনওক্রমেই বাংলার ক্ষেত্রে অনন্য নয়। দক্ষিণ এশিয়ার প্রবাদে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণরা উপমহাদেশের সর্বত্রই সমভাবে ঘৃণিত। ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা "দেখতে সাধু কিন্তু অন্তরে কসাই।" নিম্নোক্ত প্রবাদটি ব্রাহ্মণদের প্রতি ঘৃণার প্রমাণ দেয় : "ইস দুনিয়া মে তিন কসাই/পিশু, খাটমল, ব্রাহ্মণ ভাই" (এই দুনিয়ায় আছে তিন ধরনের রক্ত-চোষা — মশা, ছারপোকা আর ব্রাহ্মণ ভাই) (Risley, ১৯১৫, পৃ. ১৩১)। বাস্তবে বাংলাকে জঘন্যতম ধরনের ব্রাহ্মণ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশে এ ধরনের অত্যাচার ছিল আরও তীব্র। উদাহরণস্বরূপ, মাদ্রাজের কথা তুলে ধরা যায়; সেখানে ধরে নেয়া হয় যে, একজন নিম্ন বর্ণের অচ্ছুৎ যদি উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণের ষাট ফুটের মধ্যে ঢুকে যায় তবে তাকে অপবিত্র করা হয়। দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও এলাকায় "ব্রাহ্মণদের আসতে দেখলে" শূদ্রদের রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়, অথবা মধ্যযুগে য়ুরোপে কুষ্ঠরোগীদেরকে যেমন বিশেষ এক ধরনের শব্দ করে তাদের আগমনের সংবাদ দিতে হত তেমনি শব্দ করে চলতে হয় (Risley, ১৯১৫)। এ ধরনের বৈষম্যের অস্তিত্ব বাংলায় ছিল না। নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতি ব্রাহ্মণ্যবাদী অত্যাচারের বিপরীতে ইসলামি সাম্যবাদ যদি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরের প্রধান আকর্ষণ হত, তাহলে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে ইসলামের প্রসার অধিকতর লক্ষণীয় হত।

বাংলায় হিন্দু শাসকদের অত্যাচারের কারণে বৌদ্ধদের গণ-ধর্মান্তরকে কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিক মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণ বলে চিহ্নিত করেন। পূর্ব বাংলায় বাস্তবতার সূত্রে টাইটাস উল্লেখ করেছেন যে, "এখানকার অধিবাসীরা স্থূল প্রকৃতির বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবাধীন ছিল; শক্তিদর্পী আর্য শাসকরা তাদের ঘৃণা করত, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত; স্বভাবতই মনে করা হয় যে, তারা সানন্দে মুসলমান ধর্ম-প্রচারকদের স্বাগত জানিয়েছিল" (Titus, ১৯৫৯, পৃ. ৪৫)। অন্য একজন ঐতিহাসিক মত পোষণ করেন যে, "হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে শত্রুতার কারণে হয়ত তাদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর ত্বরান্বিত হয়েছিল" (Mitra, ১৯৫৪, পৃ. ৮২)।

তবে, বৌদ্ধদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরের কোনও প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অবশ্য হিন্দুদের দ্বারা বৌদ্ধদের অত্যাচারের পরোক্ষ প্রমাণ মেলে। তারানাথ উল্লেখ করেছেন যে, নিপীড়িত বৌদ্ধ শ্রমণরা বাংলায় মুসলমান আক্রমণকারীদের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেছে (রায়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪১৪)। সেন রাজারা বৌদ্ধধর্মের বিদ্বেষী ছিল। *দান সাগর* গ্রন্থে — যা বল্লাল সেন কর্তৃক রচিত বলে অনুমান করা হয় রাজাকে *নাস্তিকদের* (বৌদ্ধদের বোঝানো হয়েছে) নিধনকারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। রামাই পণ্ডিত বর্ণনা করেছেন কীভাবে বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য ধর্ম-দেবতার সাহায্য কামনা করেছিল।

বাংলায় কিছু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অসম্ভব নয়। তবে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ধর্মান্তর যে কোনওক্রমেই বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণ হতে পারে না সে সম্পর্কে তিনটি যুক্তি তুলে ধরা যায়। প্রথমত, মুসলমান বিজয়ের সময় বৌদ্ধরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ছিল না। নীহার রঞ্জন রায়ের মতে পাল শাসনামলে (৭৫৬-১১৪৩ খ্রি.) যখন বৌদ্ধ রাজারা বাংলা শাসন করত তখনও হিন্দু জনসংখ্যা

ছিল বৌদ্ধদের চাইতে অনেক বেশি (রায়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ., পৃ. ৫০৮)। অন্য একজন ঐতিহাসিকের মতে মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে সংখ্যার ক্রমবিচারে যে তিনটি প্রধান ধর্মাবলম্বী মানুষ এদেশে বাস করত তারা ছিল, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন (Ali, ১৯৮৫, খণ্ড-ঐ, পৃ. ৭৩২)। শুধু বৌদ্ধদের ধর্মান্তরণ তাই বাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্যকে যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, হিন্দুদের অত্যাচারের কারণে বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল বলে যে অনুকল্প রয়েছে তা যদি সত্যি হত তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই তা ঘটত। ইবনে বতুতার বর্ণনা স্পষ্টতই তুলে ধরে যে, এমনকি চতুর্দশ শতাব্দীতেও পূর্ব বাংলায় এ ধরনের কোনও গণ-ধর্মান্তর ঘটেনি। ধর্ম প্রচারক শাহজালালের সাথে দেখা করে সিলেট থেকে ফেরার পথে তিনি মেঘনা নদী দিয়ে পনের দিনব্যাপী ভ্রমণ করেছিলেন; পূর্ব বাংলার লোকজনকে তখন তিনি "মুসলমান শাসনাধীন কাফের" বলে বর্ণনা করেছেন (Ibn Batuta ১৯৬৯, পৃ. ২৬৭)। এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব বাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্যেকে বৌদ্ধদের গণ-ধর্মান্তরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

পরিশেষে বলা যায়, হিন্দু ও বৌদ্ধদের বিরোধকে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। বরং অন্যদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে সম্প্রীতি ও বোঝাপড়ার বহু উদাহরণ রয়েছে। পাল রাজারা ছিল বৌদ্ধ কিন্তু তারা ব্রাহ্মণ রাজকুমারীদের বিয়ে করেছিল এবং হিন্দু মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। বৌদ্ধ বিহার-এ হিন্দু দেবতাদের পূজা হয়েছে। অপরদিকে, হিন্দু-ধর্ম বুদ্ধকে দেবতার আসনে আসীন করেছে এবং বুদ্ধের মূর্তি দ্বারা হিন্দু প্রতিমা প্রভাবিত হয়েছে। গণ-মানুষের পর্যায়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম পরস্পর পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি চলে এসেছিল (রায়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৫৭-৫৬০)। হিন্দু ধর্ম বুদ্ধকে ভগবান হিসেবে পূজা করে আর ইসলাম ধর্ম বুদ্ধকে স্বীকারই করে না; তাই হিন্দু ধর্ম থেকে রক্ষা পাবার জন্য আপামর জনগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এটি ভাবা যুক্তিযুক্ত নয়। দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমানরা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি খুব একটা সহনশীল ছিল না। উইল ডুরান্ট লক্ষ করেছেন যে, "আরবরা যখন এ দেশে আসল তখন প্রতিজ্ঞা করল তারা সহজ-সরল, সুখ-দুঃখে-উদাসীন একেশ্বরবাদ প্রচার ও প্রসার করবে। অলস, অর্থ-লিপ্সু, অলৌকিক-ঘটনা-সংঘটনকারী বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে তারা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত। বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস এবং হাজার হাজার ভিক্ষুকে হত্যা করে তারা ঝুঁকিবিমুখ লোকজনের কাছে মঠের জীবনকে অপ্রিয় করে তোলে" (Durant, ১৯৬৩, পৃ. ৫০৫)। ঘটনাপঞ্জির লিপিকার মিনহাজ-ই-সিরাজ উল্লেখ করেছেন যে, ইখতিয়ার-আল-দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী উদন্তপুরী বিহারের ন্যাড়া-মাথা ভিক্ষুদের হত্যা করেছিলেন এবং মঠের পাঠাগার ধ্বংস করেছিলেন (১৯৫৫, পৃ. ৫০-৫১)। ফলে, বাংলায় বৌদ্ধদের দলে দলে ধর্মান্তরের তত্ত্ব সত্য বলে মনে হয় না।

চতুর্থ একটি অনুকল্পে প্রস্তাব করা হয় যে, সুফী-দরবেশদের ধর্ম প্রচারের ঐকান্তিক উদ্যোগ বাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণ। চতুর্দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত জৈনপুরী পীর মির্জা সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর শিমনানী লিখেছেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; বাংলা কত সুন্দর জায়গা - বিভিন্ন দিক থেকে অসংখ্য পীর-দরবেশ, তপস্বী

এসে এদেশে তাঁদের ঘর বেঁধেছে, একে তাঁদের নিজের বাসভূমি করে নিয়েছে" (Rahim, ১৯৬৩, পৃ. ১২৩)। ইসলাম-প্রচারক অধিকাংশ পীর-দরবেশ ভক্তদের নির্মিত মাজারের মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছেন। মাজার হচ্ছে সমাধিস্থল বা স্মৃতিসৌধ।

সারণি-১০-এ বাংলায় মুসলমান পীরদের প্রধান প্রধান মাজারের অবস্থানের একটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। যে সব কিংবদন্তিতে বর্ণিত পীরের মাজার স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি (যেমন, পাঁচ পীর, বারো আউলিয়া) তাদের মাজার এ তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজে পীরদের সম্পর্কে উপাত্ত খুবই কম। ফলে ১০নং সারণির উপাত্ত পুরোপুরি নির্ভুল না-ও হতে পারে। এ ধরনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ১০নং সারণি থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১০নং সারণিতে উল্লেখিত ৫৯ জন ঐতিহাসিক পীরের মধ্যে তিন জন সম্পর্কে এই তথ্য মেলে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলমান বিজয়ের বহু পূর্বেই তাঁরা ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। মুসলমান শাসনামলে (১২০৬-১৭৫৭ খ্রি.) যে ৫৬ জন ঐতিহাসিক পীর বাংলায় এসেছিলেন তাদের শতকরা ১৫ ভাগ এসেছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, ৩৬ ভাগ এসেছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীতে, ১৮ ভাগ পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ২৩ ভাগ ষোড়শ শতাব্দীতে এবং ৩ ভাগ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, মুসলমান পীরদের ধর্ম প্রচারের কাজ নিবিড় কর্মকাণ্ড চলে প্রায় চার শতাব্দীব্যাপী – ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। মুসলমানদের ধর্মপ্রচার ও প্রসারের কার্যক্রম শুরু হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, চতুর্দশ শতাব্দীতে তা সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে; পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাতে ভাটা পড়ে; ষোড়শ শতাব্দীতে তাতে আবার নতুন জোয়ার আসে। এ থেকে ইঙ্গিত মেলে যে, বাংলায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর আকস্মিকভাবে ঘটেনি; ধর্মান্তরের ক্রমিক প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময়ব্যাপী বিস্তৃত ছিল।

দ্বিতীয়ত, সারণি ১০ হতে দেখা যায় যে, পীর দরবেশগণ বাংলার সর্বত্রই তাঁদের বাণী প্রচার করেছিলেন এবং সারা দেশে ছড়িয়ে আছে তাঁদের মাজার। তবে কিছু কিছু এলাকার প্রতি পীরদের অধিকতর পক্ষপাত ছিল। ঐতিহাসিক পীরগণ লক্ষণীয়ভাবে ঢাকা, মালদহ, হুগলি ও বর্ধমান জেলার প্রতি তাদের বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন। এমনও হতে পারে, তাঁরা মুসলমান শাসনের কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিলেন।

সারণি-১০

বাংলায় মুসলমান পীর-দরবেশের প্রধান প্রধান মাজারের তথ্য

অঞ্চল	আনুমানিক সময়	ধরন	পীর-দরবেশের নাম	মাজারের অবস্থান
চট্টগ্রাম	৯ম শতাব্দী ১৩শ শতাব্দী ১৩শ শতাব্দী ১৬শ শতাব্দী	কিংবদন্তি কিংবদন্তি ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক	বায়েজীদ বোস্তামী শেখ ফরিদ শেখ বখতিয়ার মহীশূর শেখ জালাল হালভী	চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম সন্দ্বীপ হাটহাজারী
নোয়াখালী	১৩শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	সৈয়দ মীরণ শাহ	কাঞ্চনপুর

অঞ্চল	আনুমানিক সময়	ধরন	পীর-দরবেশের নাম	মাজারের অবস্থান
কুমিল্লা	১৪শ শতাব্দী ১৪শ/ ১৫শ শতাব্দী ১৪শ শতাব্দী ১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক	হজরত রাস্তি শাহ সৈযদ আহমদ কেল্লা শহীদ শাহ কামাল শাহ মুহম্মদ বাগদাদী	চাঁদপুরের মেহের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খড়মপুর উটখরা গ্রাম চাঁদপুরের শাহতলী
সিলেট	১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	শাহ জালাল	সিলেট
ময়মনসিংহ	১১শ শতাব্দী ১৪শ শতাব্দী ১৫শ শতাব্দী শেষ পাদ / ১৬শ শতাব্দীর প্রথম পাদ	ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক	শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী শাহ কামাল শাহ আদম	নেত্রকোনার মদনপুর গারো পাহাড় আটিয়া
ঢাকা	১৩শ শতাব্দী সময় অজ্ঞাত ১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগ/ ১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ১৪শ শতাব্দী ১৪শ শতাব্দী ১৪শ শতাব্দী ১৫শ শতাব্দী ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগ/ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগ ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগ/ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ১৬শ শতাব্দীর	ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক	শেখ শরফ আল দীন আবু তাওয়ামাহ শাহ নিয়ামতউল্লাহ শেখ আনোয়ার বাবা আদম শহীদ সৈয়দ আলী তাবরিজী শেখ মালেক ইয়েমেনী শাহ লঙ্গর শাহ মান্নান হাজী বাবা সালেহ খাজা চিশতি বেহস্তী শাহ আলী বাগদাদী	সোনার গাঁ ঢাকার পুরানা পল্টন সোনার গাঁ মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুর ধামরাই ঢাকা শহর ঢাকার ১০মাইল উত্তরে সোনাগাঁর মোগড়া পাড়া নারায়নগঞ্জের বন্দর ঢাকা মীরপুর
বাকেরগঞ্জ	১৪শ/ ১৫শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	সাইয়িদুল আরেফিন	বাকেরগঞ্জের বাউফল
খুলনা	১৫শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	খান জাহান আলী	বাগেরহাট
যশোহর	১৬শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক	খালাশ খান	বেদ কাশী
রাজশাহী	১৫শ/ ১৬শ শতাব্দী ১৬শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক	মাখদুম জালালউদ্দিন রুপুস মৌলানা শাহদৌল্লা (শাহ মোয়াজ্জেম দানিশমন্দ)	রাজশাহী শহর বাঘা

অঞ্চল	আনুমানিক সময়	ধরন	পীর-দরবেশের নাম	মাজারের অবস্থান
পাবনা	১৩শ শতাব্দী ১৬শ শতাব্দীর পূর্বে	ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক	মাখদুম শাহ শাহ শরীফ জিন্দানী	শাহজাদপুর তারাস
বগুড়া	১১শ শতাব্দী তারিখ অজ্ঞাত তারিখ অজ্ঞাত	ঐতিহাসিক কিংবদন্তি কিংবদন্তি	মীর সৈয়দ সুলতান মহীশূর শাহ তুরকান শহীদ বাবা আদম	মহাস্থানগড় শেরপুর আদমদীঘি
রংপুর	তারিখ অজ্ঞাত ১৫শ শতাব্দী	কিংবদন্তি ঐতিহাসিক	শাহ কলন্দর শেখ ইসমাইল গাজী	ডোমার কান্ত দুয়ার
দিনাজপুর	তারিখ অজ্ঞাত ১৪শ শতাব্দী ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগ/ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ	কিংবদন্তি ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক	নাসিরউদ্দিন শাহ নেক মদ মৌলানা আতা শেখ বদরুদ্দিন	নেক মর্দন গঙ্গারামপুর হেমতাবাদ
মালদহ	১৩শ শতাব্দী ১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগ/ ১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ১৪শ শতাব্দী ১৪শ শতাব্দী ১৪শ শতাব্দী ১৪শ শতাব্দী ১৫শ শতাব্দী ১৭শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক	শেখ জালাল-আল-দীন তাবরিজী শেখ জামাল শেখ আখি সিরাজ, আল দীন ওসমান শেখ আল হক শেখ রাজা বিয়াবানি হযরত নুর কুতুব আলম মৌলানা বরখুর্দার শাহ নিয়ামতউল্লাহ	দেওতলা পাণ্ডুয়া পাণ্ডুয়া পাণ্ডুয়া পাণ্ডুয়া গৌড় গৌড় গৌড়
চব্বিশ পরগণা	১৪শ শতাব্দী ১৪শ শতাব্দী ১৫শ শতাব্দী কাল অজ্ঞাত	ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক কিংবদন্তি	সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কী (পীর গোরা চান্দ) রওশন আরা একদিল শাহ মোবারক গাজী	বশিরহাটের হর্না গ্রাম বশিরহাটের কাঠুলিয়া বারাসাত
কলিকাতা	কাল অজ্ঞাত	কিংবদন্তি	শরীফ শাহ	কলকাতা
হুগলি	১৩শ শতাব্দী ১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগ/ ১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ১৪শ শতাব্দী ১৪শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক	শাহ সুফী শহীদ শাহ সাফিয়াল দীন শাহ আনওয়ার বড় খান গাজী	সাঁতগাও ছোট পাণ্ডুয়া কুলী হালভী ফুরফুরা বড় খান গাজী হুগলীর ত্রিবেণী
মেদিনীপুর	১৩শ/ ১৪শ	ঐতিহাসিক	আমীর খান লোহানী	ইন্দ গ্রাম

অঞ্চল	আনুমানিক সময়	ধরন	পীর-দরবেশের নাম	মাজারের অবস্থান
	শতাব্দী			
বর্ধমান	১৩শ শতাব্দী ১৫শ/ ১৬শ শতাব্দী ১৬শ শতাব্দী ১৬শ শতাব্দী ১৭শ/ ১৮শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক	মাখদুম শাহ শাহ সুলতান আনসারী বাহরাম সাক্কা মাখদুম শাহ আব্দুল্লাহ গুজরাটি খাজা আনওয়ার শাহ	মঙ্গলকোট মঙ্গলকোট বর্ধমান মঙ্গলকোট বর্ধমান
বীরভূম	১৩শ শতাব্দী ১৬শ শতাব্দী	ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক	শেখ আবদুল্লাহ কিরমানী মাখদুম শাহ জহীর আল দীন	কুষ্টিগিরি মাখদুম
বিহার সংলগ্ন জেলা	১৩শ/ ১৪শ শতাব্দী ১৫শ শতাব্দী ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগ/ ১৫শ শতাব্দী ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগ/ ১৫শ শতাব্দ	ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক	শেখ আল দীন মানেরী শেখ হোসেন দুকারপুস শাহ বদরুল ইসলাম শাহ মজলিস	 বিহার বিহার বিহার বিহার

সূত্র : ১. Rahim, Muhammad Abdur, *Social and cultural History of Bengal*, Vol. I (করাচি; পাকিস্তান হিস্টরিকাল সোসাইটি, ১৯৬৩, পৃ. ৭২-১৫০)

২. চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো (ঢাকা, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫, পৃ. ৩৩-৯৬)।

মুসলমান ধর্ম-প্রচারকদের কার্যক্রম বাংলার ক্ষেত্রে অনন্য কোনও ঘটনা নয়। উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলও সমভাবে ধর্ম-প্রচারকদের কার্যক্রমের আশীর্বাদ লাভ করেছে। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ধর্মপ্রচার করেছেন এমন ১১৩ জন মুসলমান ধর্ম-প্রচারকের মাজারের তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন এইচ. এ. রোজ (তারিখ নির্দেশ নেই; পৃ. ৪৮-৮৪)। ঐ এলাকায় বিখ্যাত ধর্ম-প্রচারকদের মধ্যে ছিলেন আজমীরের খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (১৩শ শতাব্দী), পানিপথের বো আলী কলন্দর (১৪শ শতাব্দী), লাহোরের দাতা গঞ্জ বক্স (১১শ শতাব্দী), পাঞ্জাবের শাহ ফরিদউদ্দিন, কাশ্মীরের বুলবুল শাহ এবং সৈয়দ আলী হাম্মাদানী এবং দিল্লির কুতুবুদ্দিন ও নিজামুদ্দিন আউলিয়া। দক্ষিণাত্যে ইসলাম প্রচার করেন সৈয়দ মুহম্মদ গিসু দরাজ এবং পীর মহাবীর কামদিয়াত (১৪শ শতাব্দী)। গুজরাটে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধর্ম প্রচার করেন পিরানার ইমরান শাহ ও দয়াল শাহ পীর। সিন্ধু ও কোচিন-এ ধর্ম প্রচারের জন্য সৈয়দ ইউসুফউদ্দীন ও পীর সদরুদ্দীন (১৫শ শতাব্দী) খ্যাতি অর্জন করেন।

ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর ঘটেছিল মূলত মুসলমান ধর্ম-প্রচারকদের প্রচেষ্টায়। তবে অঞ্চলভেদে এ সব পীর-দরবেশের উদ্যোগের সাফল্যের তারতম্য ঘটেছিল। ফলে প্রশ্ন দাঁড়ায় – দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে মুসলমান পীর-দরবেশদের ধর্মান্তরণ-উদ্যোগের ব্যর্থতা সত্ত্বেও বাংলায় তাঁরা কেন তুলনামূলক সাফল্য লাভ করেছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় সাফল্যের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশের পীরগণ কোনওক্রমেই বাংলার পীরদের চেয়ে নিম্ন-পর্যায়ের ছিলেন না। অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে – বাংলায় পীরদের সাফল্যের কারণ তাঁদের সংখ্যাধিক্য, অধ্যবসায় বা দক্ষতা নয়, বরং ধর্মান্তরণের জন্য উপযোগী পরিবেশ-পরিস্থিতিই তাদের সাফল্যের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

সম্প্রতি ঐতিহাসিকগণ অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, পীরদের দ্বারা বাংলায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছে এ কথা প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয়। বাংলায় পীরেরা এত মানুষজনকে ধর্মান্তরের জন্য কেন আকৃষ্ট করতে পারল আর অপরদিকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা পীরদের বাণী কেন কানে নিল না তা ব্যাখ্যা করাও জরুরি। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার পীরদের অনন্যতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি অনুকল্প অনুসারে বাংলায় পীর-প্রথা আধ্যাত্মিক সাধনার একটি অনন্য ধরন যা এই বদ্বীপ অঞ্চলের লোকজনের প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নিয়েছিল। দ্বিতীয় অনুকল্পটি দাবি করে যে, বাংলার পীরদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও সামাজিক উদ্যোগের অনন্য সংমিশ্রণ ঘটেছিল; এর ফলে তাঁরা কৃষি সীমান্তের অনন্য ক্ষমতাধর অগ্রসৈনিক হয়ে উঠেছিলেন।

প্রথম অনুকল্পটির প্রবক্তা অসীম রায়। তিনি বাংলায় ইসলামের তুলনামূলক সাফল্যের পেছনে 'পীরবাদী' প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উপস্থাপন করেছেন। আক্ষরিক অর্থে পীর হচ্ছে আধ্যাত্মিক পরিচালক বা পথ-প্রদর্শক। পীর-প্রতিষ্ঠান কোনওক্রমেই বাংলার ক্ষেত্রে অনন্য নয়। রায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, বাংলার পীরেরা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশের পীরদের চাইতে ভিন্ন ধরনের ছিলেন। তাঁর মতে, বাংলায় পীরদের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, বাংলায় পীরের অর্থ ব্যাপক। পীর বলতে শুধু আধ্যাত্মিক মুরশীদ বা ফকির-দরবেশই বুঝায় না, দেবতার পর্যায়ে উন্নীত সৈনিক, অনাবাদী এলাকায় অগ্রণী বসতকার, রূপান্তরিত হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবতাও বোঝানো হয়; অনেক ক্ষেত্রে জড় পদার্থে আত্মা আরোপ করে ও এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে জড়কে মানুষরূপে পূজা করা হয়। অলৌকিক ও বিস্ময়কর ক্ষমতার কারণে তাঁদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করা হয়। দ্বিতীয়ত, বাংলায় পীর প্রতিষ্ঠান লোক-ধর্মের সংমিশ্রণ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ফলে বাংলায় পীরবাদ অনন্য ও স্থানিক হয়ে উঠেছিল। ব্যাঘ্র দেবতা, সর্প দেবী, কুমীর দেবীর মত দেবত্বলাভকারী প্রাণবাদী আত্মাকে বাংলায় পীরের প্রতিষ্ঠানের সাথে একীভূত করা হয়েছিল। পরিশেষে বলা যায়, বাংলায় অস্থিতিশীল সমাজে পীরগণ সংঘবদ্ধকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। রায়ের ভাষায় "প্রকৃতির রুদ্ররোষে পরিবর্তনশীল বদ্বীপের নৈরাজ্যকর অবস্থা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রতুলতার কারণে তীব্রতা পায়; ফলে, মূলত অস্থিতিশীল ভৌত ও সামাজিক পরিস্থিতিতে

স্থিতিশীলতা ও নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য কোনও একটি বন্ধন-সৃষ্টিকারী শক্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়" (Roy, ১৯৮৩, পৃ. ৫০)। প্রতিদিনের দুঃখ-দুর্দশা কাটিয়ে ওঠার জন্য পীরদের আধ্যাত্মিক পরামর্শের প্রয়োজন ছিল বাংলার সুবিধাবঞ্চিত মানুষ-জনের। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, নিম্ন বাংলায় সামাজিকভাবে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর লোকজন যে দলে দলে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে তার কারণ হল পীরবাদ তাদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটিয়েছিল। তিনি যুক্তি দেখান যে, "বাংলায়, বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় বিচ্ছিন্ন এবং ব্যক্তিক ধর্মান্তর মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দানে সক্ষম নয়" (১৯৮৩, পৃ. ৪২)। তিনি অবশ্য দাবি করেন যে, বাংলার গণ-মানুষের প্রাথমিক ধর্মান্তর আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার, অন্তর্জগতের চেতনার ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তন করেনি। সামাজিক দৃষ্টিতে একটি সমাজ থেকে অন্য সমাজে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে মাত্র; তারা শুধু শিবির পরিবর্তন করে (১৯৮৩, পৃ. ৩৮)।

রায়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দুটি প্রধান দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, রায় বাংলায় পীরবাদের অনন্যতাকে অতিরঞ্জিত করেছেন। পীরবাদেব মূল বৈশিষ্ট্য বাংলা বা ভারতের অন্যান্য অংশের মুসলমানদের কাছে অপরিচিত নয়। প্রাচীনকালের *গুরু-চেলা* সম্পর্ক এবং স্থানীয় দেব-দেবীতে সর্বজনীন বিশ্বাস হিন্দু ধর্মের অপরিহার্য উপাদান (Titus, ১৯৫৯, পৃ. ১৩৭)। মুসলমানদের মধ্যে পীরবাদের চল দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষণীয়ভাবে সমধর্মী। বাংলার কিছু কিছু কিংবদন্তি-পীরকে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশেও সমভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তির চোখে দেখা হয়। উত্তর ভারতের সর্বত্র মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঁচ পীরের পূজা সমভাবে জনপ্রিয় (Rose, তারিখ অজ্ঞাত)। সমভাবে খাজা খিজিরকে বাংলায় পীর বদর বলে পূজা করা হয়; মুসলমান বিশ্বের সর্বত্র তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা হয়। গাজী মিঞাকে বাংলায় বিয়ে-শাদী আর গর্ভধারণের দরবেশ বলে পূজা করা হয়; উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবেও তাঁকে সমভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা হয় (Titus, ১৯৫৯)। বাংলার কিছু কিছু কিংবদন্তি-পীর স্থানীয়ভাবে-প্রতিষ্ঠিত পীরও বটে। যেমন, প্রেমের দরবেশ হচ্ছে মনাই পীর, গরু-বাছুরের রক্ষক হচ্ছে তিননাথ, গ্রাম-রক্ষাকারী দরবেশ হচ্ছে মানিক পীর, বাঘের আক্রমণ হতে রক্ষাকারী হচ্ছে গাজী সাহেব এবং জানমালের হেফাজতকারী হচ্ছে সত্যপীর। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যেও একই ধরনের স্থানীয় পীর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বাঙালি মানিক পীরের পাঞ্জাবি প্রতিরূপ হচ্ছে শাখি সরওয়ার সুলতান। শেখ সাদ্দু হচ্ছে মনাই পীরের অন্য এক রূপ। উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের স্থানীয় পীরদের মধ্যে গুগ্গা পীর লালবাগ, পীর শাহতাব, পীর মিলা, পীর দিদার, কাঠ বাওয়া সাহেব, পীর ইমাম জামিন, ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধরে নেয়া ঠিক নয় যে, বাংলার প্রকৃতি নিষ্ঠুর হওয়ার কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যান্য কৃষকদের চাইতে বাংলার কৃষকদের জন্য অধিক জরুরিরূপে পীরের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ভারতের অন্যান্য অংশে প্রকৃতিও বাংলার তুলনায় খুব একটা সদয় ছিল না। উপমহাদেশের সর্বত্রই কৃষক জীবনের সমস্যা ছিল একই ধরনের। ফলে প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে রক্ষাকর্তা হিসেবে পীরদের জনপ্রিয়তা বাংলার ক্ষেত্রেই অনন্য বিষয় নয়।

দ্বিতীয়ত, বাংলায় গণ-ধর্মান্তরের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তবে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে গণ-ধর্মান্তরের উদাহরণ মেলে। পাঞ্জাবে প্রায়শই পুরো উপজাতি (Tribe) নব-ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কিংবদন্তি এবং পাক-পত্তনের বাবা ফরিদ উদ্দিনের ধর্ম-জীবনী মতে তিনি ষোলটি পাঞ্জাবি উপজাতিকে নব ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন (Titus, ১৯৫৯, পৃ. ৪৫)। শহরেও বিভিন্ন পেশাজীবী সম্প্রদায়ের ধর্মান্তরের উদাহরণ রয়েছে (Karim, ১৯৮৫)। যখন কোনও রাজা বা উপজাতীয় নেতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন তখন প্রায়শ গণ-ধর্মান্তর ঘটত। বাংলায় এ ধরনের কোনও গণ-ধর্মান্তরের ঘটনা নেই। রায় ব্যক্তিগত ধর্মান্তরের কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি গণ-ধর্মান্তরের একটি উদাহরণও তুলে ধরতে পারেননি। মোহর আলী যথার্থই বলেছেন, “লক্ষণীয় যে, সাহিত্য বা অন্য কোনও সূত্রে কোনও কালে বা কোনও স্থানে বড় ধরনের ধর্মান্তরের কোনও উল্লেখ নেই। উঁচু বা নিচু যে কোনও শ্রেণীর মানুষের মধ্যে গণ-ধর্মান্তরের কোনও ঘটনা যদি ঘটে থাকত তবে তৎকালীন ঘটনাপঞ্জির দলিল বা ধর্ম-জীবনীতে তা অবশ্যই স্থান পেত। সে যুগের লেখকগণ তাঁদের নেতাদের ধর্মীয় সাফল্য বর্ণনা করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন; তাই তা দলিল-দস্তাবেজে অবশ্যই স্থান করে নিত এমন ধারণা করা যায়” (Ali, ১৯৮৫, খণ্ড-IB, পৃ. ৭৮২)।

যখন পুরো জনগোষ্ঠী বা গোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ নতুন ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করে তখনই গণ-ধর্মান্তর ঘটে। এ ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে উপজাতি, গ্রাম-সমাজ, বর্ণ-গোষ্ঠী, অথবা পেশাজীবী গোষ্ঠী ইত্যাদি থাকতে পারে। বাংলায় কোন ধরনের গোষ্ঠী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তা রায় নির্দিষ্ট করে বলতে পারেননি। অপরদিকে, ব্যক্তিগতভাবে ধর্মান্তরের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত স্পষ্টভাবেই তুলে ধরে যে, বাংলায় একেবারেই গণ-ধর্মান্তর ঘটেনি। যদু যখন মুসলমান হন তখন তাঁর পিতা ও ভাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। প্রাপ্ত ঐতিহাসিক সূত্র হতে দেখা যায় যে, একজন মেচ উপজাতীয় প্রধান বখতিয়ার খলজি-র হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুসারীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি (Ali, ১৯৮৫, খণ্ড-IB, পৃ. ৭৮২)। বাংলায় কোনও উপজাতি বা পুরো গ্রাম ধর্মান্তরিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত নেই। এমনকি পূর্ব বাংলার যেখানে মুসলমানরা উল্লেখযোগ্যভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেও এমন গ্রাম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যা পুরোপুরি মুসলমান অধ্যুষিত। গণ-ধর্মান্তর যদি ধর্মান্তরের প্রধান প্রক্রিয়া হত তাহলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলো থেকে হিন্দু-ধর্ম বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সারণি ৯ থেকে দেখা যাবে যে, মুসলমানপ্রধান জেলাগুলোতেও হিন্দু জনসংখ্যা নগণ্য ছিল না।

রায়ের গণ-ধর্মান্তরের অনুকল্প যদি ঠিক হত তবে স্বল্প সময়ের পরিসরেই বাংলায় ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়ত। বাংলায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর যে ক্রমাগতভাবে এবং অন্তুতপক্ষে চারশ' বছরের পরিসরে ঘটেছে সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে কম করে হলেও তিনটি কারণের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, বাংলায় পরিব্রাজকদের বিবরণসমূহ ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর ঘটেছে ধীরে ধীরে। ইবনে বতুতা ১৩৪২ সালে বাংলা ভ্রমণ করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ব বাংলার লোকজন হচ্ছে কাফের। তার অর্থ দাঁড়ায় মুসলমান শাসনের ১৫০ বছর পরও পূর্ব বাংলা ছিল মূলত হিন্দু-অধ্যুষিত। পর্তুগীজ পরিব্রাজক বারবুসা ১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভ্রমণ

করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন "রাজা হচ্ছেন একজন মুর; তিনি একজন মহান নৃপতি, এবং খুবই ধনী ব্যক্তি। তাঁর রাজ্যের আওতায় রয়েছে বিশাল এলাকা; হিন্দুদের বাস তাতে। প্রতিদিন তাদের অনেকে মুর (মুসলমান) ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় যাতে রাজা আর গভর্নরদের আনুকূল্য মেলে" (Rahim-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৬৭)। এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে যে, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর অব্যাহত ছিল এবং ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এ দেশ মূলত হিন্দু-অধ্যুষিত ছিল। এ সব বিবরণ থেকে নিশ্চিত যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে তা হল – অন্ততঃপক্ষে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলাম-ধর্মে ধর্মান্তর অব্যাহত ছিল। দ্বিতীয়ত, সারণি-১০ স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, ষোড়শ শতাব্দীতে বিপুল সংখ্যক ধর্ম-প্রচারক বাংলায় ইসলাম প্রচার করেন। পূর্ব বাংলার মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোতে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর যদি ষোড়শ শতাব্দীর আগেই সম্পূর্ণ হত তা হলে এ সব ধর্ম-প্রচারক চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রাজশাহীর মতো জেলাগুলোতে আসতেন না।

পরিশেষে বলা যায়, মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের প্রসার বিষয়ে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক গবেষণাও বাংলায় ধীরে ধীরে ইসলাম প্রসারের অনুকল্প সমর্থন করে। এক হিসাব মতে দেখা যায়, মুসলমান শাসনের প্রথম শতাব্দীতে ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিশর, তিউনিশিয়া ও স্পেনের শতকরা দশ ভাগেরও কম মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আরবের বাইরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অধিকাংশ স্থানীয় মানুষকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে চারশ' বছরের মতো সময় লেগেছিল (হুরানি, ১৯৯২, পৃ. ৪৬-৪৭)।

বাংলায় পীরদের অনন্য ভূমিকা সম্পর্কে এক ব্যাখ্যান উপস্থাপন করেন ইটন (১৯৯৪)। রায় যেখানে অস্থিতিশীল সমাজে পীরদের আধ্যাত্মিক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, ইটন সেখানে পীরদের সামাজিক উদ্যোগের ওপর জোর দেন এবং তাঁদেরকে "বাংলার কৃষি সীমান্তের প্রেরণা-সঞ্চারক সারথী" বলে বর্ণনা করেন। ইটনের প্রধান প্রধান যুক্তিগুলোকে সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হল :

১. পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় ইসলামের প্রসার ঘটে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের বড় ধরনের পরিবেশগত পরিবর্তনের সময়। গঙ্গা নদীর মূলধারা তখন পশ্চিমের ভাগীরথী নদী থেকে সরে সম্পূর্ণরূপে পদ্মার ধারায় পরিবর্তিত হয়। ফলে, বাংলা বদ্বীপের পশ্চিম অংশে অবস্থিত এলাকায় ক্রমান্বয়ে পানি প্রবাহ কমে যায় এবং পলি জমতে থাকে। ভূগোলের ভাষায় বলা যায় যে, এ সব এলাকা মৃত বদ্বীপে পর্যবসিত হয়। ফলে শুধু কৃষি উৎপাদনই পড়ে যায়নি, মহামারীরও প্রাদুর্ভাব ঘটে। মৃত নদীর বদ্ধ পানিতে মহামারীর প্রসার ঘটে। প্রতিতুলনায় পূর্ব বাংলার ক্রিয়াশীল বদ্বীপের এলাকা ছিল অত্যন্ত উর্বর; বসবাসের জন্যও তা ছিল স্বাস্থ্যকর।

২. মৃত বদ্বীপ থেকে ক্রিয়াশীল বদ্বীপে লোকজনের দেশান্তরে ক্ষেত্রে পরিবেশগত পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার নতুন-জেগে-ওঠা জমিতে "তুলনামূলকভাবে স্বল্প-উর্বর উপরাঞ্চলের বদ্বীপ বা পশ্চিম বাংলা এবং উত্তর ভারত এবং তার বাইরের" অভিবাসীরা বসতি স্থাপন করে (পৃ. ২২৬)।

৩. পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার সক্রিয় বদ্বীপের উপনিবেশনের জন্য ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করার প্রয়োজন ছিল। ইটনের ভাষায় "এ অঞ্চলের পূর্বেকার ঘন জঙ্গলকে ধান ক্ষেতে রূপান্তরিত করার জন্য উন্নততর সাংগঠনিক দক্ষতা ও প্রচুর জনবলের প্রয়োজন পড়েছিল" (পৃ. ২১০)। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় সক্রিয় বদ্বীপের উপনিবেশনের নেতৃত্ব এসেছিল পীরদের মধ্য থেকে।

৪. সক্রিয় বদ্বীপে পীরেরা বসতি গড়ার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেন; এ সব বসতি বাইরের অভিবাসীসহ স্থানীয় জেলে সম্প্রদায় ও ভাসমান কৃষক সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। তারা এ সব নতুন বসতিতে মসজিদ নির্মাণ করে এবং মসজিদই "ইসলাম ধর্মকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়"। সক্রিয় বদ্বীপের উচ্চ উৎপাদনশীলতার কারণে এ সব নতুন বসতিতে জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। ফলে সক্রিয় বদ্বীপে গড়ে-ওঠা বসতি পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যে অবদান রাখে।

ইটনের অনুকল্পের প্রধান আকর্ষণ হল এই যে, বাংলায় পীরদের অনন্য সাফল্যের ব্যাপারে তা একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। ভারতের অন্যান্য অংশের পীরেরা শুধু আধ্যাত্মিক গুরু ছিল; অপরদিকে বাংলার পীরদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও সামাজিক উদ্যোগের সমাহার ঘটেছিল। তবে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি এই অনুকল্পকে সমর্থন করে না। প্রথমত, ইটন গঙ্গার প্রধান ধারার পরিবর্তনের বিধ্বংসী প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করেছেন। বদ্বীপ অঞ্চলে নদীর গতিপথের এ ধরনের পরিবর্তন অস্বাভাবিক কিছু নয়। বাংলায় মৃত বদ্বীপ ছিল জলাভূমি। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় জলাভূমির পরিবেশ অত্যন্ত ধীর গতিতে বদলায়। পরিণামে, গঙ্গার মূল ধারায় পরিবর্তনের কারণে যে ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দেয় তা ষোড়শ শতাব্দীতে নয়, বরং উনবিংশ শতাব্দীতে সংকটজনক হয়ে ওঠে (Geddes, ১৯২৯; Ganguly, ১৯৩৮)। ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে বাংলায় সক্রিয় বদ্বীপে চাষাবাদের সম্প্রসারণ ও ইসলাম প্রসারের দ্রুততার মধ্যেও যৌক্তিক সম্পর্ক নেই। ষোড়শ শতাব্দীতে ইসলামের প্রসারের দ্রুতগতিকে সোজাসুজি ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, পূর্ববর্তী তিনশ' বছরের ধর্মান্তরণ উদ্যোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে ইসলামের প্রসার এই গতি অর্জন করেছিল।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিম বাংলায় মৃতপ্রায় বদ্বীপ থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার সক্রিয় বদ্বীপে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জনসংখ্যার দেশান্তর সম্পর্কিত অনুকল্পের সমর্থনে প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ নেই। এ ধরনের দেশান্তরের মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক ব্যয়ের কথা তিনি এড়িয়ে গেছেন। পূর্বপুরুষের ভিটে-মাটির প্রতি গভীর আবেগময় অনুরক্তির কারণে বাংলার হিন্দু-গ্রামবাসীরা দেশান্তর সম্পর্কে ছিল অত্যন্ত অনাগ্রহী। হিন্দু-ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে পূর্বপুরুষের ভিটে-মাটিকে পবিত্র জ্ঞান করা হয়েছে। সক্রিয় বদ্বীপে নতুন জেগে-ওঠা জমির আবাদকারীরা প্রধানত এসেছিল এলাকার ভেতর থেকে, বাহির থেকে নয়। স্বাভাবিকভাবে ভাবা যেতে পারে, সক্রিয় বদ্বীপের বিপুল সংখ্যক লোক ছিল প্রতিবছরকার নদী-ভাঙ্গনের-শিকার-হওয়া মানুষ। এ ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরাই নতুন জেগে-ওঠা জমিতে আকৃষ্ট হবে। সক্রিয় বদ্বীপে হঠাৎ করে জনসংখ্যার বৃদ্ধিও পয়স্তী জমিতে বসতি-স্থাপনকে উৎসাহিত করে থাকতে পারে। পশ্চিম বাংলা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ যদি সক্রিয় বদ্বীপে অভিবাসিত হত

তবে দক্ষিণ বাংলার আঞ্চলিক ভাষা পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ভাষার বদলে পশ্চিম বাংলার ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত ছিল। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার পাশাপাশি এলাকার আঞ্চলিক ভাষার সাদৃশ্য বাহির থেকে বড় ধরনের অভিবাসনের অনুকল্পকে সমর্থন করে না।

তৃতীয়ত, মৃতপ্রায় বদ্বীপে ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের উদ্যোগের সাফল্যকে ইটন খাটো করে দেখেছেন। ১৮৮১ সালের শুমারিতে মুসলমান জনসংখ্যার এলাকাভিত্তিক অবস্থান বিচার করলে বাংলার সক্রিয় ও মৃতপ্রায় বদ্বীপে মুসলমান জনসংখ্যার অংশে কোনও উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলা মৃতপ্রায় বদ্বীপে অবস্থিত। ১৮৮১ সালের শুমারি অনুসারে এ সব জেলার মুসলমান জনসংখ্যা নিম্নরূপ: যশোহরে শতকরা ৬০.৩৬, নদীয়ায় শতকরা ৫৫.৫, মুর্শিদাবাদ শতকরা ৫০.৭ এবং মালদহে শতকরা ৪৬.৩ ভাগ (সারণি-৯ দেখুন)। সক্রিয় বদ্বীপে অবস্থিত খুলনা জেলার মুসলমান জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৫১.৪ ভাগ। অন্যদিকে সক্রিয় বদ্বীপ এলাকার বাইরে অবস্থিত বগুড়া জেলার মুসলমান জনসংখ্যার হার ছিল শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি। ফলে দেখা যায়, সক্রিয় বদ্বীপের নতুন উপনিবেশের মধ্যেই শুধু মুসলমান সংখ্যাধিক্য সীমাবদ্ধ ছিল না।

পরিশেষে, বলা যায় সক্রিয় বদ্বীপে জঙ্গল পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে পীরদের ভূমিকাকে ইটন অতিরঞ্জিত করেছেন। নতুন জেগে-ওঠা জমিতে উপনিবেশ সৃষ্টি ছিল একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। গঙ্গার ধারা পরিবর্তন আর সেই সাথে মুসলমান ধর্ম প্রচারকদের আগমনের বহু পূর্বেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ফরিদপুর শিলালেখে *নাব্যবাকাশিক*-এর উল্লেখ রয়েছে; এটি আক্ষরিকভাবে নতুনভাবে-সৃষ্ট জমি বুঝায়। এই প্রক্রিয়া মুসলমানদের আগমনের পূর্বেও অব্যাহত ছিল। ১৩৪৯-৫০ সালে বাংলায় ভ্রমণকারী একজন চীনা পরিব্রাজক উল্লেখ করেছেন যে, "এখানকার মানুষ-জনের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি তাদের নিজেদেরই গড়া; এর উৎস হচ্ছে কৃষিতে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ। যে সব জমি আগে বন-জঙ্গলে ভরা ছিল তা নিজেদের অবিরাম শ্রমের মাধ্যমে চাষাবাদ করে তারা তা উদ্ধার করেছে' (Ali-তে উদ্ধৃত, ১৯৮৫, খণ্ড-IB, পৃ. ৯৩২)। যেখানে শত শত বছর ধরে নীরবে উপনিবেশ স্থাপনের প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল সেখানে ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে কেন পীরদের নেতৃত্বের প্রয়োজন দেখা দিল তা স্পষ্ট নয়। ইটন ধারণা করে নিয়েছেন যে, পীররা তাঁদের বসতিতে স্থানীয়, ভ্রাম্যমাণ কৃষক এবং জেলে সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করতেন। এ ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে মনে হয়। সক্রিয় বদ্বীপে বহুদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত কৃষি-ব্যবস্থা ছিল। বাংলার জেলে সম্প্রদায় সর্বদাই খণ্ডকালীন কৃষক ছিল। ইবনে বতুতা পূর্ব বাংলায় ভ্রমণ করেছিলেন; তাঁর লেখায়ও স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, এ এলাকা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কৃষকদের দ্বারা আবাদ হত। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল ইটন মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত অভিবাসীদের বাংলায় গভীর-জলের-ধান উৎপাদনকারীদের মধ্যে অগ্রণী বলে চিত্রিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, "হবিগঞ্জ থেকে কয়েক মাইল দূরে পাইল-এ আরেকজন পীরের মাজার অবস্থিত। কথিত আছে, তিনি মধ্যপ্রাচ্য থেকে এদেশে এসেছিলেন এবং স্থানীয় লোক-জনকে ধানচাষের কৌশল এবং ইসলাম ধর্মের মৌলিক আচার-অনুষ্ঠান

শিখিয়েছিলেন" (Eaton, পৃ. ২০৮)। একইভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, শাহ সৈয়দ নাসির আল দীন – যিনি মধ্যপ্রাচ্য থেকে দেশান্তরী হয়ে এসেছিলেন – স্থানীয় জনসাধারণকে জমি সাফ করা ও ধান রোপন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্থানীয় মানুষ-জন এ দেশে হাজার হাজার বছর ধরে জলা জমিতে ধান চাষ করত; মধ্যপ্রাচ্যের অভিবাসীরা এসে তাদেরকে এ ধরনের চাষাবাদের কৌশল শেখাবে তা অত্যন্ত অকল্পনীয় একটি ব্যাপার।

ইটনের অনুকল্প বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাগেরহাট অঞ্চলের খান জাহান আলীর অনন্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বাংলায় পীরদের ভূমিকাকে সাধারণীকরণ করার চেষ্টা করেছেন। খান জাহান আলী উপকূলীয় বন সাফ করেছিলেন। তার জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নততর সাংগঠনিক দক্ষতা ও বিপুল সম্পদ। বাংলা বদ্বীপের অভ্যন্তরে শাল বন ও পাহাড়ী বন পরিষ্কার করার জন্য এই ধরনের সম্পদের প্রয়োজন পড়ত না। খান জাহান আলী ছিলেন একটি ব্যতিক্রম। ১৮শ শতাব্দীর নোয়াখালীর পীর ওমর শাহ ব্যতীত নিম্ন বাংলায় গরান বন পরিষ্কারের উদ্যোগ-গ্রহণকারী অন্য কোনও ঐতিহাসিক পীরের উল্লেখ ইটন করতে পারেননি। মূলত তিনি নির্ভর করেছেন লোক-সাহিত্যের প্রমাণের ওপর। ইটন দেখিয়েছেন যে, নিম্ন বাংলায় জঙ্গল পরিষ্কার করার ব্যাপারে কিছু পীর সক্রিয় ছিলেন। তার অর্থ এই দাঁড়ায় না যে, জঙ্গল পরিষ্কারের উদ্যোগ একমাত্র পীরগণই গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু মুসলমান উভয় প্রকার জমিদারই নিম্নাঞ্চলীয় বাংলায় অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। খুলনা জেলায় বড় ধরনের অভিবাসনের উদ্যোগ নেয়া হয় উনবিংশ শতাব্দীতে; ব্রিটিশ প্রশাসকরাই ছিলেন এর মূল উদ্যোক্তা। বাকেরগঞ্জে চাষাবাদের সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত; মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের উদ্যোক্তাই এতে ভূমিকা রাখে। ফলে, মুসলমান পীরদের উদ্যোগে আকস্মিকভাবে উপনিবেশ স্থাপন কোনও দ্রুতগতি লাভ করেনি। তবে ইটনের বক্তব্য হয়ত ঠিক যে, পূর্ব বাংলায় জঙ্গল পরিষ্কারের 'পর গড়ে-ওঠা নতুন জায়গায় পীরদের দ্বারা নতুন গ্রাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তবে তার মাধ্যমে এটা প্রমাণ হয় না যে, অধিকাংশ নতুন গ্রামই পীরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তদুপরি, পূর্ব বাংলার অধিকাংশ এলাকা খালি জায়গা ছিল না। গঙ্গার ধারা পরিবর্তনের বহু পূর্ব হতেই এ অঞ্চলে মনুষ্য-বসতি ছিল। যদিও প্রতি বছর নতুন বসতি গড়ে উঠছিল তবু সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে নতুন গ্রামের জনসংখ্যার অংশ খুব বেশি না হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে, পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্যকে উদ্যোগী পীরদের কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

সুপ্রসিদ্ধ মাজারসমূহের অবস্থান বিশ্লেষণ করলে (সারণি-১০) স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলায় মুসলমান পীরদের কার্যক্রম শুধু পূর্বাঞ্চলের সক্রিয় বদ্বীপে সীমাবদ্ধ ছিল না। পশ্চিম বাংলার মৃতপ্রায় বদ্বীপেও একই ধরনের ধর্মপ্রচারমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল। পীরদের সাফল্যের মাত্রা অঞ্চলভেদে ছিল ভিন্ন।

পরিশেষে ইটন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ধর্মান্তর ও উপনিবেশনের ক্রম কী ছিল? অভিবাসীরা কি প্রথমে সাফ-করা জমিতে বসতি স্থাপন করেছিল এবং পরবর্তীসময়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিল? নাকি তারা প্রথমে ধর্মান্তরিত হয়ে

পরে বসতি স্থাপন করেছিল? ধর্মান্তর ও উপনিবেশনের মধ্যে সময়ের কি কোনও ব্যবধান ঘটেছিল? দ্বিতীয়ত, ধর্মান্তরের প্রণোদনা কী ছিল তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। স্থানীয় লোকেরা কি অর্থনৈতিক সুবিধা দ্বারা নতুন বসতিতে আকৃষ্ট হয়েছিল না পীরদের আধ্যাত্মিক ভূমিকাই ছিল মূল আকর্ষণ?

ধর্মান্তরের পেছনে শত সহস্র প্রণোদনা কাজ করতে পারে — একেবারে নিরেট বস্তুবাদী আকর্ষণ থেকে মহত্তম উদ্দেশ্য এর পেছনে কাজ করতে পারে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ধর্মান্তরকে দু'ভাগে ভাগ করা চলে: ওপর থেকে ধর্মান্তর ও নিচ থেকে ধর্মান্তর। প্রথম ধরনের ধর্মান্তর হচ্ছে গোষ্ঠী পর্যায়ে ধর্মান্তর এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যক্তিগত ধর্মান্তর। কোনও রাজা, বা গোত্র-নেতৃত্ব, কোনও বিশেষ বর্ণের মানুষ, পেশাজীবী গোষ্ঠী বা কোনও গ্রাম-সমাজ ধর্মান্তরের উদ্যোগ নিতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মান্তর আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং অন্তরের ধর্মীয় চেতনা ও অভিজ্ঞতার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। তবে দলীয় ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে আশু বাধ্যবাধকতা হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক; ব্যক্তিগত ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে তা হয় আধ্যাত্মিক। অবশ্য এ দু'ধরনের ধর্মান্তর আদর্শ অবস্থা মাত্র। বাস্তব জীবনে কোনও ধর্মের প্রসারই পুরোপুরি ওপর থেকে বা সম্পূর্ণ নিচ থেকে ঘটে না। সমস্ত মহান ধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রেই দু'ধরনের ধর্মান্তর ঘটেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মিশ্র প্রণোদনা এর পেছনে কাজ করেছে। তৎসত্ত্বেও কোনও কোনও ধর্মে 'নিচ থেকে ধর্মান্তর' প্রাধান্য বিস্তার করেছে, কোনও কোনও ধর্মে 'ওপর থেকে ধর্মান্তর' মূল পদ্ধতি হিসেবে দেখা দিয়েছে। ধর্মান্তরের সরাসরি প্রমাণের অভাবে কোন্ ধর্মে কোন্ ধারাটি প্রধান তা নির্ণয়ার্থে আমরা ধর্মের প্রসারের গতিকে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। এটিই স্বাভাবিক যে, যে-ধর্মে ওপর থেকে ধর্মান্তরিত মানুষের সংখ্যা বেশি সে-ধর্ম নিচ-থেকে-ধর্মান্তরিত ধর্মের চাইতে বেশি দ্রুত প্রসার লাভ করবে।

দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামের অভিজ্ঞতা রয়েছে ওপর ও নিচ উভয় দিক থেকেই ধর্মান্তরের। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে শক্তিশালী উপজাতীয় সংগঠন ছিল। ফলে, সম্ভবত এ ধরনের অনেক উপজাতি গোষ্ঠীগতভাবে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তবে শক্ত গোষ্ঠীগত প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নতুন ধর্মের প্রসারের জন্য আবশ্যিকভাবে সহায়ক নয়; কখনও কখনও নতুন ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করে। ১৮৩২ সালের দিকে *Islam in India* গ্রন্থের লেখক জাফর শরীফ দিল্লি ও আগ্রায় ইসলাম-ধর্ম প্রচার-প্রসারের ব্যর্থতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে লিখেছেন : "দিল্লি ও আগ্রার মতো রাজকীয় নগরীর চারপাশের এলাকায় খুব বেশি একটা মুসলমানের দেখা মেলে না, কারণ দেশের এ অংশগুলোতে হামলাকারীরা মুখোমুখি হয় জাঠ এবং রাজপুতদের মতো শক্তিশালী হিন্দু উপজাতির; তারা অত্যন্ত রক্ষণশীল, ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক স্তর দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং তা ধর্মান্তরণকে প্রতিহত করেছিল" (১৯৭৫, পৃ. ৩)। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বাসাম-এর মতে "গভীরভাবে প্রোথিত গ্রাম-সমাজের একটি ধারণা অব্যাহতভাবে হিন্দু সংস্কৃতির টিকে থাকার ক্ষেত্রে একটি প্রধান কারণ" (Basham, ১৯৫৯, পৃ. ১৯১)। তিনি আরও দাবি করেছেন যে, সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে, সমাজচ্যুতির কঠোর অনুশাসন-সম্বলিত বর্ণ-প্রথা হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার

ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। গাঙ্গেয় উপত্যকা ও তার বাইরে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা তাই হিন্দু ধর্মের অস্তিত্বের জন্য কোনও বড় ধরনের হুমকি হয়ে ওঠতে পারেনি। গাঙ্গেয় উপত্যকায় ইসলামের প্রসারের ক্ষেত্রে তাই ওপরে অবস্থিত কোনও পার্থিব বা আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষ নয়, বরং তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য গ্রাম-সমাজ সত্যিকার বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রাম-সমাজ একই সাথে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করত; তারাই *সনাতন ধর্মের* সত্যিকার রক্ষা-প্রাচীরের কাজ করেছিল। গ্রাম-সমাজের নেতৃত্ব ছিল উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের হাতে। যে কোনও বিদেশী ধর্ম বর্ণ-প্রথাকে অগ্রাহ্য করলে তা এই সামাজিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিত; এই সামাজিক কাঠামোই ব্রাহ্মণ্যবাদ ও গ্রামীণ নেতৃত্ব কায়েমী স্বার্থবাদকে প্রতিপালন করত। ফলে গ্রামের নেতৃবৃন্দ বিদেশী ধর্মের অনুপ্রবেশকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালাত।

যদিও দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামে গ্রামে মুসলমান ধর্ম-প্রচারকদের ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তি দেখে অনেক হিন্দু ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তবু গ্রামের নেতৃত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে পারেনি। প্রথাগত নেতৃত্বের প্রতি কোনও চ্যালেঞ্জের পরিণাম দাঁড়াত সমাজচ্যুতি। গ্রাম-সমাজ যেখানে শক্তিশালী ছিল সেখানে সমাজচ্যুত মানুষের জীবন ছিল দুর্বিষহ। সমাজচ্যুত ব্যক্তিদের কোনও গ্রামসমাজে গ্রহণ করা হত না । এমনকি গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাওয়াও সহজ ছিল না; কারণ শহরেও বর্ণবাদী গোষ্ঠী ছিল শক্তিশালী। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগতভাবে ধর্মান্তরিত হওয়া সম্ভব ছিল না; ধর্মান্তরণের সবচেয়ে সহজ পথ ছিল পুরো গ্রামের গণ-ধর্মান্তর। পাঞ্জাবের কোনও কোনও এলাকায় কিছু কিছু গণ-ধর্মান্তর ঘটেছিল। এ ধরনের গণ-ধর্মান্তর ছিল সীমিত, কারণ গ্রামের নেতৃবৃন্দের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্তিত্বের উৎস ছিল সনাতন ধর্ম; তা যে-কোনও ধরনের নতুনত্ব বা নতুন ধর্মের বিরোধী ছিল। ফলে, গ্রামাঞ্চলে অনেক হিন্দু নীরবে মুসলমান পীর-দরবেশদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করত; এদের কেউ কেউ পীরদের শিষ্যও হয়েছিল কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি (Titus, ১৯৫৯, পৃ. ১৬০-১৬১)।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলার তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল দুর্বল ও অসংঘবদ্ধ। ইতোমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে, বাংলায় গ্রামীণ সংগঠন ছিল উত্তর ভারতের গ্রামীণ সংগঠন থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন।

বাংলার ভৌত ও সামাজিক অবস্থা তার গ্রামীণ সংগঠনের সংহতিকে দুর্বল করেছিল। নদীময় বাংলায় বন্যামুক্ত ভূমির সরবরাহ ছিল সীমিত; এখানকার অধিকাংশ গ্রামীণ বসতি ছিল ক্ষুদ্র; তা আবার পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণও ছিল না। ফলে, বাংলায় গ্রামীণ সংগঠন ছিল দুর্বল। এ সব সংগঠন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক একক হিসেবে কাজ করত না। দমন-নিপীড়নের জন্য সীমিত ক্ষমতাধারী নেহায়েৎ সামাজিক সংগঠন ছিল এগুলো। বাংলার গ্রামে সমাজচ্যুতি ছিল দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে কম মাত্রায় দুর্বিষহ। বাংলায় সমাজচ্যুত পরিবার সহজেই গ্রামের বাইরে নতুন বাড়ি-ঘর তৈরি করতে পারত; বাড়ি তৈরির জন্য মাটি কেটে জমি উঁচু করার ফলে পুকুর সৃষ্টি হত; তা থেকে তারা নিজস্ব পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারত। বাংলায়

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে অব্যাহতভাবে অভিবাসী আগমনের ফলে বাংলার সামাজিক পরিবেশে গ্রামীণ সংগঠনের কর্তৃত্ব আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমগ্র বাংলা: গ্রামীণ বসতির ধরন এক ছিল না। বাংলায় গ্রামীণ সংগঠনের আনুষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার মাত্রা ক্রমান্বয়ে পশ্চিমাঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে ক্ষীণ হয়ে আসে। ১৮৭২ সালের জরিপে ব্রিটিশ প্রশাসকবৃন্দ প্রথমে এই প্রবণতাটি লক্ষ করেন; তারা জরিপ পরিচালনার জন্য তৃণমূল সংগঠনের সন্ধান করছিলেন।

বাংলায় গ্রাম সংগঠনের দুর্বলতা দু'দিক থেকে তাৎপর্যময়। প্রথমত, গ্রাম সরকারের শক্তির সাথে বর্ণ-হিন্দুদের শক্তি আনুপাতিক হারে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটত। ব্রাহ্মণরা শক্তিশালী গ্রামীণ-প্রশাসন-সম্বলিত এলাকায় থাকতে পছন্দ করত। আর এ কারণেই পশ্চিম বাংলায় ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব ছিল অধিকতর শক্তিশালী। নীহার রঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন যে, "এই গোঁড়ামীর (ব্রাহ্মণ্যবাদী) শক্ত ঘাঁটি ছিল বাংলা – গঙ্গার পশ্চিমাঞ্চল, প্রায় অজয়ের দক্ষিণ তীর পর্যন্ত; ধরে নেয়া যায় নবদ্বীপ ছিল তার দুর্গ। ব্রাহ্মণ্যবাদী গোঁড়ামীর কেন্দ্র থেকে পূর্ব ও উত্তরে যত দূরে অবস্থান ছিল একেক জায়গার তত স্বল্প ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ। আজকের পরিস্থিতিও তারই অনুরূপ" (Roy, ১৯৪৫, পৃ. ৪৪)। দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ সংগঠনের দুর্বলতা বাংলার অধিকাংশ এলাকায় লাগামহীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম দেয়। ব্যক্তিমানুষের ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার পালনের পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে কোনও কার্যকর বিধি-নিষেধ ছিল না। ভ্রষ্টাচার, বহুমত ও বিচিত্র ধর্মীয় আচার-আচরণের জন্য তা একটি উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলে। বাংলায় হিন্দু গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ইসলামই প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল না। বহুদিন ধরেই বাংলা ছিল *সহজযান, বজ্রযান, কালচক্রযান* - এর মতো গুহ্য মতের লালনক্ষেত্র।

বাংলা অঞ্চলের সামাজিক পরিস্থিতি ইসলাম ধর্মের প্রসারের জন্য সুবিধাজনক ছিল, কারণ বাংলায় ব্যক্তিগতভাবে ধর্মান্তরে কোনও বাধা ছিল না। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত হতে হত এবং এই সমাজচ্যুতির জন্য চড়া দাম দিতে হত। বাংলাদেশ অঞ্চলে গ্রামীণ সংগঠন ছিল দুর্বল; তাই সমাজচ্যুতির জন্য লোক-জনকে খুব একটা মূল্য দিতে হত না। বাংলাদেশের অধিবাসীরা তাই নতুন ধর্মে ধর্মান্তরের বিপত্তির ঝুঁকি নিতে পারত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে যে, ব্রাহ্মণরা যেখানে কম অত্যাচার-নিপীড়ন চালাত সেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের ঘাঁটি এলাকার চাইতে অধিক হারে ব্যক্তিগত ধর্মান্তর ঘটত। অন্য কথায় বলা যায়, সামাজিক জীবনে যদি ব্রাহ্মণদের অপ্রতিরোধ্য কর্তৃত্ব থাকত তা হলে বাংলার আদিবাসীরা এত বিপুল সংখ্যায় ইসলাম ধর্মে গ্রহণ করতে সক্ষম হত না।

লক্ষণীয় যে, একই ধরনের সামাজিক পরিস্থিতিতে যেখানে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরণ সাফল্য লাভ করেছে, খ্রিষ্ট-ধর্ম প্রচারের উদ্যোগ সেখানে ব্যর্থ হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে বাংলায় ইসলাম ও খ্রিষ্ট-ধর্ম প্রচারের উদ্যোগের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। মুসলমানদের মতো খ্রিষ্টানরাও রাষ্ট্র-যন্ত্র দখল করেছিল এবং ব্যাপক ধর্মপ্রচারমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিল। তবে তিনটি কারণে তারা তুলনীয় নয়। প্রথমত, খ্রিষ্ট-ধর্ম বাংলায় এসেছিল আধুনিক পাশ্চাত্যের ধর্ম হিসেবে; অপরদিকে, ইসলাম এসেছিল মধ্যযুগীয় এশিয়া থেকে। দ্বিতীয়টি বাংলার মানুষের কাছে অধিকতর বোধগম্য হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, খ্রিষ্ট-ধর্মে ধর্মান্তরের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ১৫০ বছরেরও কম কালব্যাপী স্থায়ী হয়। অন্যদিকে ইসলামি ধর্মান্তরণ অব্যাহত থাকে চারশ' বছরেরও অধিক কাল ধরে। পরিশেষে, ব্রিটিশ ভারতে খ্রিষ্ট-ধর্মকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় পুনর্জাগরণবাদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছিল; পশ্চিমের রাজনৈতিক আধিপত্য এই পুনর্জাগরণের সূচনা করে।

অবশ্য বাংলা ও ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম ধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে লক্ষণীয় কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার কিছু দ্বীপ ও বাংলা ছিল ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। উভয় এলাকায়ই ইসলামের অভ্যুদয়ের বহু পরে ধর্মান্তরণ শুরু হয়। বাংলায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ধর্মান্তর শুরু হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে; ইন্দোনেশিয়ায় শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। উভয় এলাকায়ই ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরণ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। বাংলায় চারশ' বছরেরও অধিককাল তা অব্যাহত থাকে। ইন্দোনেশিয়ায়ও ধর্মান্তর প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময়ব্যাপী চলতে থাকে, এমনকী ঐ অঞ্চলে ওলন্দাজ শাসন প্রতিষ্ঠার পরও তা অব্যাহত থাকে। তবে ইন্দোনেশিয়া ও বাংলার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। বাংলায় ব্যক্তিগত ধর্মান্তরের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় গোষ্ঠীভিত্তিক ধর্মান্তরই ছিল এর মূল পদ্ধতি। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর শুরু হয় ১৫শ শতাব্দীতে মালাক্কার রাজার ধর্মান্তরের মধ্য দিয়ে। এর পরপরই ধর্মান্তরিত হন মাকাজার, বাতেন ও মাতারাম-এর রাজাগণ। ইন্দোনেশিয়ায় নতুন রাজারা বৈধতা অর্জনের লক্ষ্যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেয় (Ziauddin, ১৯৭০, পৃ. ৫৭-৮৪)। ইন্দোনেশিয়ায় ওপর-থেকে-ধর্মান্তরের অধিকতর প্রভাবের পেছনে দু'টি উপাদান চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, পানির প্রতুলতা বিষয়ে যদিও বাংলার সাথে ইন্দোনেশিয়ার মিল লক্ষ করা যায় তবু ইন্দোনেশিয়ার দলীয় সংহতি ছিল বাংলার চাইতে শক্তিশালী । ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে তা ঘটার কারণ হচ্ছে জলদস্যু ও বন্য প্রাণীর লাগাতার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সামাজিক প্রচেষ্টা। উপরন্তু বিদেশী ধর্মে ধর্মান্তর ইন্দোনেশিয়ায় নতুন নয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ইন্দোনেশিয়ায় রাজ-ধর্ম হিসেবে শুরু হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, বাংলায় ইসলামের প্রসার নিচ থেকে ধর্মান্তরের এক অনন্য উদাহরণ। অসংখ্য মুসলমান ধর্মপ্রচারক চারশ' বছর ধরে অব্যাহতভাবে লোকজনকে ধর্মান্তরিত করেন; তাঁরা ইসলামের বাণীকে বাংলার আনাচে-কানাচে পৌঁছে দেন। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে এই ধরনের ইসলাম প্রচারের কার্যক্রম ব্যর্থ হয়েছিল। ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশ অঞ্চলের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল এ কারণে যে, এ অঞ্চলের সামাজিক আবহ নতুন ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য ছিল অনুকূল। দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ এলাকায় সুদৃঢ় গ্রাম সংগঠন ইসলাম ধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রে দুর্ভেদ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশ অঞ্চলের গ্রাম এলাকায় প্রতিষ্ঠান ছিল দুর্বল ও অকার্যকর। ফলে, এ অঞ্চলে সর্বদাই ভিন্নমত লালিত হয়েছে। অন্তরের ধর্মীয় অনুপ্রেরণা এখানে অধিবাসীদের ব্যক্তিগতভাবে ধর্মান্তরিত হতে উৎসাহিত করেছিল এবং তা-ই নীরবে-নিঃশব্দে বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যার স্ফীতি ঘটিয়েছিল।

অধ্যায় ৫

বিভক্তি ও সংঘাতের গতিধারা

বাংলায় মুসলমান শাসনকালে (১২০৩-১৭৫৭) সমাজে ঐক্য ও বিভক্তি — উভয় শক্তিই দানা বাঁধতে শুরু করে। প্রাকৃতিক সীমার মধ্যে বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ঐক্য-প্রতিষ্ঠা ছিল মুসলমান শাসকদের অবদান। মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা মুসলমান শাসনের ছত্রছায়াতেই প্রস্ফুটিত হয়। পূর্বেকার স্থানীয় শাসকরা বাংলায় সক্রিয়ভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেনি; বাংলার মুসলমান শাসকরা তা করেছিল। ইসলাম ধর্মের প্রসারের সূচনায় চিন্তার জগতে আলোড়ন মাতৃভাষার উন্নয়নে অবদান রেখেছিল। এর মাধ্যমেই প্রতিযোগী বিভিন্ন ধর্মমতের আলোড়নসৃষ্টিকারী বাণী বর্ণপরিচয়শূন্য আমজনতার কাছে তুলে ধরা হয়েছিল।

তবে সাংস্কৃতিক বিভক্তি ও নতুন ধরনের অর্থনৈতিক মেরুকরণের বিভক্তিকারী শক্তি একে অপরকে জোরদার করেছিল; এ সব শক্তিই রাজনৈতিক ও ভাষাগত ঐক্যের ক্ষেত্রে পাল্টা শক্তি হিসেবে কাজ করে। বাংলায় ইসলাম ধর্মই প্রথম বৃহৎ বিদেশী ধর্ম। মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্যে প্রোথিত ইসলাম-ধর্ম শুধু স্থানীয় ও ভিনদেশী বিশ্বাস ও ধর্মাচারের মধ্যেই গভীর পার্থক্য সৃষ্টি করেনি, সেই সাথে ধর্মমতাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস ও আবাসস্থল সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী আবেগেরও সৃষ্টি করেছিল। বাংলায় মুসলমান শাসন তার অর্থনৈতিক জীবনে একটি নতুন মাত্রাও যুক্ত করেছিল। একজন ভারতীয় কবি লিখেছেন "রাজার নেয়া কর হচ্ছে সূর্যের শুষে নেয়া জলীয় বাষ্পের মতো, উর্বরকারী বৃষ্টির মতো তা আবার মাটিতেই ফিরে আসে" (Dutt, ১৯৬৬, খণ্ড-১, পৃ. xxviii)। প্রাক-ইসলামি বাংলা সম্পর্কে এ কথা সত্যি। ক্ষুদ্র অন্তর্বর্তীকাল ছাড়া তখনকার শাসকরা ছিল স্বাধীন। ওপরওয়ালা প্রভুকে তাদের কর দিতে হত না। বাংলায় মুসলমান শাসন উত্তর ভারতে সম্পদ পাচারের একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে। বাংলার অধিকাংশ মুসলমান শাসক ছিল মধ্যপ্রাচ্যের অভিবাসী। তারা কখনও কখনও দিল্লিভিত্তিক সাম্রাজ্যের দালাল হিসেবে কাজ করেছে, আবার কখনও কখনও ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছে। ফলে, মুসলমান শাসন বাংলা থেকে উত্তর ভারতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ পাচার করেছে। বাংলা থেকে একতরফা সম্পদের স্থানান্তর অবশ্য মুসলমান শাসনাবসানের সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়নি। মুসলমান-পরবর্তী বাংলায় নতুন গন্তব্যে অধিক হারে সম্পদ পাচার অব্যাহত থাকে। অর্থনৈতিক ক্ষরণের ধরনের প্রতিটি পরিবর্তনের সাথে যুক্ত হয় নতুন সামাজিক বিন্যাস। নতুন সামাজিক বিন্যাস নতুন ভাবাদর্শগত পরিবর্তন দ্বারা সমর্থিত ও জোরদার হয়। বাংলায় সাংস্কৃতিক বিভক্তি ও মেরুকরণ একে অপরকে জোরদার করে।

মধ্যযুগীয় বাংলায় মুসলমান সমাজের ইসলামিকরণের মাত্রা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এক ঘরানার ঐতিহাসিকবৃন্দ মনে করেন যে, মধ্যযুগের মুসলমানরা ইসলাম ধর্মের মূল নিয়ম-নীতি পালন করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত (Ali, ১৯৮৫, খণ্ড- IB; Rahim, ১৯৬৩, খণ্ড-I)। মুকুন্দরামের লিখা হাসানহাতির মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে এই ঐতিহাসিকগণ দাবি করেন যে, মধ্যযুগের বাংলায় মুসলমানরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব যথাযথ নিয়ম-নীতির মাধ্যমে পালন করত। সমসাময়িক সাহিত্য হতেও দেখা যায় যে, ধর্মীয় নিয়ম-কানুন সম্পর্কে মোল্লারা ভালভাবেই ওয়াকিবহাল ছিল। এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে যাঁরা সমালোচনা করেন তাঁরা দাবি করেন যে, এই ব্যাখ্যায় ধর্মীয় জীবনযাত্রাকে অতিসরলীকরণ করা হয়েছে। এ সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যকে পুরোপুরিভাবে অবহেলা করা হয়েছে। সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য বাংলায় ভিনদেশী ধর্ম-বিশ্বাস ও লোকজ বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিল।

অসীম রায় (১৯৮৩) ও রিচার্ড এম. ইটন (১৯৯৪) ইঙ্গিত করেছেন যে, মধ্যযুগীয় বাংলায় ইসলামিকরণের মাত্রা গতানুগতিক সাহিত্যে অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই অনুকল্পের সমর্থনে দু'ধরনের ঐতিহাসিক সূত্র রয়েছে। প্রথমত, বাংলায় ধর্মীয় ও আধা-ধর্মীয় সাহিত্যের বিপুল এক সম্ভার রয়েছে; যাতে ধর্মের সংমিশ্রণ সম্বলিত একটি সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য অনুরণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ প্রশাসকদের ও একই সাথে উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান মৌলবাদী সংস্কারকদের লেখায় মুসলমানদের জীবনযাত্রায় নিরক্ষর মুসলমান কৃষকদের মধ্যে লোকজ ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে (Ahmed, ১৯৮১, পৃ. ৩৯-৭১)। রায় ও ইটনের মূল সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

১. বাংলায় নব্য ধর্মান্তরিত লোকেরা আধ্যাত্মিকভাবে ইসলামের আদর্শ দ্বারা প্রণোদিত হয়নি। রায়ের ভাষায় বলা যায় : 'দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য জায়গার মতো বাংলায়ও ধর্মান্তরের সাথে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার চাইতে দল-বদলটাই ছিল মুখ্য ব্যাপার'। ইটন যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বাংলার ক্ষেত্রে ধর্মান্তর শব্দটি বিভ্রান্তিকর, কারণ বাংলার মুসলমানরা ধর্মান্তরের মাধ্যমে পুরোপুরিভাবে তাদের ইসলাম-পূর্ব বিশ্বাস পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করেনি। ইটনের ভাষায় বলা যায় : 'সত্যিকার অর্থে সুনির্দিষ্ট ও দুর্ভেদ্য পরিসীমাঘেরা রুদ্ধ পদ্ধতি হিসেবে ইসলামের ধারণা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংস্কারবাদী আন্দোলনের ফসল; অপরদিকে, প্রাক্-আধুনিক যুগের গ্রামীণ বাঙালিদের ক্ষেত্রে অনৈসলামিক ও ইসলামিক – এ দুয়ের ভেদরেখা অনেকটাই রন্ধ্রবহুল, অস্পষ্ট ও পরিবর্তনশীল' (Eaton, ১৯৯৪, পৃ. ২৭৩)।
২. বাংলার মুসলমানরা এককভাবে ইসলাম বা হিন্দু ধর্মের ফসল নয় বরং লোক-সংস্কৃতির ফসল। বাংলার লোকজ ইসলাম-ধর্মের সাথে ইসলামের মৌল নিয়ম-নীতির সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যস্থতাকারী কিছু লোক বাঙালি জনগোষ্ঠীর সামনে ইসলাম ধর্মের স্থানীয় একটি রূপ উপস্থাপন করে। এই প্রক্রিয়ায় আল্লাহকে 'গোসাই', 'প্রভু'

'নিরঞ্জন', 'ঈশ্বর', 'জগৎ-ঈশ্বর' ও 'কর্তা' হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল। *নবী* (আল্লাহ্‌র ওহী গ্রহণকারী) ও *রসুল* (আসমানী কিতাবের প্রাপক) সম্পর্কে ইসলামি ধারণাকে হিন্দু ধর্মের *অবতার*–এর (ঈশ্বরের প্রতিভূ) ধারণার সাথে এক করে দেখার উদ্যোগও নেয়া হয়েছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে উপস্থাপিত ঐতিহাসিক কিংবদন্তি ও সৃষ্টিতত্ত্ব স্থানীয় ঐতিহ্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

৩. রায় এবং ইটন উভয়ই বাংলায় ইসলামিকরণের তিনটি পর্যায় চিহ্নিত করেছেন। রায়-এর মতে প্রথম পর্যায়ে ইসলামিকরণ ধর্মান্তরিত মানুষজনের খাওয়া-দাওয়া ও বিয়ে-শাদী পদ্ধতির পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে গড়ে ওঠে একটি সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য; বহিরাগত মহান ইসলামি ঐতিহ্য ও ভেতরের ক্ষুদে ঐতিহ্যের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সুরাহা হয় তার মাধ্যমে। চূড়ান্ত পর্যায়ের তার সমাপ্তি ঘটে মৌলবাদী পুনর্জাগরণবাদী শক্তির বিজয়ের মধ্য দিয়ে; এই শক্তি ধ্রুপদী ইসলাম-ধর্মের চেতনার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ লোক-ঐতিহ্যের গ্লানিকর প্রভাব দূর করে। ইটন এ সব পর্যায়কে ১. অন্তর্ভুক্তি (inclusion), ২. শনাক্তকরণ (identification), ও ৩. অপসারণ (displacement) বলে অভিহিত করেছেন। অন্তর্ভুক্তি পর্যায়ে স্থানীয় দেব-দেবীর সাথে ইসলামি অতি-মানবিক প্রতিনিধিদের গ্রহণ করে নেয়ার প্রক্রিয়া চলে। শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় ইসলামি ও স্থানীয় অতিমানবীয় প্রতিভূদের সংমিশ্রণ ঘটে সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যে। অপসারণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্থানীয় অতিমানবীয় দেব-দেবীকে হটিয়ে পরিশেষে মৌলবাদী ইসলাম জয়লাভ করে।

রায় ও ইটন প্রণীত বাংলায় ইসলামের সমন্বয়বাদী বহির্দেশীয় ও অন্তর্দেশীয় শক্তির মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়ার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি জোগায়। তবে এ মডেলে অন্তত চারটি মারাত্মক দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, ইসলাম-ধর্মে ধর্মান্তরের গুরুত্বকে এ মতবাদ খাটো করে দেখেছে। শুধু আনুষ্ঠানিক ধর্মান্তরই নয়, মুসলমানের যে কোনও সংস্পর্শেই বর্ণ-মর্যাদার হানি ঘটে। মহান হিন্দু আইন-প্রণেতা মনু-র অনুশাসন হচ্ছে এই যে, যে-লোকের বর্ণচ্যুতি ঘটে তার সাথে কথা বলা, এমনকি ওঠা-বসাও উচিত নয়; উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি তাকে দেয়া যাবে না, সাধারণভাবে তার সাথে কোনও সম্পর্কও রাখা চলবে না। আরও বলা হয়েছে যে, কোনও লোক যদি পতিত কোনও লোকের সাথে সম্পর্ক রাখে তবে সে-ও পতিত বলে গণ্য হবে (Manu, ১৯৯১, পৃ. ২৬৮-২৬৯)। বর্ণচ্যুতির শাস্তি শুধু এ জন্মেই সীমাবদ্ধ নয়, আগামী জন্মেও তা অব্যাহত থাকবে। এমনকি পুণ্য-কর্ম করলেও এজন্মে আপনা-আপনি বর্ণ-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে না। মনুর মতে নিম্ন বর্ণের মানুষ উচ্চ বর্ণে জন্ম নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সাত জন্মের পর (Manu, ১৯৯১, পৃ. ২৪৩)। হিন্দুদের ক্ষেত্রে অন্তরের ধর্মবোধের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের চাইতে সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন গ্রহণ ছিল অধিকতর শক্ত। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পণ্ডিত বুকে যথার্থই বলেছেন, 'সর্বজনীন ধর্মবিশ্বাস হিসাবে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দু ধর্ম দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ইহুদি ধর্মের মতো অত্যন্ত রক্ষণশীল। সত্য বটে, এর কতগুলো মৌলিক ধ্যান-

ধারণা আছে যা সহজে অন্যত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি হিসাবে তা অনেকটা নাৎসীবাদেরই মতো – 'জাতি ও রক্তের বিষয়'; যারা একটি নির্দিষ্ট বর্ণে অন্তর্ভুক্ত শুধু তাদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। এ ধর্মে অন্তর্ভুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে নতুন একটি বর্ণের সদস্য হিসাবে যুক্ত হওয়া। এই অনমনীয় ক্রমবিন্যস্ত কাঠামোতে ঢোকার পর কেউ গভীর বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে পারে, আবার কোনও কিছু বিশ্বাস না করলেও চলে, সেই বিশ্বাসে কম অনুরক্ত হলেও চলে। এতে স্থূলতম পৌত্তলিকতার যেমন স্থান আছে, তেমনি স্থান আছে নাস্তিক্যবাদী দর্শনের ও ভক্তিপূর্ণ আস্তিকতার" (Bouquet, ১৯৬৪, পৃ. ১৪৬)। একই সুরে গেইট ১৯১১ সালের শুমারি প্রতিবেদনে লিখেছেন যে, "হিন্দুদের ধর্ম সম্পর্কে ধারণা অনেকটা আমাদের religion-এর কাছাকাছি; এ শব্দ দ্বারা ধর্মীয় মতবাদের চাইতে বেশি করে আচার-আচরণই বোঝানো হয়। ভারতে ভেদরেখা ধর্মীয় নয়, বরং সামাজিক; এখানে কোনও প্রতিবেশীকে কেউ তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করে না, বরং তাকে বিচার করে তার সামাজিক মর্যাদা ও জীবন-যাপন পদ্ধতির আলোকে। প্রতিবেশীরা কী বিশ্বাস লালন করে সে ব্যাপারে কারও কোন আগ্রহ নেই, বরং সেই প্রতিবেশীর সাথে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে কি না তা বিচার করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দেখা দেয়" (Gait, ১৯১৩, খণ্ড-I, অংশ-১, পৃ. ১১৩)। ধর্মান্তরের কারণে বর্ণচ্যুত হয়ে অবধারিতভাবে যে মূল্য দিতে হয় তা বিবেচনা করলে আধ্যাত্মিক প্রেরণা বা হৃদয়ের সত্যিকার পরিবর্তন ব্যতীত একজন মানুষের পক্ষে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলে মনে হয়। ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নবদীক্ষিতদের জীবনে নিশ্চিতভাবেই নতুন অর্থ ও ভাবাবেগের জন্ম দিয়েছিল। ফলে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর শুধু সামাজিক দলের বদল ঘটিয়েছে, আধ্যাত্মিক কোনও সান্ত্বনা দেয়নি বা আধ্যাত্মিক প্রদীপ্তি ঘটায়নি – একথা ধরে নেয়া ঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত, সমন্বয়বাদী মডেল সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের পাশাপাশি অবস্থিত মৌলবাদী ঐতিহ্যকে পুরোপুরি অবহেলা করেছে। সমন্বয়বাদী মডেলের প্রবক্তাগণ শুধু একটি বিশেষ ধরনের মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ওপর জোর দিয়েছেন। সত্য বটে মধ্যযুগের বাংলায় মুসলমান লেখকদের লেখা-জোখায় সমন্বয়বাদী ধরনের লেখা পরিমাণে ছিল সবচেয়ে বেশি । বাংলা ভাষায় মুসলমানি কিংবদন্তি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পুস্তক রচনা করতে গেলে স্থানীয় ধ্যান-ধারণা ও কথা-বার্তা তাতে ঢুকে পড়বে, এটিই অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবে, সৈয়দ সুলতানের মত সমন্বয়বাদী লেখকও শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ভাবধারার বদলে ইসলামি ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সমন্বয়বাদী সাহিত্য ছাড়াও মধ্যযুগের বাংলায় বিপুল পরিমাণ সাহিত্য রচিত হয়েছিল যা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ক ও উপদেশমূলক আলোচনা সম্বলিত; এ সব রচনা মৌলবাদী ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। এ ধরনের রচনার মধ্যে নিম্নোক্ত লেখাগুলো উল্লেখযোগ্য: আফজাল আলীর *নসিহত,* খন্দকার নসর আল্লাহ খান-এর *মুসার সওয়াল* ও *শরিয়া নামা,* শেখ মুত্তালিব-এর *কিফায়াত,* সৈয়দ আলাওল-এর *তোহফা,* খন্দকার আব্দুল করিম-এর *হাজার মাসায়েল,* শাহ আব্দুল হাকিম-এর *শিহাব,* হায়াত মাহমুদ-এর *হিতজ্ঞান,* ইত্যাদি। পীর-দরবেশদের জীবনীমূলক গ্রন্থাবলিও মৌলবাদী ঐতিহ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। শেখ নুর কুতুব-এর জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কর্মে ও

চিন্তায় কঠোরভাবে *শরিয়ার* অনুশাসন মেনে চলতেন এবং তার ওপর জোর দিতেন। *খিলাফত নামা-র* নির্দেশ অনুসারে নুর কুতুব-ই-আলম-এর নির্বাচিত খলিফাদের শপথ নিতে হত। শপথটি নিম্নরূপ :

> "আমি শেখের (বা পীর) কাছে শপথ করিতেছি যে, যা বেআইনি তা থেকে আমার হস্ত, বদন ও চক্ষুকে বিরত রাখিব; আমার হস্ত ও বদন দ্বারা কাহাকেও আঘাত করিব না; *শরিয়ার* বিরুদ্ধে কোন কাজ করিব না। আমি নিয়মিত নামাজ আদায় করিব এবং অসৎ (লোকজনের) সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিব' (Latif-এ উদ্ধৃত, ১৯৯৩, পৃ. ৭৯)।

তৃতীয়ত, সমন্বয়বাদী ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান মুসলমানদেরকে হিন্দু প্রতিবেশীদের কাছে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য করেনি। মাত্র দু'টি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ছিল যাদের সাধারণ বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। বাউল-রা খুবই সরল সহজ মানুষ; তাদের অন্বেষণ হচ্ছে *মনের মানুষ*। মুসলমান ও হিন্দুদের নিম্ন-বর্গের মধ্য থেকে তাদের উদ্ভব (Sen, ১৯৬১)। আউল চাঁদ ও রাম শরণ পাল গড়ে তুলেছিলেন কর্তাভজার দল। মুসলমান অমুসলমান উভয় ধর্মের লোককে তারা দলে নিয়েছিলেন (Latif, ১৯৯৩)। তবে এ সব ছোট ছোট গোষ্ঠীর অবস্থান ছিল সমাজের মূলধারার বাইরে এবং মুসলমান ও হিন্দু উভয় সমাজের গোঁড়া লোকজন তাদের হেয় চোখেই দেখত।

ষোড়শ শতাব্দীর কবি জয়ানন্দ লিখেছেন, "ব্রাহ্মণ আর যবনদের (মুসলমান) মধ্যে বহু যুগের দ্বন্দ্ব রয়েছে' (লতিফ, ১৯৯৩, পৃ. ৯৫-৯৬)। গোঁড়া হিন্দুরা মুসলমান ও তাদের সহযোগীদের তাৎক্ষণিকভাবে সমাজচ্যুত করত; তারা মুসলমানদের *যবন* এবং *ম্লেচ্ছ* – তথা অস্পৃশ্য বলে গণ্য করত। মুসলমানদের সহযোগী ধর্মচ্যুতদের হিন্দু ধর্মে লোকদের ধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য প্রায়শ নতুন শঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি করা হত। এ ক্ষেত্রে *পীর আলী* ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত উপ-বর্ণ উল্লেখযোগ্য। কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যে, পীর আলী খান নামধারী একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান সামন্ত-প্রভু তার বাড়িতে কিছু গোঁড়া ব্রাহ্মণকে এমন সময় উপস্থিত হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন যখন গরুর মাংস রান্না হচ্ছিল। তিনি এমনভাবে রান্নার আয়োজন করেছিলেন যাতে ব্রাহ্মণরা যে-উঠানে সমবেত হয়েছিল তাতে গরুর মাংস রান্নার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। যেহেতু হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, ঘ্রাণে অর্ধ-ভোজন, তাই সমবেত ব্রাহ্মণরা গরুর মাংস ভক্ষণের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। সামাজিক কলঙ্ক এড়ানোর জন্য কেউ কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে; অন্যান্য সমাজচ্যুত ব্রাহ্মণরা নিজেদের একটি উপ-বর্ণ গড়ে তোলে; তাদেরকে বলা হত *পীর আলী* ব্রাহ্মণ (Rahim, খণ্ড-২, পৃ. ৩১৩-৩১৪)। অনুরূপভাবে ব্রাহ্মণদের *শের-খানী* উপ-বর্ণে অন্তর্ভুক্ত ছিল সম্রাট শের খানের সহযোগীরা। পূর্ব বাংলার *শ্রীমন্ত-খানী* ব্রাহ্মণরা অপবিত্র হয়েছিল মুসলমান সামন্ত প্রভুদের সাথে তাদের সামাজিক সম্পর্কের কারণে। হিন্দুদের শক্ত বর্ণ-প্রথা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে অর্থবহ সংলাপকে ব্যাহত করেছিল। ইসলামি সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরের ক্ষতকে সম্পূর্ণরূপে সারিয়ে তুলতে পারেনি।

পরিশেষে, রায় ও ইটন উভয়েই প্রস্তাব করেছেন যে, স্থানীয় ধর্মবিশ্বাস ও ঐতিহ্যের কারণে বাঙালি মুসলমান সমাজের সূচনাপর্বে অনৈসলামিক আচার-আচরণ,

বিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান ছিল সর্বব্যাপী। তাঁরা দাবি করেছেন যে, ইসলামিকরণের চূড়ান্ত পর্বে অনৈসলামিক আচার-আচরণের উচ্ছেদ ছিল বাংলার ক্ষেত্রে অনন্য। এই তত্ত্বে দু'টি প্রধান দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটে তার জন্মের সাতশ' বছর পর। বাংলায় ইসলামের আগমনের বহু আগেই ইসলামের ধ্রুপদী মতবাদ বিভিন্নভাবে সংশোধিত হয়েছে। অনেক অনৈসলামিক রীতি-নীতি বাংলায় প্রথম সূচিত হয়নি। আলী যথার্থই বলেছেন, "এ ধরনের নব-রীতি ও কুসংস্কারের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যে, বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশই যেহেতু হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং তাদের পূর্বতম অনেক অনৈসলামিক ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার ধরে রেখেছে, তাই এমনটি ঘটেছে। এ ধরনের বক্তব্য স্পষ্টভাবেই অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। একটু গভীরে তাকালে তাৎক্ষণিকভাবেই দেখা যাবে যে, বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে নব-রীতি ও কুসংস্কার লক্ষ করা যায় তা অনেকাংশেই অভিবাসী মুসলমানগণ নিজেরাই বয়ে এনেছেন; অবশ্য অনৈসলামিক বিশ্বাস ও আচার দ্বারা তা অধিকতর পুষ্টিলাভ করেছে" (Ali, ১৯৮৫, পৃ. ৭৯৯-৮০০)। সূফীবাদী আচার-আচরণ, পীরবাদ, মাজার-পূজা ইত্যাদি বাংলায় সূচিত হয়নি; তবে বাংলায় যে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল তার মূল উপাদান ছিল এগুলো। ফলে বলা যায় যে, রায়-ইটন অনুকম্প সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করেছে। দ্বিতীয়ত, বাংলার ইসলামকে পরিশুদ্ধ করেছে যে-পুনর্জাগরণবাদী ও মৌলবাদী আন্দোলন তা কোনওক্রমেই সূচনার দিক থেকে স্থানীয় নয়; এগুলো বাহির থেকে আমদানি করা হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ইসলাম ধর্মে একই ধরনের পুনর্জাগরণবাদী ও মৌলবাদী উদ্‌গীরণ লক্ষ করা যায়। তাদের মধ্যে আরবের *তরিকা-ই-মওয়াহিদুন* (ওহাবী), উত্তর আফ্রিকার *সানুসী*, মিশর ও সিরিয়ার *সালফী*, সুদান ও নাইজেরিয়ার *ফুলানি*, উত্তর ভারতের *তারিকা-ই-মুহাম্মোদিয়া ও আহলে হাদিস* এবং ইন্দোনেশিয়ার *পাদুরি ও মোহাম্মদিয়া* আন্দোলন উল্লেখযোগ্য (Khan, ১৯৯২)। ফলে ইসলামকে পরিশুদ্ধকরণের আন্দোলন বাংলার ক্ষেত্রে অনন্য নয়। সারা বিশ্বেই মুসলমানগণ একই ধরনের ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

বাংলায় মুসলমান সমাজের ইসলামিকরণের মাত্রা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিচার করলে দেখা যাবে যে, মৌলবাদ সমন্বয়বাদের পরে এসেছে এ ধারণা ঠিক নয়। অন্যদিকে বলা যায়, মৌলবাদ ও সমন্বয়বাদ পাশাপাশি অবস্থান করেছে এবং একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। মৌলবাদ বাংলার অনৈসলামিক ভূখণ্ডে সকল স্থানীয় বিষয় – এর ভাষা (ব্যক্তিগত ও বংশীয় নামসহ) ও স্থানীয় সংস্কৃতিকে নিন্দা করে বহির্দেশীয় আনুগত্যকে সমর্থন করেছে। ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম বিশুদ্ধতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগ্রহে ধর্মভীরুদের ইসলামি শিকড় খোঁজার জন্য মধ্য-প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাংলার মুসলমানদের বহির্দেশীয় আনুগত্যের প্রবণতা মুসলমান অভিবাসীদের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিল। তারাই ছিল বাংলার আশরাফ। এই প্রবণতা উর্দু ভাষার মধ্যে লক্ষণীয়; উর্দু ভাষাই ছিল বাংলার আশরাফদের মাতৃভাষা। মুসলমান সংস্কৃতির একজন সংবেদনশীল গবেষক যথার্থই লক্ষ করেছেন যে, "যে দেশ ছেড়ে আসা হয়েছে, কিন্তু যা এখনও স্মৃতিতে দীপ্যমান তার জন্য আকুতি ঝড়ে পড়েছে উর্দু কবিতায়। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় দেশ, যেখানে

গুচ্ছগুচ্ছ গোলাপ দল মেলে; পাখিরা কূজনে রত; লিলি ফুলের গন্ধে আমোদিত বাতাস; বনভূমি জুড়ে টিউলিপ ফুলের আস্তরণ; নাঙ্গা গাছে গাছে লাল পাতারা গজিয়ে ওঠে হেমন্তকে সাজিয়ে তোলে, আর কুলকুল রবে বয়ে-চলা ঝর্ণাধারার পাশে প্রহরীর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সাইপ্রেস গাছের সারি – সেই দেশের সৌন্দর্যই গীত হয়েছে উর্দু কবিতায়" (Qureshi, ১৯৬৫, পৃ. ১২-১৩)। তবে বাংলার অনেক মুসলমানই এ ধরনের অতীতচারিতার অর্থহীনতা অনুধাবন করতে পারত। এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একজন মুসলমান লেখক যুক্তি দেখিয়েছেন, 'আমাদের অনেকেই বিভ্রান্ত। বাংলার আমের বাগানে বা বাঁশ ঝাড়ের নিচে ঘুমুতে গিয়ে তারা এখনও স্বপ্ন দেখে বাগদাদ, বোখারা, কাবুল ও কান্দাহার-এর'(Islam-এ উদ্ধৃত ১৯৭৩, পৃ. ২২৬)। বাঙালি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মুসলমান শাসনের উদ্ভবের পর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অধিকতর তীব্রতা লাভ করেছে।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার মুসলমান সমাজের বিবর্তনকে চারটি সুস্পষ্ট পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্ব স্থায়ী হয় ১২০৪ থেকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত; এর বৈশিষ্ট হচ্ছে অভিবাসী মুসলমান (যাদেরকে *আশরাফ* বলা হয়) এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের জোটের আধিপত্য। দ্বিতীয় পর্বের সময়কাল ১৭৫৭ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশক পর্যন্ত; এ পর্বে ব্রিটিশ শাসক ও উচ্চ বর্ণের হিন্দু অভিজাতদের একটি নতুন জোট দেখা দেয়। তৃতীয় পর্ব শুরু হয় ১৮৭০-এর দিকে; এর বৈশিষ্ট্য হল হিন্দু ও মুসলমান উচ্চকোটির দ্বন্দ্ব এবং এমনকি উচ্চকোটির মুসলমান গোষ্ঠীসমূহের নিজেদের দ্বন্দ্ব। ১৯৪০-এর দশকে যে অন্তিম পর্বের শুরু তা স্থানীয় উচ্চকোটির মুসলমান গোষ্ঠীসমূহের বিজয় প্রত্যক্ষ করে।

মুসলমান শাসনামলে বাংলায় সামাজিক বিন্যাসে অভিবাসী মুসলমানদের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। প্রকৃত প্রস্তাবে ভিনদেশী উৎস, তা যত দূরেরই হোক না কেন, বাংলায় তা *আশরাফ* পরিচিত লাভের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হত। মুসলমান উচ্চকোটির ব্যক্তিরা ছিল মুখ্যত শহরবাসী; তাদের মধ্যে ছিল সরকারি কর্মচারি, শহরবাসী সুফী সাধক, উলেমাবৃন্দ, এবং বিদেশে-জন্মগ্রহণকারী সৈনিক। বাংলায় অভিবাসী উচ্চকোটি মুসলমানের সংখ্যা ছিল খুব নগণ্য। তারা অসংখ্য দল-উপদলে বিভক্ত ছিল; তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সদাব্যস্ত থাকত। সুসংহত গ্রাম সরকারের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় সরকার পরিচালনা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর; স্থানীয় মধ্যস্বত্বভোগীদের কার্যকর সহযোগিতা ছাড়া ভূমি রাজস্ব আদায় করাও ছিল অসাধ্য। মুসলমান শাসকদের পক্ষে হিন্দু মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণ করা ছিল সহজসাধ্য; তারা ছিল রাজনৈতিকভাবে শক্তিহীন। সেজন্যই দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার ভার দেয়া হয়েছিল হিন্দু উচ্চ-বর্ণের হাতে। মুসলমান বিজয়ের পূর্বে কায়স্থরাই ছিল ভূস্বামীদের প্রধান বর্ণ; এ কাজে তাদেরকেই মূলত নতুনভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজলের লেখা থেকে জানা যায়, বাংলার অধিকাংশ জমিদার ছিল কায়স্থ। তাঁর অভিমত হচ্ছে কায়স্থদের মধ্যে সেন, পাল, চন্দ্র, বর্মণ, প্রভৃতি রাজবংশের বংশধররা এসে মিশেছে। এমনকী বহুকাল আগে, পঞ্চদশ শতাব্দীতেও একজন সুফী বিলাপ করেছেন, "লজ্জায় মাথা-হেট-হওয়া পরাজিত কাফেররা তাদের মালিকানাধীন জমি-জমা পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব খাটায়। তাদেরকে আবার ইসলামি দেশে

মুসলমানদের শাসন করার জন্য রাজ-কর্মচারি হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে; মুসলমানদের তারা আদেশ-নির্দেশ করে। এ ধরনের ব্যাপার ঠিক নয়'' (Eaton-এ উদ্ধৃত, ১৯৯৪, পৃ. ৫০)। ফলে, বাংলার মুসলমান শাসন ছিল কার্যত অভিবাসী মুসলমান ও উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের জোট। পুরো মুসলমান শাসনামলেই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের সম্মান দেখানো হত (Rahim, ১৯৬৩)। সুলতানী আমলে (১২০৪-১৫৭৭ খ্রি.) হিন্দু অভিজাত শ্রেণীকে বিদেশে-জন্মগ্রহণকারী মুসলমান অভিজাতকের সমকক্ষ ধরা হত। মোগল শাসনের গোড়ার দিকের বছরগুলোতে প্রশাসনের উঁচু পর্যায় থেকে কিছু হিন্দু কর্মচ্যুত হয়। তবে তৃণমূল পর্যায়ে হিন্দু আধিপত্য বিঘ্নিত হয়নি। মোগল শাসনের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা সর্বোচ্চ স্তরে দৃঢ় অবস্থানে আসীন হয়।

বাংলা থেকে দিল্লিতে সম্পদের উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রবাহের কারণে মুসলমান শাসনামলে অর্থনৈতিক শোষণ তীব্রতর হয়। মনে করা হয় বাংলায় মোগল শাসনের সবচেয়ে গৌরবময় সময়ে কর আর জাতীয় উৎপাদের অনুপাত ছিল শতকরা ৪৩.৮ ভাগ (Khan, ১৯৯২)। এই শোষণ পদ্ধতির প্রধান বলি ছিল স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমান ও নিম্ন বর্ণের হিন্দু। যদিও প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে যে, স্থানীয় মুসলমানদের অধিকাংশই নিম্ন বর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং তারা মুসলমান শাসনের ফলে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে, আদতে তা সত্য নয়। সত্যিকার অর্থে তারা কোনও অর্থনৈতিক সুবিধাই লাভ করেনি। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার পরও তারা পুরনো বংশানুক্রমিক পেশায় নিয়োজিত ছিল। নিম্ন বর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বাংলার মুসলমান অভিজাত শ্রেণীতে গ্রহণ করা হয়নি। স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমান ও নিম্ন বর্ণের হিন্দুর উভয় দলই অভিবাসী মুসলমান অভিজাত ও সহযোগী হিন্দু উচ্চ বর্ণের দল – বিশেষ করে কায়স্থদের জোট কর্তৃক অধিক হারে শোষিত হতে থাকে। দু'কারণে এই তীব্র শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়নি। প্রথমত, শোষিতদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে কোনও কার্যকর সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল না। উত্তর ভারতের *রায়তওয়ারী* গ্রামে প্রায় সময়ই প্রতিরোধ সংগঠিত হত গ্রাম নেতৃত্বের মাধ্যমে (Habib, ১৯৮৫)। একইভাবে উপজাতীয় এলাকায় বাইরের শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটত ঘন ঘন; সেখানে এক ধরনের যৌথ নেতৃত্ব-পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগীয় বাংলায় অর্থনৈতিক শোষণ সাম্প্রদায়িক ধারায় পরিচালিত হত না। অভিবাসী মুসলমান ও উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা যৌথভাবে স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমান ও নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের শোষণ করত। সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের অধীনে তাই প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি।

ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি অনুধাবন করার জন্য আরবি ও ফারসি ভাষা জানা ছিল অপরিহার্য। তাই ইসলামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য স্থানীয় ধর্মান্তরিত লোকজনকে অভিবাসী মুসলমানদের ওপর নির্ভর করতে হত। অবশ্য সকল অভিবাসীই ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিল না। প্রশাসক ও সৈন্যরা মূলত আগ্রহী ছিল বৈষয়িক ব্যাপারে। ওলেমাগণ ইসলামি মৌলবাদের ঐতিহ্য জাগিয়ে রেখেছিল; যদিও স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের অধিকাংশই প্রধানত প্রভাবিত হয়েছিল সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য দ্বারা।

বাংলার সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যক্তি-মানুষের প্রাধান্য। ফলে পল্লীবাসীরা ধর্মীয় ভিন্নমত ও বিরুদ্ধমতে অভ্যস্ত ছিল। হিন্দু ও মুসলমান সমাজ তাই এক ধরনের সমন্বয়বাদী জীবন-যাপন পদ্ধতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। তবে, ইসলামের দ্রুত প্রসার হিন্দু ও মুসলমান উভয় গোষ্ঠীর ধর্মীয় নেতাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। গোঁড়া হিন্দুরা মুসলমান শাসকদের সাথে তাদের রাজনৈতিক সমঝোতা সত্ত্বেও মুসলমানদের ম্লেচ্ছ হিসাবে ঘৃণা করত (Rahim, ১৯৬৩)। মুসলমান ধর্মীয়-নেতৃবৃন্দ স্থানীয় ধর্মান্তরিতদের রীতি-নীতি ও আচার-আচরণকে ঘৃণার চোখে দেখত। অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন মুসলমান ঐতিহাসিক জোর দিয়ে বলেছেন যে, "এ দেশের লোকদের রুচি খারাপ, তাদের আচার-আচরণও হীন, পোষাক-পরিচ্ছদেও তারা হতচ্ছাড়া" (Eaton, ১৯৯৪, পৃ. ১৭০)। মুসলমান অভিজাত ও হিন্দু উচ্চবর্ণের লোকজনের অবজ্ঞার শিকার হয়ে বাংলায় ধর্মান্তরিত মুসলমানরা ধর্ম-বিশ্বাস ও দেশীয় ঐতিহ্যের দ্বৈততার টানাপোড়েনে পড়ে। মানসিক এই দ্বৈতসত্তা লক্ষ করা যায় চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীব্যাপী মধ্যযুগীয় সাহিত্যে। ধর্ম ও ভাষার এই দ্বন্দ্ব শাহ মোহাম্মদ সগীর, মুজ্জাম্মিল, সৈয়দ সুলতান, মোহাম্মদ খান, শেখ মুত্তালিব, আব্দুল হাকিম, আবদুল নবী, প্রমুখের লেখায় পরিদৃশ্যমান। বাংলার মুসলমানদের এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রথম দিকে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল; ব্রিটিশ শাসনের সূচনার পূর্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠেনি।

বাংলায় মুসলমান শাসন মুসলমানদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিভক্ত করেছিল; ব্রিটিশ শাসন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে। বাংলায় প্রথম দিককার ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস মিল মন্তব্য করেছেন যে, "স্বার্থের টানে ন্যায়-বিচার, লাজলজ্জা কীভাবে ভেস্তে যেতে পারে তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে এ ক্ষেত্রে কোম্পানীর কর্মচারিদের আচরণকে উপস্থাপন করা যায়" (Dutt-তে উদ্ধৃত, ১৯৬০, খণ্ড-১, পৃ. ২১)। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোর বিপুল পরিবর্তন মুসলমান অভিজাত শ্রেণীকে সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছিল। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার লক্ষ করেছেন যে, বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে দরিদ্র আশরাফ পরিবার খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর, ব্রিটিশ প্রশাসনের পঁচাত্তর বছর অন্তে সচ্ছল আশরাফ পরিবার ছিল দুর্লভ (Hunter, ১৯৪৫)। ব্রিটিশ রাজের অধীনে আশরাফ মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুর্দশা শ্রেণীচ্যুত মুসলমান অভিজাত ও শোষিত মুসলমান কৃষককুলের মধ্যকার দূরত্বকে কমিয়ে আনে।

বাংলায় ব্রিটিশ শাসন মুসলমানদের মধ্যে মৌলবাদী ও ভিনদেশী আনুগত্যকে জোরদার করেছে তিনভাবে। প্রথমত, মুসলমান শাসনামলে মুসলমান কৃষকদের অর্থনৈতিক শোষণের সাম্প্রদায়িক দিকটি অস্পষ্ট থাকে, কারণ মুসলমান কৃষকদের হিন্দু শোষকরা ছিল মুসলমান শাসকের মধ্যস্বত্বভোগী। বাংলায় মুসলমান শাসনের অবসান মুসলমান কৃষকদেরকে হিন্দু ও খ্রিষ্টান শোষণের মুখে ঠেলে দেয় এবং তা সাম্প্রদায়িকতাকে প্ররোচিত করে। দ্বিতীয়ত, যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপ্লবাত্মক উন্নতি বাংলার মুসলমানদেরকে ইসলাম ধর্মের বৃহত্তর বিশ্বের কাছাকছি নিয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ প্রশাসক এইচ. এইচ. রিজলি এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন এবং যথার্থই

বলেছেন যে, "মেসার্স কুক-এর স্টিমার ও ফিরতি-টিকিটের বদৌলতে এমনকি দূরবর্তী মক্কাও ভারতের ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছাকছি চলে আসে; মুসলমান ধর্মপ্রচারক ও হজ-ফেরত হাজীদের কর্মকাণ্ড পূর্বাঞ্চলীয় বাংলায় মৌলিক ধর্মের নীরব ও অব্যাহত পুনর্জাগরণে তার প্রভাব *ফেলে*" (Risley, ১৯৮১, খণ্ড-I পৃ. xxx.)। উনবিংশ শতাব্দীতে ইসলামি বিশ্ব ছিল উত্তাল। মধ্যপ্রাচ্যে জেগে উঠেছিল *তরিকা-ই-মুওয়াহিদুন* (প্রচলিতভাবে *ওয়াহাবি* আন্দোলন হিসেবে পরিচিত)। সমস্ত ধরনের ধর্মীয় বিকৃতি দূর করার জন্যও এর শপথ ছিল নবী প্রচারিত ধর্মের সহজ-সরল পথে ফিরে আসা। যে মৌলবাদী ধর্মমত ইসলামের বৃহত্তর বিশ্বে ধর্মবিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল হজের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে (মক্কায় হজ পালন) সহজেই তা বাংলায় প্রবেশ করে।

বাংলায় মুসলমানদের মধ্যকার মৌলবাদী অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব আসে মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর নিম্নকোটি থেকে। আহমদ-এর অনুসরণে বলা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মুসলমান অভিজাতদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: ক. মোগল আশরাফ বা পুরোপুরি উর্দুভাষী শহুরে উচ্চকোটি গোষ্ঠী — তারা ছিল অভিবাসীদের বংশধর; খ. মফস্বলী ভদ্রলোক শ্রেণী — তারা মোগল আশরাফদের সমকক্ষ হতে চাইত; জমিদার হিসেবে এবং সামাজিকভাবে উচ্চাসনে অবস্থিত বলে স্থানীয় লোকজনের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল নিবিড়; ফলে তারা স্থানীয় জীবনধারা সম্পর্কে পরিচিত ছিল; গ. আর ছিল কম খানদানি আশরাফ যারা শহুরে অভিবাসীদের বংশধর এবং স্থানীয়ভাবে বসতি স্থাপন করেছিল। ভিনদেশী-উত্তরাধিকার ও বিদেশী ভাষার প্রতি রোমান্টিক আসক্তি সত্ত্বেও এই সব কম-খানদানি আশরাফ বাংলা বলত। হিন্দু মধ্যস্বত্বভোগীদের অর্থনৈতিক আধিপত্যের দ্বারা পঙ্গু হয়ে কম-খানদানি আশরাফরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল মুসলমান কৃষককুলকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার ও ভাবাদর্শের দিক থেকে শুদ্ধ করার।

উনবিংশ শতাব্দীতে হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর ছেলে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফারায়জি আন্দোলন, মীর নিসার আলী ওরফে তীতুমীরের নেতৃত্বে *তরিকা-ই-মোহাম্মদিয়া,* মাওলানা বিলায়েত আলীর নেতৃত্বে *আহলে হাদীস আন্দোলন,* মওলানা কেরামত আলীর নেতৃত্বে *তায়ুনী আন্দোলন* ইসলাম ধর্মের মৌলবাদী ভাবধারা প্রচার করে। ফারায়জি ও তরিকা-ই-মোহাম্মদীয়া সংস্কারকগণ হিন্দু জমিদার ও ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধও গড়ে তোলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে মৌলবাদী সংস্কার আন্দোলনের আশু সাফল্য অবশ্য ছিল খুবই সীমিত। ব্যর্থ অভ্যুত্থান কোনওভাবেই ব্রিটিশ *রাজ* প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কাঠামোকে ভাঙ্গতে পারেনি। আহমেদ মন্তব্য করেছেন, সংস্কারবাদীরা মুসলমান জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশকেই মাত্র তা মৌলবাদী মতবাদে দীক্ষিত করতে সমর্থ হয় (Ahmed, ১৯৮১, পৃ. ৭০)। তৎসত্ত্বেও এ সব আন্দোলনের কারণে বাংলায় মুসলমান সমাজের বিবর্তনে দু'টি সুদূরপ্রসারী পরিণতি ঘটেছিল। প্রথমত, মৌলবাদীদের দ্বারা সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন বাংলার মুসলমানদেরকে প্রথমবারের মত সাম্প্রদায়িক ধারায় সংগঠিত করে। এ সব আন্দোলন বাংলার মুসলমান কৃষককুলের মধ্যে নতুন পরিচিতি ও রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলে। প্রথমবারের মতো এ সব আন্দোলন বিচ্ছিন্ন মুসলমান জনতাকে মৌলবাদী মতাদর্শ দিয়ে সংগঠিত করার সম্ভাবনা প্রমাণ করে।

দ্বিতীয়ত, মৌলবাদী সংস্কার বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ভিনদেশী আনুগত্যকে উদ্দীপিত করে। সংস্কারকগণ স্থানীয় ধর্মাচরণকে অগ্রাহ্য করতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিরাজমান বিশুদ্ধ ধর্মীয় আচার-নীতি গ্রহণ করতে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেন। মুসলমান আশরাফদের দ্বারা সেই ভিনদেশী আনুগত্য জোরদার হয়। রাজনৈতিক কৌশলের ক্ষেত্রে ভিন্নতা সত্ত্বেও মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর সকল অংশই মৌলবাদী ইসলামকে সমর্থন জোগায়। আশরাফদের প্রায় পুরো অংশই ছিল মধ্যপ্রাচ্যের অভিবাসীদের বংশধর। তারা ভিনদেশী আচার-আচরণ রীতি-নীতি ধরে রেখেছিল; তারা কথা বলত উর্দুতে এবং বাংলাকে তারা কখনও মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করেনি। স্থানীয় আচার প্রথা ও রীতি-নীতিকেই শুধু তারা ঘৃণা করত না, দেশীয় ভাষা ও স্থানীয় জীবন-ধারাকেও ঘৃণা করত।

মুসলমান কৃষকদের *ফারায়জি* ও *তরিকা-ই-মোহাম্মদীয়া* অভ্যুত্থান ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় দু'টি সাধারণ কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছিল : নীল বিদ্রোহ (১৮৫৮-৬০), এবং পাবনার দাঙ্গা (১৮৭২-৭৩)। উভয় অভ্যুত্থানে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের কৃষক অংশগ্রহণ করে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সত্যিকার দ্বন্দ্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং জমিদার ও কৃষকদের মধ্যকার বিরোধিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠেনি। এই সমাজের চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সূচিত পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি থেকে।

বাংলার মধ্যশ্রেণী পাশ্চাত্যের মধ্যশ্রেণী থেকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্নতর ছিল। প্রথমত, য়ুরোপে মধ্যশ্রেণী গড়ে উঠেছিল প্রধানত শহর এলাকায়। মধ্যশ্রেণীতে ছিল ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা; তাদের সাথে ছিল বুদ্ধিজীবী ও লেখাপড়া-জানা পেশাজীবী। কৃষি তাদের জীবিকার প্রধান উৎস ছিল না, যদিও তাদের কেউ কেউ মর্যাদা ও জীবনযাপনের জন্য জমিদারি ক্রয় করত। বাংলার মধ্যশ্রেণীর শিকড় ছিল কৃষি ব্যবস্থায় প্রোথিত। দ্বিতীয়ত, য়ুরোপীয় দেশসমূহে মধ্যশ্রেণী ছিল সমরূপী। বিভিন্ন এলাকা, এমনকি বিভিন্ন গোষ্ঠীর অসম অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে বাংলার মধ্যশ্রেণী ছিল অসম; শুধু অন্য শ্রেণীর সাথেই নয়, নিজের শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের সাথেও তারা ছিল দ্বন্দ্বরত। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলায় তিনটি সুস্পষ্ট মধ্যশ্রেণী গড়ে উঠেছিল – হিন্দু ভদ্রলোক, মুসলমান আশরাফ ও মুসলমান জোতদার; তারাই দেশীয় উচ্চকোটির গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল।

যদিও মুসলমান শাসনাধীনে মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে হিন্দু উচ্চ বর্ণ বিশেষ সুবিধা ভোগ করত, তবু বাংলায় হিন্দু মধ্যশ্রেণী মূলত ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ভূমি মালিকানা পদ্ধতির ফসল। উনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে হিন্দু মধ্যশ্রেণী নিজেদেরকে *ভদ্রলোক* বলে চিহ্নিত করত; অন্যদেরকে তারা অবজ্ঞাভরে *ছোটলোক* বলে অভিহিত করত। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ভদ্রলোক সমাজে ছিল পাঁচমিশালি সামাজিক গোত্রসমূহ – যেমন, শহুরে পেশাজীবী, গ্রামীণ জমিদার ও তালুকদার, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী, গতানুগতিক অভিজাত, স্বচ্ছল গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ কেরানিকুল। ব্রুমফিল্ড ভদ্রলোক অভিধাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে : তারা হচ্ছে "সামাজিকভাবে সুবিধাভোগী ও সচেতনভাবে উচ্চ-

স্থানাধিকারী একটি সামাজিক গোষ্ঠী যারা অর্থনৈতিকভাবে ভূমি রাজস্ব, পেশাজীবী ও কেরানি পদের ওপর নির্ভরশীল; উচ্চ বর্ণের বিধি-নিষেধ ও বিদ্যাবুদ্ধির ওপর কর্তৃত্বের মাধ্যমে আম-জনতা থেকে দূরত্বরক্ষাকারী; ভাষা, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের গৌরবে গৌরবান্বিত জটিল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে গোষ্ঠীটি তার গোষ্ঠীগত সংহতি রক্ষা করে চলেছে; সামাজিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক সুযোগের ক্ষেত্রে নিজেকে খাপ খাওয়ানো ও তার সম্প্রসারণের জন্য তারা সদা-প্রস্তুত" (Broomfield, ১৯৬৮, পৃ. ১২-১৩)। সাম্প্রতিক গবেষণায় 'ভদ্রলোক' ধারণার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, কারণ ধারণাটি অস্পষ্ট ও শিথিল। এর মধ্যকার বিভিন্ন গোত্রের অর্থনৈতিক অবস্থার বিপুল ভিন্নতা সত্ত্বেও বাবু হিসাবে পরিচিত বাংলার ভদ্রলোক গোত্রটি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য সংঘবদ্ধভাবে কাজ করেছে। তারা নিজেদের মধ্যে কয়েক ধরনের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। প্রথমত, ভদ্রলোকের মর্যাদা হিন্দু উচ্চ-বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; অন্য কারও তাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। ভদ্রলোকদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য বর্ণের লোক। ১৯২১ সালের শুমারি অনুসারে ভদ্রলোকের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ লাখের মতো (মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৬.৫ ভাগ এবং পুরো হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ)। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ভদ্রলোক কৃষি থেকে তাদের আয়-উপার্জন করত, কিন্তু নিজেরা নিজেদের জমি চাষ করত না। তারা জমির রাজস্ব থেকে পাওয়া আয় দিয়ে জীবন-যাপন করত। ভদ্রলোকেরা ছিল কায়িক শ্রমের প্রতি বিমুখ (Porter, ১৯৩৩, পৃ. ২৮৭-২৮৯)। তৃতীয়ত, ভদ্রলোকেরা ছিল শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটি অভিজাত গোষ্ঠী। ভদ্রলোকেরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। মুসলমান শাসনামলে মুসলমান রাজ-দরবারে কেরানি হিসাবে কাজ করার জন্য হিন্দু অভিজাত শ্রেণী ফারসি ভাষা রপ্ত করেছিল। ক্ষমতার চাবিকাঠি হিসেবে ইংরেজি ভাষার সম্ভাবনাকে তারা ত্বরিৎ চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিল; এটি তাদেরকে সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের সুযোগ এনে দিয়েছিল এবং ফলে ব্রিটিশ রাজের অধীনে তারা কিছুটা কর্তৃত্ব অর্জন করেছিল।

অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রেনেসায় ভদ্রলোকেরা অত্যন্ত সৃজনশীল ভূমিকা পালন করেছিল। যদুনাথ সরকার কাব্যিক ঢং-এ বর্ণনা করেছেন : "পেরিক্লেসের এথেন্স যেমন ছিল গ্রিসের বিদ্যাপীঠ, গ্রিসের চোখ এবং শিল্প ও বাগ্মিতার জননী, তেমনি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বাকি ভারতের জন্য ছিল বাংলা; কিন্তু তার আলো ছিল ধার-করা; চমৎকার কৌশলে সে সেই আলো নিজের করে তুলেছিল। এই নতুন বাংলায় আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি শুভ ও মহান বিষয়ের সূত্রপাত ঘটেছিল যা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলা থেকেই ইংরেজি-শিক্ষিত শিক্ষক এবং য়ুরোপের ভাবাদর্শ ও চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ে; এই চিন্তাধারাই বিহার, ওড়িশা, হিন্দুস্থান ও দক্ষিণাত্যকে আধুনিকীকরণে সহায়তা করে। নতুন সাহিত্যরূপ, ভাষা সংস্কার, সামাজিক পুনর্গঠন, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, ধর্মীয় আন্দোলন, এমনকি নতুন রীতি-নীতি যা বাংলায় জন্মলাভ করে তা একটি ঘূর্ণিকেন্দ্র থেকে ঢেউ-এর মতো প্রাদেশিক সীমানা পেরিয়ে চারিদিকে – ভারতের দূরতম কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ে" (Sarkar, ১৯৭৬, পৃ. ৪৯৮)। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ক্ষুদ্র

সময়ের পরিসরে রেঁনেসা, ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন (reformation) এবং প্রতি-সংস্কার (counter-reformation) আন্দোলন সবই একীভূত করে। বুদ্ধিবৃত্তিক নবজাগরণের অগ্রণী আলো বর্তিকাবাহী ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে রামমোহন রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আর. সি. দত্ত, অক্ষয় কুমার মিত্র, ডি. এল. রায়, গিরীশ চন্দ্র ঘোষ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরা সবাই ছিলেন হিন্দু ভদ্রলোক। ফলে ভদ্রলোকরাই আধুনিক বাংলা সৃষ্টি করেন। এতদসত্ত্বেও ব্রিটিশ রাজ্ বা গ্রামীণ জনগণ কেউই ভদ্রলোকদের সম্মান করত না। সমাজের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং পুরোপুরিভাবে ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন আত্মস্বার্থে নিমগ্ন থেকে বাংলার ভদ্রলোকেরা জাতীয়বাদ থেকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে সরে যায়। চ্যাটার্জী (Chatterjee, ১৯৯৫) যথার্থই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দু ভদ্রলোকদের নেতৃত্বে বাংলায় সমান্তরাল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা গড়ে তোলা হয়েছিল; তারা পুনর্জাগরণবাদী ভাবাদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। গৌরবময় হিন্দু অতীতের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভদ্রলোকেরা মুসলমান শাসনকে কলঙ্কের অপবাদ দেন এবং মুসলমান-পূর্ব শাসকদের অবদানকে রোমান্টিক আলোতে উপস্থাপনের চেষ্টা করে। অরবিন্দ ঘোষ রাজনৈতিক বেদান্ত উপস্থাপন করেন; এতে জাতিকে দেবী মা কালী রূপে চিহ্নিত করা হয়। বিপিন চন্দ্র পাল ও সরলা দেবী, কালী পূজা ও শিবাজী উৎসবের সূচনা করেন। বাংলার সন্ত্রাসবাদীরা এসেছিল মূলত ভদ্রলোক শ্রেণী থেকে; তারা শাক্ত দর্শনের দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছিল। সি. আর. দাশের মতো কিছু কিছু ভদ্রলোক রাজনৈতিক নেতা বৈষ্ণব ভাবধারা এবং রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষা থেকে তাঁদের অনুপ্রেরণা আহরণ করতেন। হিন্দু ভদ্রলোক ও অভদ্র লোকের মূল পার্থক্য নিহিত ছিল সংস্কৃতিতে – ইংরেজি শিক্ষায় লালিত মানসিক বৈশিষ্ট্যে। মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবেই হিন্দুদের চাইতে নিম্ন পর্যায়ের বলে ধরে নেয়া হত। প্রখ্যাত ভদ্রলোক-ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে, হিন্দুস্থান হচ্ছে 'হিন্দুদের বাসভূমি' (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১৩৬)।

বাংলায় দু'টি সুস্পষ্ট মুসলমান মধ্যশ্রেণী ছিল: আশরাফ (সনাতন অভিজাত) এবং শিক্ষিত জোতদারদের নিয়ে গঠিত দেশী ভাষাভাষী উচ্চকোটির ব্যক্তিবর্গ। সনাতন অভিজাতরা ছিল মূলত অভিবাসী মুসলমানদের বংশধর। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে আশরাফের তিনটি অংশ ছিল : উর্দু-ভাষী মোগল আশরাফ, দ্বিভাষাভাষী মফস্বলী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বাংলাভাষী স্বল্প-খানদানী গণ্যমান্য লোক। সাংস্কৃতিকভাবে উর্দুভাষী মোগল আশরাফরাই ছিল আদর্শ ব্যক্তিত্ব এবং নব্য ধারার প্রবর্তক। তারা মূলত পুঞ্জীভূত ছিল ঢাকা, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ ও হুগলির মতো শহরগুলোতে। প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোনও গোষ্ঠীর অনুপস্থিতিতে অভিবাসী আশরাফরাই বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের সহজাত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক উৎসের কারণে বাংলায় উর্দুভাষী মুসলমান আশরাফগণ ছিলেন ধর্মে মৌলবাদী ও রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল। তৎসত্ত্বেও উন্নততর সংস্কৃতি কর্তৃক প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়ায় বিবাদমান দেশী-ভাষাভাষী উচ্চকোটির গোত্রের ওপর তারা তাদের ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দিয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে দেশী-ভাষাভাষী উচ্চকোটির আবির্ভাব ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির আবির্ভাবের কারণে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয় তার ফসল হল এই উচ্চকোটির গোষ্ঠীসমূহ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকগুলোকে পূর্ব বাংলার কৃষকরা পাট রপ্তানিতে লাভবান হয়েছিল (সারণি-১১ দেখুন) :

সারণি-১১
বাংলা থেকে পাট রপ্তানি ১৮৫৫-৫৭ হতে ১৯০৫-১৪

কাল	বাৎসরিক পাট-রপ্তানির গড় পরিমাণ
১৮৫৫-১৮৬৪	০.৮২
১৮৬৪-১৮৭৪	৩.৮৯
১৮৭৫-১৮৮৪	৬.২৮
১৮৮৫-১৮৯৪	৬.২৯
১৮৯৫-১৯০৪	১২.১১
১৯০৫-১৯১৪	১৫.১৪

উৎস : Khan, Akbar Ali, *Some Aspects of Peasant Behaviour in Bengal. A Neo-Classical Analysis*, (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1983, পৃ. ২)।

বাংলার কৃষকদের কাছে পাট নতুন পণ্য ছিল না। তবে এই ফসলের চাষ সীমাবদ্ধ ছিল অভ্যন্তরীণ চাহিদার কারণে। আন্তর্জাতিক বাজারে আকস্মিক পাটের চাহিদা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাংলায় পাট-চাষ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এই বাণিজ্যিক ফসলের রপ্তানি-বৃদ্ধি পূর্ব বাংলার উদ্বৃত্ত কৃষককে প্রভূতভাবে লাভবান করে; পূর্ব বাংলায় মুসলমান কৃষকরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ (Khan, ১৯৮২, পৃ. ১১৭-১১৮)। রেলওয়ে স্থাপনের ফলে পূর্ব বাংলায় কৃষির আরও বাণিজ্যিকীকরণ সম্ভব হয়। এ সব অর্থনৈতিক পরিবর্তন বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নতুন মধ্যশ্রেণীর উদ্ভবে অবদান রাখে। অবশ্য এই শ্রেণীকে কী নামে অভিহিত করা হবে সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ব্রুমফিল্ড এদেরকে 'ভুঁইফোঁড় শ্রেণী' – সাধারণভাবে দরিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে "মোটা বিড়াল" বলে বর্ণনা করেছেন (Broomfield, ১৯৯২, পৃ. ৩৬৫)। হাশমী (১৯৯৪) তাদেরকে জোতদার বলে অভিহিত করেছেন। সাধারণভাবে বলা যায়, বিভিন্ন ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী ও উদ্বৃত্ত কৃষকদের নিয়ে গঠিত ছিল জোতদার শ্রেণী। আইনগতভাবে যে সব জোতদার ৩৩ একরের বেশি জমির মালিক ছিল তাদেরকে ভোগ-দখলকারী বা কোনও মালিক বা জমিদারের অধীনে সরাসরি জমির দখলী-স্বত্বাধিকারী হিসেবে ধরে নেয়া হত। অধিকাংশ জোতদারই জমিদার এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর মধ্যে খাজনা সংগ্রহের মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে কাজ করত। অনেক জোতদার ছিল আবার কুসীদজীবী; তারা সুদে টাকা খাটাত। তাদের কেউ কেউ ছিল ধনী কৃষক; এবং তারা পরিচিত ছিল *তালুকদার, হাওলাদার, লাত্তদার, বসুনিয়া ও মণ্ডল* নামে। হাশমী বর্ণিত জোতদার শ্রেণী বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত। তবে জোতদাররা আপনা-আপনি মধ্যশ্রেণীতে পরিণত

হয়নি। শুধু শিক্ষিত জোতদাররাই কার্যকরভাবে নিজেদেরকে মধ্যশ্রেণীর পরিচিতিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। এই শ্রেণীকে দেশী-ভাষাভাষী উচ্চকোটি হিসেবে বর্ণনা করাই অধিকতর সঙ্গত।

কয়েকভাবে দেশী-ভাষী উচ্চকোটি থেকে বহিরাগত উচ্চকোটির পার্থক্য নির্ণয় করা যায় (Jahan, ১৯৯৪, পৃ. ৫৮-৫৯)। প্রথমত, দেশী-ভাষী উচ্চকোটি গোষ্ঠী স্থানীয় ভাষায় কথা বলে, বহিরাগত উচ্চকোটি গোষ্ঠী কথা বলে বিদেশী ভাষায়। পার্থক্য শুধু ভাষাগত নয়, তাদের সাংস্কৃতিক রীতি-নীতিও ভিন্ন। দেশী-ভাষী উচ্চকোটি যদি বিদেশী ভাষায়ও শিক্ষিত হয় তবু তারা স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুগত থাকে, বিদেশী সংস্কৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে না। দ্বিতীয়ত, দেশী-ভাষী উচ্চকোটি গোত্র সাধারণত গড়ে উঠেছিল গ্রামাঞ্চলে ও ছোট ছোট শহরে। বহিরাগত উচ্চকোটি গোত্র হচ্ছে শহরে-অবস্থানকারী দল। তৃতীয়ত, বহিরাগত উচ্চকোটি গোষ্ঠী সাধারণত দেশী-ভাষী উচ্চকোটি গোষ্ঠী থেকে অধিকতর স্বচ্ছল। দেশী-ভাষী উচ্চকোটির জীবনযাত্রার আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি; অপরদিকে, বহিরাগত উচ্চকোটির ব্যক্তিদের আয়-উপার্জন ছিল শহুরে পেশা বা গ্রামাঞ্চলের খাজনা থেকে। এই শতাব্দীর প্রথম দশকগুলোতে বাংলায় দেশী-ভাষী মুসলমান উচ্চকোটির গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল প্রধানত শিক্ষিত জোতদার ও উদ্বৃত্ত-কৃষকদের সমন্বয়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পূর্ব বাংলায় সম্পন্ন কৃষকদের নতুন সমৃদ্ধি মুসলমান জোতদারদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারকে উৎসাহিত করে। ১৮৮২-৮৩ ও ১৯১২-১৩ সালের পরিসরে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা মোট শতকরা ৫৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়, অপরপক্ষে অমুসলমান ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায় মাত্র শতকরা ২.৯ ভাগ। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রের অনুপাত ১৮৮২-৮৩-র শতকরা ২৭.৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১২-১৩ সালে শতকরা ৪০.৫ ভাগে উন্নীত হয় (সারণি-১২ দেখুন)। গ্রামীণ পূর্ব বাংলায় শিক্ষিত মুসলমানরাই ছিল নব-জাগ্রত দেশী-ভাষী উচ্চকোটির মূল অংশ। সনাতন মুসলমান অভিজাত শ্রেণী (আশরাফ) ও দেশী-ভাষী মুসলমান উচ্চকোটির মধ্যে একটি জটিল ভালবাসা-ঘৃণার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। প্রথমদিকে, দেশী-ভাষী উচ্চকোটি সনাতন অভিজাত শ্রেণীকে নকল করার চেষ্টা করত, যাতে অভিজাত শ্রেণী তাদেরকে দলে গ্রহণ করে। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমান শহুরে আশরাফ পরিবারে বিয়ে করত। যাহোক, আশরাফ ও দেশী-ভাষী উচ্চকোটির আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। নিজেদের সামন্তবাদী অতীতের প্রভাবে আশরাফরা ছিল জমিদারির সমর্থক। হিন্দু জমিদারির কারণে নিজেদের ওপরে ওঠার পথ বন্ধ ছিল বলে দেশী-ভাষী উচ্চকোটি গোষ্ঠী ছিল জমিদারির বিরুদ্ধে। উর্দুভাষী আশরাফরা স্থানীয় রীতি-নীতি ও ধর্মাচরণ-পদ্ধতিকে অবজ্ঞার চোখে দেখত। বাংলাভাষী উচ্চকোটির গোষ্ঠী তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ব্যাপারে ছিল গর্বিত। আশরাফরা ইসলামি মৌলবাদকে সমর্থন করত, দেশী-ভাষী উচ্চকোটি ইসলামি সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের প্রতি ছিল সহানুভূতিশীল। আশরাফরা ছিল ব্রিটিশ-পন্থী। দেশী-ভাষী উচ্চকোটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিল। আশরাফ ও দেশী-ভাষী উচ্চকোটির প্রাথমিক মধুচন্দ্রিমা সত্ত্বেও এ দু উচ্চকোটির গোত্রের মধ্যকার ভিন্নতা জেগে উঠা ছিল অবশ্যম্ভাবী। তারা প্রথম দিকে হিন্দু আধিপত্যের হুমকির মুখে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল;

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫-১১) সময় হিন্দু ভদ্রলোক ও আশরাফদের বিরোধ দেখা দেয়। বঙ্গভঙ্গের সরকারি উদ্দেশ্য ছিল ৭.৮ কোটি জনসংখ্যা ও ১৮৯,০০০ বর্গ মাইলের একটি বিপুল আয়তনের প্রদেশের প্রশাসনকে শক্ত করা। পরোক্ষে বাংলা ভাগের আরেকটি লক্ষ্য ছিল নবজাগ্রত হিন্দু জাতীয়তাবাদকে খর্ব করা। বঙ্গভঙ্গের সময় একজন কর্মকর্তা লিখেছেন : "যুক্ত বাংলা একটি শক্তি, বিভক্ত বাংলা বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে . . . একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভক্তি এবং তার মাধ্যমে আমাদের শাসনের বিরোধী একটি বলিষ্ঠ শক্তিকে দুর্বল করা " (Moon-এ উদ্ধৃত, ১৯৮৯, পৃ. ৯৩৫)।

সারণি- ১২
১৮৮২-৮৩ হতে ১৯১২-১৩ এর পরিসরে মুসলমান ও অমুসলমান ছাত্র-ভর্তির শতকরা বৃদ্ধি

শিক্ষার ধরন	১৮৮২-৮৩ হতে ১৯১২-১৩ সালের মধ্যে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা হিসাবে)	১৮৮২-৮৩ হতে ১৯১২-১৩ সালের মধ্যে অমুসলমান ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা হিসাবে)	১৮৮২-৮৩ সালের মুসলমান ছাত্রের শতকরা হার	১৯১২-১৩ সালে মুসলমান ছাত্রের শতকরা হার
প্রাথমিক	৫৫	-১২.০	২৩.৩	৪৩.২
মধ্যম পর্যায় : স্বদেশী	২৪	-৫৫.০	১৩.৬	৩১.৬
মধ্যম পর্যায় : ইংরেজি	৮৬৯	২৪৭.০	১৩.১	৩৪.৮
উচ্চ বিদ্যালয়	৭২৯	২৯২.০	৮.৮	১৯.৪৫
পেশাজীবী মহাবিদ্যালয়	৭৪৭	৩২২.০	২.২	৫.১৩
সকল প্রকার	৫৫	২.৯	২৭.৬	৪০.৫

সূত্র : Ahmed, Rafiuddin, *The Bengal Muslims, 1871-1906* (New Delhi, Oxford University Press, ১৯৮১), পৃ. ১৫০।

ঢাকার নবাবের নেতৃত্বে মুসলমান মধ্যশ্রেণীগুলো বঙ্গ-ভঙ্গ সমর্থন করেছিল; আশা ছিল ব্রিটিশ *রাজের* অনুগ্রহ লাভ করা যাবে। বিভক্ত বাংলার উভয় অংশে হিন্দু ভদ্রলোকদের প্রভূত অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল; তাদের জন্য বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের বিভক্তি ছিল একটি প্রচণ্ড আঘাত। ভদ্রলোক শ্রেণী জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিল। তারা ধারণা করল যে, তাদের রাজনৈতিক প্রভাবকে খর্ব করার জন্য এটি একটি হীন ষড়যন্ত্র। যে সোনার বাংলা ভদ্রলোক গোষ্ঠীকে পোষণ করেছে তার ঐক্য রক্ষা করা জাতীয়তাবাদীদের জিগির হয়ে উঠল। প্রথম দিকে বঙ্গ-ভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ছিল অহিংস। আন্দোলন যতই গতি পেতে থাকে ততই

বাঙালি মধ্যশ্রেণীর গোপন ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে। প্রচণ্ড আবেগঘন এই পরিস্থিতি তুঙ্গে উঠে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়।

বঙ্গ-ভঙ্গ শেষ পর্যন্ত সবার জন্য পরাজয়ে পর্যবসিত হয়। স্থিতাবস্থা নিয়ে ব্রিটিশ রাজকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় এবং বিভক্তি রদ করতে হয়। মুসলমানদের কাছে এই রদ ছিল একটি প্রচণ্ড আশাভঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে, এর ফলে ব্রিটিশ রাজের সদিচ্ছার প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাসে চিড় ধরে। বাংলার হিন্দু ভদ্রলোকদের জন্য এই রদ ছিল চড়া দামে কেনা বিজয়। সত্যমূর্তির ভাষায় বলা চলে, "বাংলার ভদ্রলোক নেতৃত্বের কথা যদি ধরা যায় তবে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলার এ সব ঘটনার নীট ফলাফল হচ্ছে এই নেতৃত্বের বিচ্ছিন্নতা, তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং রাজনীতিক্ষেত্রে সুবিধাবাদী চরিত্রের উন্মোচন" (Satyamurti, ১৯৭৯, পৃ. ২২৩)।

বঙ্গভঙ্গের সময় বিরোধ ও সহিংসতাপূর্ণ যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তা দু'সম্প্রদায়ের স্বল্পকালস্থায়ী মধুচন্দ্রিমার কালে কিছুটা স্তিমিত থাকে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ- বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের সাথে তুরস্কে খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমান নেতৃবৃন্দের রোমান্টিক উদ্যোগ মিলে যায়। দক্ষিণ এশিয়ায় তা হিন্দু মধ্য-শ্রেণী ও মুসলমান অভিজাত গোষ্ঠীর এক অভিনব জোটের জন্ম দেয়। মুসলমান মধ্যশ্রেণীগুলোর রাজনৈতিক সম্ভাবনা অনুধাবন করার মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯২৩ সালে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য মুসলমান নেতার সাথে দাশ এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তি বাংলা চুক্তি *(বেঙ্গল প্যাক্ট)* নামে পরিচিত। এই চুক্তিতে রাজনীতি ও প্রশাসনে মুসলমানদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার ব্যবস্থা ছিল (Rahim, ১৯৭৯, পৃ. ২৩২-৩৯)। হিন্দু-মুসলমান সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দীপনা ১৯২৫ সালে সি আর. দাশের মৃত্যুর সাথে সাথে ডুবে যায়। এমনকি দাশ যদি বেঁচেও থাকতেন তবু সাম্প্রদায়িক উদ্‌গীরণ নির্বাপিত করার ক্ষেত্রে তিনি সাফল্য লাভ করতেন কি না তা বলা যায় না। বাংলা চুক্তির ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে বিতর্ক ছিল সর্ব-ভারতীয় রাজনীতির মূল সমস্যা। সাম্প্রদায়িক জটিলতার প্রাদেশিক সমাধান সম্ভব ছিল না। উপরন্তু, বাংলার প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের স্বাধীনতা সর্ব-ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে প্রভূতভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার ক্ষমতা অর্থনৈতিক সম্পদ সংগ্রহের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। যে সব বড় বড় ব্যবসায়ী বাংলায় রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থ যোগান দিতে পারত তারা ছিল বাইরের লোক। বাংলায় বড় হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা ছিল গান্ধীর অনুগত এবং মুসলমান অর্থ-যোগানদাররা সমর্থন করত জিন্নাহকে (Gordon, ১৯৭৪)। ফলে সর্ব-ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আশীর্বাদ ছাড়া প্রাদেশিক নেতাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা ছিল কঠিন। স্থানীয় নেতৃত্ব বাস্তবিকপক্ষে নিশ্চল হয়ে পড়ে এবং সর্ব-ভারতীয় রাজনীতির দ্বন্দ্বসমূহ বাংলার নিজস্ব উভয়-সংকটের ওপর আরোপ করা হয়।

হিন্দু ও মুসলমান মধ্য-শ্রেণীর মধুচন্দ্রিমা ছিল ক্ষণস্থায়ী। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাবির্ভাব ঘটে। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মতে বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার সূচনা ঘটে ব্রিটিশ শাসকদের বিভক্তি ও শাসন নীতির কারণে। এই অভিমত জটিল সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা। দক্ষিণ

এশিয়ায় সাম্প্রদায়িক জটিলতা ব্রিটিশ শাসকদের সৃষ্ট নয়, যদিও তারা হয়ত এর অস্তিত্বের সুযোগ গ্রহণ করেছে। ব্রিটিশের এই নীতির বিষয়ে ম্যাক্লেইন-এর পর্যালোচনা যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয় : "সচেতনভাবে কুটিল এমন নীতি করা হয়নি যাকে 'বিভক্তি ও শাসন' নীতি নামে অভিহিত করা চলে। সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়া বা একে নিরুৎসাহিত করার দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণভাবে কোনও নীতি গ্রহণ করা হয়নি। বরং, ব্রিটিশ নীতি প্রতিষ্ঠিত যুক্তিকেই অনুসরণ করেছে – প্রভাবশালী ভারতীয়দের সমর্থনের অনুসন্ধান এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করা। তবে বৈধতা ছিল একটি আপেক্ষিক ধারণা এবং ভারতে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে তা পরিবর্তিত হত" (Mclane, ১৯৯২, পৃ. ৩৪৫)।

খিলাফত-আন্দোলন-পরবর্তী বাংলায় মধ্যশ্রেণীর ভেতরের দু'ধরনের বিরোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রথমত, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে হিন্দু ভদ্রলোক ও মুসলমান মধ্যশ্রেণীর দ্বন্দ্ব ছিল সরাসরি। ১৯৩০-এর দশকের বিশ্বব্যাপী মহা-মন্দার কারণে এই দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। কৃষিজ দ্রব্যের আকস্মিক দরপতন কৃষকদের বাধ্য করে নগদ অর্থে খাজনা পরিশোধ না করতে। খাজনা আদায় প্রচণ্ডভাবে কমে যায়; হিন্দু জমিদার এবং সেইসাথে মধ্যস্বত্বভোগীদের অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক জায়গায় মুসলমান খাতকরা হিন্দু মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করে। এই বিশৃংখল অবস্থা মুসলমান জোতদারদের উৎসাহিত করে গ্রামাঞ্চলে হিন্দু ভদ্রলোকদের হেনস্থা করতে। নব-জাগ্রত বাংলা ভাষাভাষী উচ্চকোটির ব্যক্তিরা দুর্লভ সরকারি চাকুরির জন্য ভদ্রলোকদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে শুরু করে। অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার ফলে একদিকে হিন্দু ভদ্রলোক এবং অন্যদিকে মুসলমান আশরাফ ও বাংলাভাষী মুসলমান উচ্চকোটির মধ্যে সরাসরি দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়।

মুসলমান মধ্যশ্রেণীগুলোর মধ্যেও বিরোধ দেখা দেয়। মুসলমান আশরাফ, বাংলাভাষী উচ্চকোটির গোষ্ঠীসমূহ ও অশিক্ষিত মুসলমান কৃষকদের বাহ্যিক ঐক্য ছিল ভঙ্গুর। এ সব অসম সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থ, ভাবাদর্শগত পরিপ্রেক্ষিত সমধর্মী ছিল না। বাংলার আশরাফরা উর্দুতে কথা বলত; জোতদার ও কৃষকরা উর্দুতে কথা বলত না। দেশী-ভাষী মুসলমান উচ্চকোটি গোষ্ঠী হিন্দু ভদ্রলোকদের শোষণ থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে কৃষি-সংস্কার সমর্থন করত; আশরাফরা ছিল স্থিতাবস্থার ঘোর সমর্থক। আশরাফরা ছিল ইসলামি বিশ্বজনীনতার মোহে বিভোর, দেশীভাষী উচ্চকোটির গোষ্ঠী ও কৃষককুল গভীরভাবে জড়িত ছিল তাদের স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে। গ্রামাঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অভাবে বাংলায় রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন মুসলমান জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত ও পরিচালিত করা সহজ ছিল না। এ ধরনের জনগোষ্ঠীকে জাগ্রত ও উদ্দীপিত করার একমাত্র উপায় ছিল তাদের ধর্মীয় অনুভূতি ও আবেগের কাছে আবেদন করা। এ ধরনের আবেগঘন পরিস্থিতিতে মুসলমান জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক নেতৃত্বে স্থান পেয়ে যায় অভিবাসী আশরাফরা; তারাই ছিল ধর্মীয় নেতৃত্বের একচ্ছত্র অধিকারী। প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলার দেশীভাষী মুসলমান উচ্চকোটি গোষ্ঠী এই আশরাফদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত দুর্বল। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা যতই দ্রুত হারে বাড়তে থাকে ততই সনাতন অভিজাত

শ্রেণী ক্রমাগত অধিক হারে দেশীভাষী মুসলমান উচ্চকোটির গোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মুসলিম লীগের নিজের অভ্যন্তরীণ উপদলীয় কোন্দলের মধ্য দিয়ে।

১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাব ছিল দুই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক বিরোধিতার ফসল। এটি ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের মরিয়া উদ্যোগ। এটি একইসাথে আবার দর-কষাকষির একটি কৌশলও ছিল; কোনও সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক ফর্মুলা ছিল না তাতে। পেন্ডেরেল মুন যথার্থই যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, "এমন প্রমাণ মেলে, জিন্নাহ্ অংশত কৌশলগত চাল হিসাবে পাকিস্তানের দাবি উত্থাপন করেছিলেন; কেন্দ্র এবং প্রদেশসমূহে লীগের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি নিশ্চিত করার মাধ্যমে যাতে কংগ্রেসের কাছ থেকে সাংবিধানিক সুবিধা লাভ করা যায় তা-ই ছিল তার লক্ষ্য। ছয় বছর পর এক পর্যায়ে তিনি এমন কিছু মেনে নিতেও প্রস্তুত ছিলেন যা পুরোপুরি স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্রের চাইতে কিছুটা কম; এটি ইঙ্গিত দেয় যে, ১৯৪০ সালে তিনি এই চরম দাবির প্রতি এমন অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন না যে তা কোনওক্রমেই প্রত্যাহার করা যাবে না। অন্য কিছু মুসলমান নেতা নিশ্চিতভাবেই এর পক্ষে ছিলেন না'' (Moon, ১৯৮৯, পৃ. ১০৯১-১০৯২)। লাহোর প্রস্তাবে দাবি করা হয় যে, ভৌগোলিকভাবে-সংলগ্ন এককগুলোকে অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হউক এবং প্রয়োজনীয় এলাকাগত পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সেগুলোকে এমনভাবে সংগঠিত করা হউক যাতে সংখ্যাগতভাবে মুসলমানগরিষ্ঠ এলাকা যেমন – ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব জোনকে গ্রুপভুক্ত করার মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্রপুঞ্জ সৃষ্টি করা যায়। আরও দাবি ছিল যে, গঠনকর এককসমূহ স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে (Wolpert, ১৯৮৪, পৃ. ১৮৪-১৮৫)। একই দাবি সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনে পুনর্ব্যক্ত করা হয়; পাকিস্তানের দাবিকে বর্ণনা করা হয় এভাবে : "ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব জোনের মতো যে সব এলাকা মুসলমান-প্রধান সে সব ভৌগোলিকভাবেসংলগ্ন এককের প্রয়োজনীয় ভূখণ্ডগত সামঞ্জস্য সাধনের মাধ্যমে সুচিহ্নিত করে পুরোপুরি স্বাধীন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা; এগুলোকে দলগতভাবে সংযুক্ত করে মুসলমানদের স্বাধীন জাতীয় আবাসভূমি হিসেবে স্বাধীন রাষ্ট্রপুঞ্জ গড়ে তোলা; গঠনকারী এককসমূহ সেখানে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে'' (Qureshi, ১৯৬৯, পৃ. ১৩৩)।

মাদ্রাজ প্রস্তাবের মাধ্যমে পুনর্ব্যক্ত লাহোর প্রস্তাব যা দাবি করেছিল সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা হল : দক্ষিণ এশিয়া দু'টি জাতি নয়, বরং বহু জাতি নিয়ে গঠিত। প্রকৃতপক্ষে এই প্রস্তাবে দক্ষিণ এশিয়াকে শুধু দুটি এককে ভাগ করার কথা ছিল না, বরং তা ছিল খণ্ডীকরণের নীল-নকশা। তবে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের কৌশল ইচ্ছাকৃতভাবেই অস্পষ্ট রাখা হয়েছিল। প্রস্তাবের অস্পষ্টতাই প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতাকে সহজ করে তুলেছিল; এই প্রস্তাব সবার জন্য সবকিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বাংলার আশরাফ ও দেশীভাষী উচ্চকোটির গোষ্ঠী সবাই লাহোর প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিল; তবে তাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা সবার কাছে এক ছিল না। সামন্তবাদী গোষ্ঠীর নেতৃত্বে এবং অবাঙালি মুসলমান ব্যবসায়ীদের অর্থসাহায্যে আশরাফরা দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের জন্য একটি রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিল। দেশীভাষী উচ্চকোটির মুসলমানরা দাবি করে যে, লাহোর প্রস্তাবে বাংলাকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে; বাংলার বিভক্তি তাতে প্রস্তাব করা হয়নি (Ahmed, ১৯৭৫, পৃ. ৫৯-৭৩)। চ্যাটার্জী যথার্থই বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান ধারণার অস্পষ্টতাই একে একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী শ্লোগান হিসেবে গড়ে তোলে। বিভিন্ন লোকের কাছে এর অর্থ দাঁড়ায় ভিন্ন ভিন্ন; বলা চলে, জিন্নাহর অনুসারী সংখ্যা যত পাকিস্তানের ভাবমূর্তির সংখ্যাও প্রায় তত" (Chatterjee, ১৯৯৫, পৃ. ২২৬)।

লাহোর প্রস্তাবের পক্ষে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বিপুল সমর্থনের জোয়ার জেগে ওঠে আশরাফ ও দেশীভাষী মুসলমান উচ্চকোটির জোটের মাধ্যমে। ক্রমবর্ধমান হিন্দু জঙ্গি কর্মকাণ্ডের হুমকি ও সেই সাথে লাহোর প্রস্তাবের অস্পষ্টতার মাধ্যমে এই মৈত্রী আরও পাকাপোক্ত হয়; ধরে নেয়া হয়, লাহোর প্রস্তাব সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য। যতদিন পাকিস্তান একটি স্বপ্ন ছিল ততদিন আশরাফ আর দেশীভাষী উচ্চকোটির গোষ্ঠী তাতে বিভোর থেকেছে। আশরাফরা স্বপ্ন দেখত একটি ইসলামি রাষ্ট্রের – যেখানে তারা হিন্দুদের অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবে। দেশীভাষী উচ্চকোটির গোষ্ঠী বিশ্বাস করত, লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়নের ফল হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় বারের বাংলা-ভাগ বাংলাভাষী মুসলমান উচ্চকোটির গোষ্ঠীর জন্য ছিল প্রচণ্ড আঘাত। তাদের দৃষ্টিতে এটি ছিল দুইটি প্রতারণার ফল। তাদের ধারণা জন্মে যে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশের মুসলমানরা যেমন তাদের সাথে প্রতারণা করেছে, বাংলার উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাও তাদের সাথে সমভাবে জালিয়াতি করেছে।

লাহোর প্রস্তাবে যে সাংবিধানিক কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছিল ১৯৪৬ সালে দিল্লি সম্মেলনে জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন আইন-সভার মুসলমান সদস্যদের দ্বারা লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তিত হয় তা। এই সম্মেলন প্রস্তাব করে যে, অনেক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের বদলে ভারতের মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে 'দুটি পাকিস্তান অঞ্চল' গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হউক। এই উদ্যোগের সাংবিধানিক বৈধতা প্রশ্নাতীত নয়। মুসলিম লীগ তার ইশতেহার ও লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে নির্বাচন লড়াই করে। লীগের নীতিতে এই মৌলিক পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের ইশতেহার বা লাহোর প্রস্তাব কোনওটিই আনুষ্ঠনিকভাবে সংশোধন করা হয়নি। লাহোর প্রস্তাবের এ রকম অনানুষ্ঠানিক সংশোধনকে একটি সাময়িক ব্যবস্থা বলে ব্যাখা করা হয়েছিল (Ahmed, ১৯৭৫, পৃ. ১৩৬)। ঐ সময় মনে করা হয়েছিল যে, একবার হিন্দু মুসলমান বিতর্কের নিষ্পত্তি হলে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সাংবিধানিক কাঠামো সহজেই চূড়ান্ত করা যাবে। ১৯৪৭ সালে যে 'কীটদষ্ট ও খণ্ডিত' পাকিস্তানের সৃষ্টি হয় তা বাংলার দেশীভাষী মুসলমান উচ্চকোটির গোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে অনেক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের বদলে এক পাকিস্তানই ছিল শ্রেয়। এ ধরনের খণ্ডীকরণ ঐক্যবদ্ধ ভারতের ভিত্তিকেই দুর্বল করে দিত। যা হোক, বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব হিন্দু

ভদ্রলোকদের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। পরিহাসের ব্যাপার হল, ১৯০৬ সালে যে ভদ্রলোকেরা অসম সাহসিকতার সাথে বাংলা মায়ের বিভক্তিকে রদ করার সংগ্রাম করেছিল তারাই আবার যুক্ত বাংলায় মুসলমান আধিপত্য প্রতিরোধ করার জন্য দ্বিতীয় বিভক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিল। মাউন্টব্যাটেন প্রণীত ভারত বিভাগ পরিকল্পনার অধীনে বাংলার আইন সভার সদস্যদের অধিকার দেয়া হয়েছিল বাংলা-ভাগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার। আইন সভার মুসলমান সদস্যগণ অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ভোট দেন; অন্যদিকে হিন্দু সদস্যগণ বাংলাকে ভাগ করার পক্ষে ভোট দেন (Hashim, ১৯৭৪)। চ্যাটার্জী যথার্থই বলেছেন, বাংলার দ্বিতীয় বিভক্তি শুধু মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদ দ্বারাই নয়, বাংলার হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমেও ত্বরান্বিত হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে যদিও পাকিস্তান সাংবিধানিকভাবে এক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, তবু আদতে তা ছিল দুই দেশ। দুই অংশ পরস্পর থেকে শুধু এক হাজার মাইলের দূরত্বেই অবস্থিত ছিল না, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবেও এই দুই অংশ ছিল ভিন্ন। "অন্তত পূর্ব বাংলার বাঙালিদের ক্ষেত্রে এই দাওয়াই অসুখের চাইতে অধিকতর খারাপ বলে প্রমাণিত হয়েছিল" (Satyamurti, ১৯৭৯, পৃ. ২২৩)। পাকিস্তানের স্বপ্ন বাংলার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল; পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা তাদেরকে বিভক্ত করে। পাকিস্তানে যেহেতু হিন্দু আধিপত্য হ্রাস পায় তাই আশরাফ ও দেশীভাষী উচ্চকোটি গোষ্ঠীর ঐক্য ভেঙ্গে যায়। প্রথম বিরোধ বাধে রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে। কেদুরী মন্তব্য করেছেন, ভাষা হচ্ছে "কোনও একটি গোষ্ঠীর বিশেষ পরিচিতির বাহ্যিক লক্ষণ এবং তার বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ পন্থা " (Kedourie, ১৯৬০, পৃ. ৭১)। ফলে ভাষার প্রশ্নে আশরাফ ও দেশী-ভাষী উচ্চকোটির গোষ্ঠীর বিতর্ক সহিংস বিরোধিতায় পর্যবসিত হয়।

আশরাফরা দাবি করে যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত উর্দু। উর্দু ছিল ভারতের অভিবাসী মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত ভাষা। বাংলা যেহেতু সংস্কৃত ভাষার শাখা-ভাষা তাই আশরাফরা একে হিন্দুদের ভাষা বলে গণ্য করত। দেশীভাষী উচ্চকোটির গোষ্ঠীর ভয় ছিল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু চালু করা হলে তাদের জন্য তা হবে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মহত্যার সামিল। তারা একে বাঙালিদের গর্বিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অপমানজনক পদক্ষেপ বলে গণ্য করে। আশরাফদের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য দেশীভাষী উচ্চকোটির গোষ্ঠী এ সব আশংকাকে জাগিয়ে তোলে। ভাষার প্রশ্নে বিতর্ক নতুন কোনও বিষয় ছিল না। অনেক কাল আগে, সপ্তদশ শতাব্দীতেই কবি আব্দুল হাকিম দাবি করেছিলেন যে, মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে নিয়ে যারা সন্তুষ্ট নয়, তারা যেন এ দেশ ছেড়ে চলে যায়। এমনকি মুসলিম লীগের ভেতরও লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করার আগে ভাষা প্রশ্নে বিতর্ক দেখা দেয়। ১৯৩৬ সালে সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে মুসলিম ভারতের ভাষা হিসেবে উর্দুর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। বাংলার প্রতিনিধিবৃন্দ জোরালোভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। শেষ পর্যন্ত জিন্নাহ-র সরাসরি হস্তক্ষেপে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, "যে সব জায়গার ভাষা উর্দু, সে-সব জায়গায় এর অবাধ উন্নয়ন সাধন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিত, এবং যেখানে এটি প্রধান ভাষা নয় সেখানে

তাকে ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে শেখানোর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত" (Zaheer, ১৯৯৪, পৃ. ২৩)। লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করার পরও এই বিতর্ক অব্যাহত থাকে। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসেই প্রখ্যাত বাংলা ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে দাবি তোলেন (Umar, ১৯৯২, পৃ. ৪২২-৪২৩)। পরিশেষে, ১৯৫০-এর দশকে ভাষা আন্দোলন বাংলার মুসলমানদের মধ্যকার স্থানীয় ও ভিনদেশী আনুগত্যের পরস্পরবিরোধিতার অবসান ঘটায়। ফলাফল দাঁড়ায় – স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি আনুগত্যের দ্ব্যর্থহীন বিজয়। উমর যথার্থই বলেছেন যে, "ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘটে" (Umar, ১৯৬৯, পৃ. ৮-১১)।

পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল অবিভক্ত উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি। ব্রিটিশ ভারতে একই ভাষাভাষী বাঙালি হিন্দুর অর্থনৈতিক শোষণ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বাংলার মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় পরিচিতির ওপর জোর দিয়েছিল। সংযুক্ত পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা একই ধর্মাবলম্বী ভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের অর্থনৈতিক শোষণকে প্রতিরোধ করার জন্য জোরে শোরে তাদের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচিতিতে আস্থা প্রকাশ করে।

যদিও পাকিস্তানে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল তবু হিন্দু-মুসলমান বিরোধ থেকে লব্ধ শিক্ষা কেউ মনে রাখেনি। অবিভক্ত ভারত এবং অবিভক্ত পাকিস্তান – কোথাও প্রধান অর্থনৈতিক শ্রেণী তাদের স্বল্পমেয়াদী অর্থনৈতিক স্বার্থ ত্যাগ করতে পারেনি। ১৯৪৭-৫০ এবং ১৯৬৯-৭০ সালের পরিসরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অনুপাত ২১.৯% থেকে বেড়ে ৬১% তে পৌঁছে।

সারণি- ১৩

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য

		পূর্ব পকিস্তান (১)	পশ্চিম পাকিস্তান (২)	বৈষম্য (২-১)	বৈষম্য অনুপাত (২-১)* ১০০/২
১.	১৯৪৯-৫০	২৮৮	৩৫১	৬৩	২১.৯
২.	১৯৫৪-৫৫	২৯৪	৩৬৫	৭১	২৪.১
৩.	১৯৫৯-৬০	২৭৭	৩৬৭	৯০	৩২.৫
৪.	১৯৬৪-৬৫	৩০৩	৪৪০	১৩৭	৪৫.২
৫.	১৯৬৯-৭০	৩৩১	৫৩৩	২০২	৬১.০

সূত্র : Sobhan, ১৯৯২, পৃ. ৭১৭

বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে রাষ্ট্রের পক্ষপাতমূলক ভূমিকা এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদের পাচারকে সরাসরি দায়ী করা হয়। অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত ও সক্রিয় করার ক্ষেত্রে দেশীভাষী উচ্চকোটির গোষ্ঠী নেতৃত্ব প্রদান করে। পাকিস্তানের প্রভাবশালী

মধ্যশ্রেণীগুলো শোষণমূলক শাসনব্যবস্থার প্রতি তাদের অনড় সমর্থন জুগিয়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের ভাঙ্গনের পথ তৈরি করে।

গত শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানদের রাজনীতির গতিধারা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, জনগণ স্বার্থবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক অধিকাংশ সময়ই বিভ্রান্ত হয়েছে। সময় সময় ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে কাজে লাগিয়েছে। মুসলমান আশরাফরা তাদের নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য মুসলমান জনগোষ্ঠীকে হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেছে। অপরপক্ষে, দেশীভাষী উচ্চকোটির গোষ্ঠীও আশরাফদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তৎসত্ত্বেও বাংলাদেশের বিবর্তনকে শুধু 'হাতিয়ার-স্বরূপ' তত্ত্বের এই সব উপাদানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাবে না। রাজনৈতিক উচ্চকোটির গোষ্ঠী ক্ষমতার বৈধতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশকে আবিষ্কার করা হয়নি। বাংলাদেশের উচ্চকোটির গোষ্ঠীসমূহ যে দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করেছে তা তাদের সৃষ্ট নয়; এ সব দ্বন্দ্ব বাংলাদেশের ইতিহাসে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। শাব্দিকভাবে তাদেরকে হয়তবা 'আদিকালিক শক্তি' বলা যাবে না। তৎসত্ত্বেও বাংলাদেশের জন্মের ক্ষেত্রে কোনও অনন্যতা নেই। রেনান জাতি-রাষ্ট্র সম্পর্কে যা বলেছেন তা সমভাবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রের সত্য : "মহোদয়গণ, মানুষ বিনা প্রস্তুতিতে উপস্থিতমতো কিছু করে না। জাতি, এমনকী ব্যক্তি হচ্ছে দীর্ঘ সময়ের কাজ, উৎসর্গ ও অনুরক্তির চূড়ান্ত ফসল" (Hutchinson & Smith, ১৯৯৪, পৃ. ১৭)।

উপসংহার

আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের ইতিহাসের সাম্প্রতিক পর্যায় স্ববিরোধিতায় ভরা। প্রাচীন এই উপমহাদেশের ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে বিলম্বে-আবির্ভূত বাংলাদেশ পঁচিশ বছরেরও কম সময়ে দু'বার বদল ঘটিয়েছে তার রাষ্ট্র-সত্তা। ইতিহাসের স্রোতের আবর্তে তার সত্তা ঢাকা পড়ে ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এতদঞ্চলের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এক সর্বজনীন ধর্মবিশ্বাস এবং স্বদেশভূমির প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যের টানাপড়েনের তীব্র মর্মবেদনা ভোগ করেছে। তাড়াহুড়ো করে চিহ্নিত, অযৌক্তিক এক সীমান্তরেখা একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও ভাষাভাষী অঞ্চলকে বিভক্ত করেছে। ১৯৪৭ সালের দ্বিতীয় বিভক্তির আগে বাংলাদেশের অনুরূপ কোনও ঐতিহাসিক এককের অস্তিত্ব ছিল না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যাকে জাতীয়তাবাদের 'হাতিয়ার-স্বরূপ' তত্ত্ব বলেন তার ফলাফল হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে তার রাজনৈতিক পরিচিতি হিন্দু *ভদ্রলোক*, মুসলমান *আশরাফ* ও দেশী-ভাষী মুসলমান উচ্চকোটির গোষ্ঠীসমূহের ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব-বিরোধের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে। প্রায়শই বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশ হচ্ছে ক্ষমতা-বৈধকরণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক উচ্চকোটির গোষ্ঠীসমূহের একটি উদ্ভাবন। বাংলাদেশের ইতিহাসের বিশ্লেষণ হতে দেখা যায়, বাংলাদেশের সত্তার অনুসন্ধানের পেছনে অন্তর্নিহিত শক্তি অনেক গভীরে প্রোথিত। রাজনৈতিক উচ্চকোটির গোষ্ঠীরা শূন্য থেকে নতুন একটি জাতির জন্ম দেয়নি; বড়জোর তারা জাতিসত্তাব প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে।

যদিও বাংলাদেশ একটি সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক অঞ্চল নয়, তবু প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার অবস্থান হচ্ছে সুচিহ্নিত একটি অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে। বাংলাদেশ অঞ্চলের গ্রামীণ বসতির তৃণমূল প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন। যথার্থই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের গ্রাম মরীচিকাসম। এক শতাব্দীর অধিককাল ধরে শুমারি পরিচালনা করা সত্ত্বেও এখনও বাংলাদেশের গ্রামের সংখ্যা অজ্ঞাত। সত্যিকার অর্থে, এই অঞ্চলে গ্রামের সংজ্ঞা নিয়ে কোনও ঐকমত্য নেই। উত্তর ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে গ্রাম ছিল সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক একক; এতে ছিল চিরাচরিত গ্রাম-কর্মচারি, স্বয়ম্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং এক প্রাণোচ্ছল সামাজিক সত্তা। যদিও সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণা দক্ষিণ এশিয়ার গ্রাম-সমাজের রোমান্টিক ভাবমূর্তি – 'ক্ষুদে প্রজাতন্ত্র'-কে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করেছে, তবু দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ এলাকায় গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে। প্রতিতুলনায়, বাংলাদেশ অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামীণ বসতি সুনির্দিষ্ট কোনও প্রশাসনিক একক, এমনকি স্বয়ম্ভর অর্থনৈতিক এককও ছিল না। বড়জোর এগুলো ছিল সামাজিক সত্তা। নৃতাত্ত্বিকগণ গ্রামকে মোটা দাগে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন : প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-

সংঘবদ্ধ গ্রাম ও উন্মুক্ত গ্রাম। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রাম ছিল বদ্ধ সংগঠন, তাতে এক ধরনের যৌথ দায়িত্বের ব্যবস্থা ছিল। উন্মুক্ত গ্রামে কোনও যৌথ দায়িত্ব ছিল না; সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকত। বাংলাদেশ অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রাম ছিল উন্মুক্ত; অপরপক্ষে পশ্চিম বাংলার কিছু অংশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশের অধিকাংশ গ্রাম ছিল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ। তিন ধরনের প্রমাণ রয়েছে যার মাধ্যমে ইঙ্গিত মেলে, বাংলাদেশে গ্রামীণ বসতি শুধু উত্তর ভারত ও দক্ষিণাত্যই নয়, পশ্চিম বাংলার অনেক এলাকার বসতি থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। প্রথমত, বাংলাদেশ অঞ্চলের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রামের ভৌত বিন্যাস পশ্চিম বাংলা ও উত্তর ভারতের গ্রাম থেকে ভিন্নতর ছিল। বাংলাদেশে অধিকাংশ গ্রামের বসতি রেখাসদৃশ ও ছড়ানো-ছিটানো। ফলে এ ধরনের গ্রামের সীমানা চিহ্নিত করা কঠিন। পশ্চিম বাংলা ও উত্তর ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রাম ছিল কেন্দ্র-ঘেরা; সে সব গ্রামে ঘরবাড়ি ছিল একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রকে ঘিরে। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রাম বাংলাদেশ অঞ্চলের গ্রাম থেকে বড় ও অধিকতর জনবহুল ছিল। পরিশেষে, গত একশ বছরের শুমারি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে গ্রাম-সরকারের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু বাংলাদেশ অঞ্চলে তা ছিল কার্যত অস্তিত্বহীন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য দুটি সতর্কবাণী যুক্ত করা দরকার। প্রথমত, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রাম ও উন্মুক্ত গ্রামের মধ্যে পার্থক্য সর্বদা মৌলিক গুণগত নয় বরং মাত্রাগত। প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার মাত্রা বিভিন্ন গ্রামে ভিন্নতর হয়। দ্বিতীয়ত, কোনও একটি এলাকায় সকল গ্রামীণ বসতি সমরূপ না-ও হতে পারে। এমনকি একই অঞ্চলে কয়েকটি গ্রামের কাঠামো সাধারণ ধরন থেকে ভিন্ন হতে পারে।

গ্রামীণ বসতির কাঠামো নির্ণয় সম্পর্কিত নৃতাত্ত্বিক সাহিত্যে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ ধরনের নির্ণায়ক অঞ্চলভেদে ভিন্ন হতে পারে, এমনকি একই অঞ্চলের মধ্যেও তার ভিন্নতা থাকতে পারে। প্রাকৃতিক অবস্থার সামান্য তারতম্য গ্রামীণ বসতির কাঠামোকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রামীণ বসতির ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় : ১. বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অস্তিত্ব, ২. বন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা-ব্যবস্থা এবং ৩. গণ অবকাঠামো অথবা সুযোগ-সুবিধা — যেমন, সেচ-ব্যবস্থা। বাংলাদেশ অঞ্চল বিদেশী আক্রমণকারীদের গমনাগমনের সরাসরি পথে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত ছিল না। বাংলাদেশ অঞ্চলের গ্রাম ছিল প্রধানত উন্মুক্ত; এ ধরনের গ্রাম রক্ষা করা আর্থিক দিক থেকে লাভজনক নয়। অধিকন্তু এতদঞ্চলে বিদেশী আক্রমণ ঘটত বিক্ষিপ্তভাবে এবং মাঝে-মধ্যে; উত্তর ভারতের মতো ঘন ঘন আক্রমণ ঘটত না। এ অঞ্চলে বন্য প্রাণীকেও জান-মালের প্রতি মারাত্মক হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। যেখানে মনুষ্য-বসতির জন্য বন্য প্রাণী একটি প্রধান হুমকি সেখানে সাধারণত বাড়ি-ঘর তৈরি করা হয় খুঁটির ওপর। ঐতিহাসিক উৎস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ অঞ্চলে বাড়ি-ঘর তৈরি করা হয়েছে মাটির ওপর। পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ অঞ্চলে পানির প্রতুলতা পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করেছে পরিবারের স্বাধীনতা। দক্ষিণ এশিয়ার

অধিকাংশ অঞ্চলে পানির সম্প্রদায়ভিত্তিক যৌথ উৎস নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। মার্ক্সীয় তত্ত্বে ধারণা করা হয় যে, বৃহৎ আয়তনের সেচ-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নিবিড় সহযোগিতার প্রয়োজন। দক্ষিণ এশিয়ায় শুধু এই বৃহৎ আয়তনের সেচ-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যই নয়, দাক্ষিণাত্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচের উৎস, যেমন গ্রামের পুকুর পরিচালনার জন্যও বহুলাংশে নিবিড় সহযোগিতার প্রয়োজন পড়েছিল। ফলে, বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সুবিধা ছিল সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশে গ্রাম ছিল মূলত সামাজিক সত্তা; এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল দুর্বল। যৌথ চেতনার অভাব ছিল এ সব প্রতিষ্ঠানে।

পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় অধিকাংশ এলাকায় তৃণমূল প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা একইসাথে ছিল আশীর্বাদ ও প্রতিবন্ধকতা। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার সামাজিক জীবনে ব্যক্তির প্রাধান্য তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম দেয়। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ধর্মবিরোধী ভ্রষ্টাচার ও গুহ্য বিশ্বাসের শত ফুল ফোটাতে সাহায্য করে এবং বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে ঋদ্ধ করে। নীহার রঞ্জন রায় যথার্থই জোর দিয়ে 'সনাতনত্বের প্রতি বাঙালীর বিরাগের' কথা বলেছেন (রায়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭১২)। যাকে আর্য-ভারতবর্ষ বলা হয় সেই উত্তর ভারত হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অনুমোদিত ধর্মাচার, আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা এবং সামাজিক আদর্শের প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে অবিচল থেকেছে। প্রতিতুলনায় ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধ গোঁড়ামির সরাসরি বিরুদ্ধচারিতা করে বাংলায় বেশ কিছু বেদবহির্ভূত ধর্ম-বিশ্বাস জন্ম লাভ করে। এ সব ধর্ম-বিশ্বাস প্রকৃতির বিধানে মানুষকে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে মানবতাবাদের ওপরই শুধু আস্থা স্থাপন করেনি, অধিকন্তু সকল ধর্মীয় গুহ্য রহস্য মানব দেহ উদ্ভূত বলে গণ্য করেন। বাংলায় প্রধানত চার ধরনের অতীন্দ্রিয়বাদী বৌদ্ধ ধর্ম ছিল: *বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান* ও *মন্ত্রযান* । এগুলো মূলত প্রভাবিত হয়েছিল হিন্দু দর্শনের যোগ শাখার তান্ত্রিক আচার-পদ্ধতি দ্বারা। অতীন্দ্রিয়বাদী তান্ত্রিক ধর্মমত প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে বাংলা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এ ধরনের অতীন্দ্রিয় ধর্মমতের প্রবক্তাগণ *সিদ্ধ* নামে পরিচিত ছিল; মনে করা হয় যে, তাদের অধিকাংশই জন্মগ্রহণ করেছিল বাংলায়। তান্ত্রিক যোগের একটি রূপ ছিল *নাথবাদ*, উত্তর ও পূর্ব বাংলায় তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। এ সব অতীন্দ্রিয়বাদী প্রতীকী ভাষা বাংলা সাহিত্যের আদিরূপ সৃষ্টি করে; তাদের এই ভাষা *সান্ধ্য-ভাষা* নামে পরিচিত। তারা শুধু সনাতন ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেনি, অধিকন্তু সামাজিক ও বর্ণ বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছিল। বাংলার বাউলরা লোকজ ধর্মাচার ও ধর্মবিশ্বাসের সমন্বয় ঘটিয়েছিল তাদের ধর্মাচরণে। নিম্নোক্ত বাউল গানে বাংলার লোকজ ধর্মের প্রধান মতবাদকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে :

> *আমার নেই গো প্রভু, নিষেধ কোনও, বিধি-বিধান, আচার বিচার*
> *মানুষের তৈরী এই ভেদাভেদে কিবা আমার যায় বা আসে।*
> *অন্তরে যে প্রেম আমার উথলে ওঠে বারে বারে,*
> *তার সুখেই সুখী গো মন, মন যে আমার*
> *প্রেমে তো আর নেই গো বিচ্ছেদ; চিরদিনই বসবাস তার মনে মনে।*
>
> (Sen, ১৯৬১, পৃ. ১০১)

পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার এই সামাজিক আবহে ইসলামের সাফল্য তাই বিস্ময়কর নয়। নিম্ন বাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণ হিসেবে সহজেই দুর্বল সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে দেখা যেতে পারে। বাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্যের বিষয়ে ধ্রুপদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক অনন্যতাকে অগ্রাহ্য করেছে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় ইসলাম ধর্মের অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণ হিসেবে উচ্চ-বর্ণের লোকদের সহিংস অত্যাচারের প্রতি নিম্নবর্ণের ক্ষোভ ও মুসলমান পীর-ফকির ও সুফীদের ধর্মপ্রচারমূলক বিপুল কর্মকাণ্ডকে চিহ্নিত করেছে। তবে এ ধরনের চিরাচরিত ব্যাখ্য-বিশ্লেষণ বাংলায় ইসলাম ধর্মের অনন্য সাফল্যকে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। সংখ্যার দিক থেকে বিপুল, নিচু বর্ণের মানুষজনের প্রতি অত্যাচার-নিপীড়ন কোনওক্রমেই বাংলার ক্ষেত্রে অনন্য নয়। বাস্তবিকপক্ষে, বিহার ও দক্ষিণ ভারতে এ ধরনের অন্যায়-অত্যাচার ছিল অধিকতর তীব্র। বর্ণবৈষম্য সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশের লোকজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। মুসলমান ধর্ম-প্রচারক, পীর-দরবেশদের জোরালো ধর্মপ্রচার উদ্যোগ ও প্রচারণা শুধু বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশেও একই ধরনের ধর্ম প্রচারকরা সক্রিয় ছিলেন। ঐ সব জায়গায় হিন্দু ধর্মের আধিপত্য অবিঘ্নিত থেকেছে। বাংলাদেশ-অঞ্চলে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরণের উদ্যোগ এ জন্য সফল হয়নি যে, মুসলমান সুফীদের আধ্যাত্মিক শক্তির কারণে নিপীড়িত নিম্ন-বর্ণের লোকজন প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিল, বরং বলা চলে, পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় নিম্ন বর্ণের লোকেরা একটি অসংগঠিত সমাজে বাস করত — যা স্বেচ্ছা-ধর্মান্তরের জন্য একটি সুবিধাজনক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এত সর্বব্যাপী ও কার্যকর ছিল যে, সমাজচ্যুত হবার নির্মম পরিণামের মুখে কেউ সনাতন ধর্মমতের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করতে সাহস করত না। আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী হলেও সত্য যে, নিপীড়নের কারণে বাংলায় নিম্ন-বর্ণের মানুষ দলে দলে ধর্মান্তরিত হয়নি। তারা ধর্মান্তরিত হতে পেরেছিল এ কারণে যে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে এ অঞ্চলের উচ্চ-বর্ণের লোকদের অত্যাচার-নিপীড়ন করার ক্ষমতা ছিল কম। যে সব জায়গায় তৃণমূল প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার মাত্রা কম ছিল সেখানে ইসলামের প্রসার সহজতর হয়েছিল। ফলে, বাংলাদেশ-অঞ্চলে মোট জনসংখ্যায় মুসলমানদের হিস্সা এবং গ্রামের উন্মুক্ততার মধ্যে একটা নিবিড় সহ-সম্পর্ক রয়েছে। বাংলায় গ্রামীণ বসতির বিশ্লেষণদৃষ্টে বলা যায় যে, বাংলায় পশ্চিম থেকে পূর্বে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই গ্রামীণ বসতির প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার মাত্রা কমতে থাকে। বাংলায় পশ্চিম থেকে পূর্বে আনুপাতিক হারে মুসলমান জনসংখ্যার অংশ বেড়ে যেতে থাকে।

বাংলার গ্রামীণ বসতিতে তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তার অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছে সুমধুর সঙ্গীতে, ভাবাবেগপূর্ণ গীতিকাব্যে আর হৃদয়-জয়-করা লোক-সাহিত্যে। ৯ম-১২শ শতাব্দীর পরিসরে রচিত চর্যা হতে আধুনিক বাংলা সাহিত্য পর্যন্ত গীতি-কবিতায় ব্যক্তিমানুষের মহত্তম আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে; এগুলোই বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান বিজয়ের পূর্বে যে দুটি কাব্য ও গীতি-কবিতার সংকলন করা হয়েছিল তাদের নাম *সদুক্তি*

কর্ণামিত্র ও *কবিন্দ্রবচন সমুচ্চয়।* এই সংকলনগুলো বাংলা কাব্যের ব্যাপ্তি, গভীরতা ও বৈচিত্র্য তুলে ধরে। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ মহাকাব্য বিদেশী ভাষা হতে অনুবাদ করা হয়েছিল: রায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "গীতিকবিতাতেই যেন বাঙালীর প্রতিভা মুক্তি পাইয়াছে, এবং গীতিকবিতাই বাঙালীর চিত্তে আজও সাড়া জাগায়। মহাকাব্যের বিরাট প্রসার ও গভীর আবর্ত যেন তাহার তত রুচিকর নয়" (রায়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ.৭২০)। বাঙালিদের তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ লোক-সাহিত্যেও পরিদৃষ্ট হয়েছে, বিশেষ করে ময়মনসিংহ গীতিকায়। লোক-সাহিত্যের একজন পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ যথার্থই বলেছেন : "এই সব ময়মনসিংহ গীতিকায় আমি মৌলিক চিন্তার প্রবণতা, ব্যক্তিগত স্বরাজ, এবং নিষ্ক্রিয়তার বিপরীতে কর্মকাণ্ডের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপের অসংখ্য উদাহরণ খুঁজে পেয়েছি" (শহীদুল্লাহ-য় উদ্ধৃত, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫০৯)। বাংলা সাহিত্য বাঙালিদের আনন্দ-বেদনার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছিল; তাদের দৃষ্টিতে তা ছিল গঙ্গার মতো। প্রাক-মুসলমান যুগের একজন কবি লিখেছেন যে, বাংলা ভাষার চর্চা ছিল গঙ্গা-স্নান করার মত পুণ্যের কাজ, কারণ বাংলা ভাষা গঙ্গার মতোই পূর্ণ, গভীর, অর্থপূর্ণ, সংস্কৃতময় ও সৌন্দর্যশালী (রায়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৫২)।

বাঙালিদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এ অঞ্চলের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বিকাশকে তার নিজস্ব খাতে প্রবাহিত করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশের মন্দির ও বিহার-এর তুলনায় বাংলায় মন্দির ছিল সাধারণত ছোট ও সংকীর্ণ। ভুবনেশ্বর, খাজুরাহো অথবা দাক্ষিণাত্যের মন্দির-শহরের মতো বিশাল ও সুউচ্চ কাঠামো নির্মাণ করেনি বাংলা। বাঙালি চিত্রের পটও ছিল সঙ্কীর্ণ। এখানে কোনও অজন্তা বা ইলোরা ছিল না। সারনাথের বুদ্ধ মূর্তি, উদয়গিরির এলিফেন্টা এবং ইলোরার ভাস্কর্য, দাক্ষিণাত্যের নটরাজের মূর্তির মতে বিশাল ভাস্কর্য বাংলায় ছিল না। বাংলার চিত্রে স্থান পেয়েছিল জীবনের বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত ছবি। গভীরভাবে প্রোথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কারণে বাংলার চিত্রকলা ও স্থাপত্যে বিস্তারের অভাব দেখা গেছে। কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিতাই বাঙালিদের শিল্পকর্মে তীব্রতা ও গভীরতা দান করেছে (রায়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭১৯-৭২০)।

বাংলায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অনন্যতা পারিবারিক আইনের নতুন মতবাদের উন্নয়নেও অবদান রেখেছে। বাংলায় উত্তরাধিকার আইনের প্রবক্তা ছিল *দায়ভাগ* ঘরানা; অপরদিকে উত্তর ভারতের বাকি অংশে *মিতক্ষরা* ঘরানার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাংলার সমাজে উচ্চ মাত্রার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অস্তিত্বের কারণে উত্তরাধিকার আইনের অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় *দায়ভাগ* আইনে নারীদের অধিকার প্রদান করা হয়। *দায়ভাগ* আইনে স্বামীর মৃত্যুর পর একজন বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করতে পারে। হিন্দু আইনের অন্যান্য পদ্ধতিতে নারীর বিধিসম্মত উত্তরাধিকারের কোনও অধিকারই স্বীকৃত নয় (রহমান, ১৯৯৪, পৃ. ১১৮)। *মিতক্ষরা* পদ্ধতির আইন সমস্ত সম্পত্তিকে পারিবারিক সম্পত্তি বলে গণ্য করে এবং মালিকের মৃত্যুর আগেও পারিবারিক সম্পত্তির ওপর পুত্র ও পৌত্রাদির অধিকার প্রদান করে। বাংলায় অধিক মাত্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কারণে *দায়ভাগ* ঘরানা আইন প্রণয়ন করেছে যে, পিতার মৃত্যুর পর পুত্ররা সম্পত্তির অধিকারী হবে।

তৃণমূল প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা এবং পরিণামে ব্যক্তির প্রাধান্য কোনও অবিমিশ্র আশীর্বাদ ছিল না। এটি তার রাজনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করেছে। সামাজিক চয়ন সাহিত্যের পরিভাষায় বলা চলে যে, বাংলাদেশ অঞ্চলের রাজনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল বিচ্ছিন্নতার স্ববিরোধিতা। সামাজিক চয়ন তত্ত্বের পূর্ব-অনুমান হচ্ছে -- রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও কার্যকারিতা তাদের সুফল ও ব্যয়ের ওপর নির্ভরশীল। সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং বাইরের ক্ষতিকর প্রভাবকে হ্রাস করার জন্য মানুষের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এ ধরনের চুক্তি-ব্যবস্থা সেখানেই সফল হয় যেখানে সামাজিক চুক্তি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'বিচ্ছিন্নতার স্ববিরেধিতা' সৃষ্টি হয় যেখানে ব্যক্তিরা একে অন্যের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়, যদিও সেখানে এ ধরনের কাজের সামাজিক মূল্য তাদের সম্মিলিত প্রাপ্তির চাইতে অধিক। এ ধরনের স্ববিরোধিতা সেখানেই জন্ম নেয়া সম্ভব যেখানে অংশগ্রহণকারীদের উপলব্ধি জন্মে যে, সামাজিক চুক্তির পরিচালন-ব্যয় অধিক এবং ফাও-সুবিধাভোগ, অর্থাৎ, মূল্য পরিশোধ না করে সুযোগ গ্রহণ সহজ। এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী আধিপত্যের কৌশল অনুসরণ করে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণের জন্য কোনও আপোষ করে না (Sen, ১৯৬৭)।

বিচ্ছিন্নতার স্ববিরোধিতার অস্তিত্বের কারণে বাংলাদেশ-অঞ্চলে তৃণমূল প্রতিষ্ঠান ছিল দুর্বল। পরিণামে টেকসই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকে তা ব্যাহত করেছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত বাংলার রাজনৈতিক বিবর্তনের জরিপ ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলাদেশ অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল ক্ষুদ্র, স্বল্পায়ু এবং অত্যন্ত অস্থিতিশীল। এগুলোকে 'চুক্তিমূলক রাষ্ট্র' বলে বর্ণনা করা যায়। চুক্তিমূলক রাষ্ট্রের পৌনঃপুনিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও প্রাক-মুসলমান আমলে বাঙালিরা রাজনৈতিক নৈরাজ্য প্রতিরোধ করতে পারেনি, এবং সমগ্র অঞ্চলকে সমন্বিত করে স্থায়ী রাজনৈতিক সত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। দিল্লির মুসলমান শাসকবৃন্দ পরিশেষে ওপর থেকে দখলদারি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, দিল্লির মুসলমান শাসকরা উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অধিকতর দক্ষ সমরাস্ত্রের কল্যাণে বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছিল; তবে দখলদারি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এ অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অবসান ঘটাতে পারেনি। মুসলমান বাংলায় দখলদারি রাষ্ট্র নিজের এলাকা থেকে শক্তি সংগ্রহ করত না; এর অস্তিত্ব নির্ভর করত দিল্লিভিত্তিক সাম্রাজ্যের শক্তির ওপর। বাংলায় দখলদারি রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণে জনগণের ওপর দু'ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। প্রথমত, গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অভাবের কারণে মুসলমান শাসকদেরকে রাজস্ব আদায় ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্থানীয় মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভর করতে হত। য়ুরোপের সামন্ত প্রভুদের মতো বাংলার মধ্যস্বত্বভোগীদের উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও অধিকার ছিল না। যে কোনও সময় স্থানীয় প্রতিযোগীদের যে-কাউকে তাদের স্থানে বসিয়ে দেয়া যেত। সে জন্য প্রত্যেক মধ্যস্বত্বভোগীই সম্ভাব্য প্রতিযোগীকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করত যাতে তারা নিজের এলাকায় রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সে অপরিহার্য হয়ে থাকতে পারে। হিন্দু মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্বের এই সংগ্রাম লাগাতার *দলাদলির* জন্ম দেয় (বসু,

১৯৮৬)। পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তনও গ্রাম ও শহর, উভয়াঞ্চলের সামাজিক জীবনে দলাদলির দুষ্ট প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে দলাদলির প্রতি বাঙালি উচ্চকোটির গোষ্ঠীসমূহের প্রীতিকে নীরদ সি. চৌধুরী এভাবে বর্ণনা করেছেন : "বাঙালি, বিশেষ করে কলকাতার বাঙালিরা কেউ কেউ পূর্বেও যেমন মিথ্যাচারিতার নিপুণতম শিল্পী ছিল, এখনও তা-ই আছে। এর এমন কোনও শাখা নেই যা তারা চর্চা করেনি; এমন কোনও কর্মকাণ্ড নেই যাতে তারা প্রবেশ করেনি। এই দলবাজ প্রাণীদের হাতে যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষমতা এসেছে সে জন্য এই মিথ্যাচারিতার সর্বশেষ পরিণাম হতে যাচ্ছে লাগাতার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। প্ল্যাটো বর্ণিত নিশ্চলতা এবং ইবনে খালদুন নির্দেশিত *আসাবিয়া*, বা কৌম-চেতনা এই দলাদলির পরিশীলিত রূপের তুলনায় দুধের বিপরীতে জলের সমতুল্য" (Chaudhuri, ১৯৮৮, পৃ. ৪০১)।

দ্বিতীয়ত, বাংলার মধ্যস্বত্বভোগীরা তাদের প্রভু বা জনগোষ্ঠী কারও প্রতিই অনুগত ছিল না। স্বত্বের সাময়িকত্বের কারণে বাংলার মধ্যস্বত্বভোগীরা স্বল্পতম সময়ে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করত। সে জন্যই বাংলার প্রশাসনে অনুপার্জিত মুনাফা হয়ে উঠেছিল প্রধান লক্ষণ। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম দুঃখ করে লিখেছেন,

"সরকার হইলা কাল খিলভূমি লেখে লাল,
বিনা উপকারে খায় ধুতি
পোদ্দার হইল কাল টাকা আড়াই আনা কম
পায় লভ্য লয় দিন প্রতি।।"

(শহীদুল্লাহ-য় উদ্ধৃত, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৯২।)

সাধারণত ধরে নেয়া হয় যে, ব্রিটিশ প্রশাসন কর্তৃক পাশ্চাত্য পদ্ধতি প্রবর্তনের কারণে মধ্যস্বত্বভোগীদের গজিয়ে ওঠার প্রয়োজন পড়েছিল; তারা বিদেশী শাসক ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মধ্যস্থতা করত। চিরাচরিত সাহিত্যে সাধারণত এ সব মধ্যস্বত্বভোগীকে দোষারোপ করা হয় দুর্নীতি চালু করার জন্য। বাস্তবিকক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগী বা দুর্নীতি ব্রিটিশদের নতুন উদ্ভাবিত পদ্ধতির কারণে জন্মলাভ করেনি; ব্রিটিশ *রাজ* প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই তাদের অস্তিত্ব ছিল।

এই সমীক্ষাটিতে যে ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জি উপস্থাপন করা হয়েছে তা বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে 'হাতিয়ার-স্বরূপ' উপাদানের ব্যাখ্যাকে আংশিকভাবে সমর্থন করে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বাংলাদেশ কোনও সুস্পষ্ট ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বা ভাষাগত একক ছিল না। এতদসত্ত্বেও তার তৃণমূল প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের অন্যান্য অংশ থেকে আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও ধর্মীয় বিবর্তন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে ভিন্নতর। তবে বাংলাদেশের সুস্পষ্ট পরিচিতি দীর্ঘ সময়ব্যাপী সুপ্ত থেকেছে। স্ববিরোধী হলেও সত্যি যে, যে-সব শক্তি নিঃশব্দে তার পরিচিতিকে গড়ে তুলেছে তা-ই তার বহিঃপ্রকাশকে বিলম্বিত করেছে। যে তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বাংলাদেশ-অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য তা-ই যৌথ প্রতিষ্ঠানের, বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে। যৌথ চেতনার বিকাশে যৌথ প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে

বাংলাদেশ ভিন্ন, কারণ এ অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দুর্বল। সামাজিক জীবনে ব্যক্তির প্রাধান্য ভূখণ্ডগত পরিচয়ের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। ফলে, একটি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যতক্ষণ না উচ্চকোটির গোষ্ঠীসমূহ জাতীয়তাবাদকে সুবিধাজনকভাবে কাজে লাগিয়ে একে একটি সুনির্দিষ্ট রূপে দাঁড় করিয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা আত্মপ্রকাশ করেনি। আর তাই বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে আদিকালিক শক্তির ভূমিকাকে ইতিহাস পুরোপুরি ও সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদন করে না।

বাংলাদেশ অঞ্চলের পরিচিতির অনুসন্ধান তার সমাজের ভেতর থেকে আপনা-আপনি জেগে ওঠেনি। মুসলমান শাসক ও ইসলাম ধর্মের দ্বৈত অভিঘাতের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। যে সব প্রাচীন সভ্যতায় ইসলাম-ধর্মে উল্লেখযোগ্য ধর্মান্তর ঘটেছে তাদের ক্ষেত্রে স্বদেশী সংস্কৃতি ও নতুন ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে আনুগত্যের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ অঞ্চলও ব্যতিক্রম ছিল না। চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের মনে ধর্মবিশ্বাস ও বাসভূমির মধ্যকার আনুগত্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। মধ্যযুগীয় কবি – শাহ মুহম্মদ সগীর, মোজাম্মিল, সৈয়দ সুলতান এবং এমন অনেক মুসলমান কবির লেখায় এই সব মানসিক দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালি মুসলমানদের এই দ্বৈততা প্রথম দিকে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ রাজের আগমনের পূর্বে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বাঙালি মুসলমানদের মানসিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। প্রাক্-ব্রিটিশ বাংলায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণ গড়ে উঠতে পারেনি; স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান ও নিম্ন-বর্ণের হিন্দু, উভয়েই অভিবাসী মুসলমান ও উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের এক জোট কর্তৃক শোষিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকরা মুসলমান শোষকদের স্থান অধিকার করে স্থানীয় ধর্মান্তরিত ও অভিবাসী মুসলমানদের ঐক্য সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ শাসনামলে গড়ে-ওঠা মধ্যশ্রেণীর সুবিধাবাদী কার্যক্রমের জন্য পরিচিতির সংকট আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, পরিশেষে বাঙালি মুসলমানদের পরিচিতি ত্রি-পক্ষীয় দ্বন্দ্ব -- হিন্দু *ভদ্রলোক*, অভিবাসী মুসলমান *আশরাফ* ও দেশী-ভাষী উচ্চকোটির মুসলমান গোষ্ঠীসমূহের দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপলাভ করে। দেশীভাষী মুসলমান উচ্চকোটির গোষ্ঠীসমূহ ছিল মূলত শিক্ষিত জোতদার। উচ্চকোটির গোষ্ঠী কর্তৃক মুসলমানদের এই মানসিক দ্বৈততার চতুর ব্যবহার বাংলাদেশের জাতীয় পরিচিতির অনুসন্ধানে জটিল উল্টো-পাল্টা গতিপথের সৃষ্টি করেছে; তবে, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আবাসভূমি ও বহির্দেশীয় আনুগত্যের দ্বৈততা মধ্যশ্রেণীর আবিষ্কার নয়; মধ্যশ্রেণীর জন্মলাভের বহু পূর্ব থেকেই এর অস্তিত্ব ছিল। ফলে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে 'আদিকালিক শক্তি' ও 'হাতিয়ার-স্বরূপ' উপাদানের সংমিশ্রণে।

বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের বিতর্কের প্রধান বিষয় প্রাকৃতিক (আদিকালিক) ও মনুষ্য-সৃষ্ট (হাতিয়ার-স্বরূপ) উপাদানের তুলনামূলক শক্তি নয়। এখন সবচেয়ে বড় বিতর্ক চলছে 'বাঙালি' ও 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শকে ঘিরে। আক্ষরিক অর্থে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' হচ্ছে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। এই ধারণামতে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ধরা হয় বাংলা ভাষাকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে' একটি

ভূখণ্ডভিত্তিক জাতীয়তাবাদ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। যুক্তি দেয়া হয় যে, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' হচ্ছে একটি অতি-জাতীয়তাবাদ যার লক্ষ্য ভারত ও বাংলাদেশের বাংলাভাষা-ভাষী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা। আদতে, এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে ভূখণ্ডগত ও ভাষাগত জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোনও তীব্র দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠেনি। বাস্তবিকপক্ষে "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ" ভূখণ্ডভিত্তিক জাতীয়তাবাদ নয়। বাংলাদেশের বর্তমান সীমান্ত দ্বি-জাতি তত্ত্বের বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে, বাংলাদেশের সরাসরি-অগ্রদূত পূর্ব পাকিস্তান হচ্ছে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের একটি রূপ যা এ দেশে মুসলমান সংখ্যাধিক্যকে প্রতিষ্ঠিত করে (উমর, ১৯৮৭)। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বাঙালি ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ দু'টি ভিন্ন জাতীয়তাবাদ নয়; এগুলো জটিল ও বহুমাত্রিক জাতীয়তাবাদের দু'টি ভিন্ন উপাদান। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে ধর্ম-বিশ্বাস ও আবাসভূমি, ধর্ম ও ভাষা, বহির্দেশীয় ও দেশীয় আনুগত্যের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। ভাষাগত ও ধর্মীয় – উভয়ই বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। ফলে, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে 'বাঙালি' ও 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব বাস্তব নয়। উভয় উপাদানই বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের পরতে-পরতে মিশে আছে।

ঐতিহাসিকরা যদিও 'বাঙালি' বনাম 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের বিতর্ক উপেক্ষা করতে পারেন, রাজনীতিবিদরা তা পারেন না। ইসলাম-ধর্মকে যদি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তা হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমিকা স্পষ্ট করে নির্ণয় করা দরকার। বাংলাদেশে ১.৪৫ কোটি হিন্দু এবং ১৪ লক্ষ বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান রয়েছে। বাংলাদেশের মোট হিন্দু জনসংখ্যা মুসলমানপ্রধান দেশ – যেমন ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র, জর্ডন, তাজিকিস্তান, সিরীয় আরব প্রজাতন্ত্র, তিউনিসিয়া, ওমান ইত্যাদির জনসংখ্যার চাইতেও অধিক। সে জন্য বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের এই অপরিহার্য বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে। 'বাঙালি' ও 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের (তার ভূখণ্ডগত ব্যাখ্যানে) উভয় মতাদর্শই এই সমস্যাকে অগ্রাহ্য করতে চায়। এই দৃষ্টিকোণকে ইতিহাস সমর্থন করে না।

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ভূখণ্ডগত ও ধর্মীয় আনুগত্যের টানাপোড়েন থাকা সত্ত্বেও মুসলমান শাসনের পাঁচ শত বছরের অধিককালব্যাপী হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের অভাবে বাঙালি হিন্দুরা বিধর্মিতা ও প্রচলিত মতের বিরুদ্ধতায় অভ্যস্ত ছিল। গভীরভাবে প্রোথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কারণে বাঙালিদের মধ্যে অন্যের ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। মুসলমানদের মতোই বাংলাদেশ অঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বর্ণ-প্রথার কড়াকড়ির প্রতি বিরূপতা ছিল। উভয় সম্প্রদায়ই গভীরভাবে মানবতাবাদ ও পরমতসহিষ্ণুতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি একই সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহে গড়ে উঠেছিল। তারা ছিল অতিমাত্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও আবেগপ্রবণ। ধর্মের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ-অঞ্চলে মুসলমান ও হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য অনেক সাধারণ উপাদান ছিল। ফলে ব্রিটিশ রাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে

কোনও বাধা ছিল না। ব্রিটিশ শাসনামলে উচ্চকোটির গোষ্ঠীসমূহের সুবিধাবাদী কর্মকাণ্ডের কারণে এ দুই সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হচ্ছে এই বিভক্তি-সৃষ্টিকারী শক্তির বিজয়ের চূড়ান্ত রূপ। শেষ বিচারে মৌলবাদী শক্তির বিজয় স্বাভাবিক ধারা থেকে একটি বিচ্যুতিতে পর্যবসিত হয়। ভাষা আন্দোলনের সূচনায় উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায় আবার পরস্পরের কাছাকাছি আসে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুসলমানরা বার বার ধর্মীয় রাষ্ট্রের মৌলবাদী দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানরা শুধু মিলিত অতীত দ্বারাই নয়, ভবিষ্যতের অভিন্ন স্বপ্ন দ্বারাও উজ্জীবিত হয়েছে (রায়, ১৯৮৭)।

প্রায়শই ঐতিহাসিকদেরকে 'অতীত দ্রষ্টা' বলা হয়ে থাকে। অতীত হতে আহৃত জ্ঞানকে ভবিষ্যতে অভিক্ষিপ্ত করার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন। এ ধরনের অভিক্ষেপণের বিপদ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ অবশ্য সচেতন থাকতে চান; এ ধরনের অভিক্ষেপণের মাধ্যমে অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্ভাবনাকে খাটো করে দেখার আশঙ্কা থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও বলা যায় এ অঞ্চলের সমাজের কিছু প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল। ভবিষ্যতের জন্য নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ সব প্রবণতাকে এড়িয়ে যাওয়া সুবিবেচনার কাজ হবে না।

এই সমীক্ষায় পুনঃপুন বলা হয়েছে যে, ঐতিহাসিক কাল থেকেই বাংলাদেশ-অঞ্চলে তৃণমূল প্রতিষ্ঠান ছিল দুর্বল। এর অর্থ হল এতদঞ্চলে স্থানীয় সরকার কখনও সুসংগঠিত ছিল না। একই প্রবণতা এখনও বিদ্যমান। সাম্প্রতিককালে প্রণীত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির একটি প্রতিবেদনে যথার্থই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ". . . সংবিধানের (৫৯ ও ৬০ ধারা) আলোকে বাংলাদেশের জন্য যথাযথ স্থানীয় সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার সত্যিকার চ্যালেঞ্জ দেখা দেয় স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও তাদের প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত চাপের অভাবের কারণে; নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ভাগাভাগি করে স্থানীয়ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের বিলম্বের কারণেও এটি একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। বিভিন্ন কারণে জনগণ ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত নয়" (UNDP, ১৯৯৩, পৃ. ৪৭)।

১৮৭০ সালে *Bengal Village Chowkidari Act* পাশ করার পর থেকে একের পর এক বিভিন্ন সরকার এ অঞ্চলে গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এ সব নীতিনির্ধারক অনুধাবন করতে পারেননি যে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশের মতো বাংলাদেশ অঞ্চলের অধিকাংশ উন্মুক্ত গ্রামে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রাম-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না। গ্রামীণ বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা উদ্যোগের অর্থ এই নয় যে, অতীতে ফিরে যেতে হবে; এর জন্য প্রয়োজন নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি – যার অস্তিত্ব আদৌ ছিল না। ব্রিটিশ প্রশাসক থটমসন ১৯২৩ সালে বাংলায় যা লক্ষ করেছিলেন তা আজকের বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য : "গ্রামের অনুপস্থিতি . . . তার মানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ জীবনের প্রাণকোষের অভাব। গ্রামীণ এলাকায় স্থানীয় সরকার গড়ে তোলার জন্য বর্তমানে বিরাজমান গ্রাম-প্রতিষ্ঠান ও গ্রাম কর্মচারিদের অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে উজ্জীবিত করার বাইরেও অধিক কিছু

করা দরকার। যেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলতে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত কিছু নেই সেখানে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সবচেয়ে কঠিন কাজ হল সর্বসাধারণের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের ধারণা প্রতিষ্ঠা — সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ; এই ধারণা যেখানে একান্তই নতুন সেখানে তাকে গড়ে তুলতে হবে'' (Thompson, ১৯২৩, পৃ. ১২৬)।

গত ১২৫ বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও গ্রামীণ বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার সফলভাবে শিকড় গাড়তে পারেনি। কার্যক্রমের দিক থেকে অর্ধ-মৃত, অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া এবং কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার তৃণমূল গণ-সংগঠন নয়; তারা শুধু কেন্দ্রীয় কর্মসূচির বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান। গ্রামীণ বাংলাদেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার পেছনে তাদের আকার একটি কারণ হতে পারে। স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর — একটি প্রতিনিধিস্থানীয় ইউনিয়নের লোকসংখ্যা সাতাশ হাজারেরও বেশি। এ ধরনের বিশাল জনগোষ্ঠীতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা কঠিন। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে ঐতিহাসিক কাল থেকে স্থানীয় সরকার দুর্বল ও অকার্যকর তার নীতি-নির্ধারকগণকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক ডেভিড হিউম-এর উপদেশের প্রতি মনোযোগ দেয়া দরকার : "একটি মাঠ যদি দু'জন প্রতিবেশীর মালিকানাধীন হয় তবে তার পানি নিষ্কাশনের ব্যাপারে তারা একমত হতে পারে; কারণ তাদের ক্ষেত্রে পরস্পরকে জানা সহজ; প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, সে যদি এ কাজে যোগ না দেয় তবে তার আশু পরিণতি হচ্ছে পুরো প্রকল্পটি বাতিল হয়ে যাওয়া। কিন্তু এ ধরনের কর্মকাণ্ডে হাজার লোকের সম্মতি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, আদতে অসম্ভব। এ ধরনের জটিল কর্মকাণ্ডকে এক সুরে বাঁধা কঠিন, আরও কঠিন তার বাস্তবায়ন, বিশেষত যেখান প্রত্যেকে ঝক্কি-ঝামেলা ও খরচ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য মিথ্যা ওজর খোঁজে এবং অন্যের ওপর পুরো ভার চাপিয়ে দিতে চায়। রাজনৈতিক সমাজ সহজে উভয় ধরনের ঝামেলা মিটিয়ে ফেলে" (Wade-এ উদ্ধৃত, ১৯৮৫, পৃ. ১৫)। বাংলাদেশে শুধু বৃহৎ স্থানীয় সরকারেই নয়, সমবায় সংগঠনেও অকার্যকারিতা লক্ষণীয়। দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশ বহুমুখী ইউনিয়ন সমবায় সমিতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। দশ থেকে পনের হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত ১০ থেকে ১৫টি গ্রাম থেকে এ সব সমিতি সদস্য সংগ্রহ করত। দৃশ্যত দু'কারণে এ সব সংগঠন ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমত, এ ধরনের সমিতিতে গোষ্ঠী-সংহতি ছিল খুবই দুর্বল। সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ছাড়া ছাড়া। সামাজিক কোনও সংসক্তি, কোনও সংহতি ছিল না। দ্বিতীয়ত, স্বার্থের ভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি বিদ্যমান — এই পূর্ব-অনুমানের ভিত্তিতে বহুমুখী সমবায় সমিতির মতো বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল। যাহোক, বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'বিশৃংখল অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব' (Khan, ১৯৮৩, খণ্ড-২)।

বাংলাদেশের বৃহৎ সংগঠনের ব্যর্থতার বিপরীতে ক্ষুদ্র গণ-সংগঠন প্রভূত সম্ভাবনা দেখিয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে কেন্দ্র করে। এই ব্যাংক গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে যে, "কয়েক দশক ধরে সরকারি এবং বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক এজেন্সির

সহযোগিতা সমর্থন সত্ত্বেও যা অর্জন করা দুরূহ ছিল, গ্রামীণ ব্যাংক এক দশকে তা অর্জন করেছে' (Khandaker, Khalily & Khan, ১৯৯৪, পৃ. ১৫-১৬)। গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যের পেছনে কাজ করেছে বাংলাদেশের সমাজের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি। অন্যান্য সরকারি কর্মসূচি যা করতে পারেনি, গ্রামীণ ব্যাংক তাতে সফল হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক ও অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবেই তুলে ধরে যে, বাংলাদেশে টেকসই সংগঠন গড়ে তোলার চাবিকাঠি হচ্ছে নতুন ও ক্ষুদ্র তৃণমূল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

বাংলাদেশ-অঞ্চলে রাজনৈতিক বিবর্তনের সমীক্ষাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তৃণমূলে প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতার কারণে এতদঞ্চলের রাজনৈতিক সংগঠনকে কুরে কুরে খেয়েছে মধ্যস্বত্বভোগীরা, অনুপার্জিত মুনাফাভোগীরা চাঁদাবাজি, দলাদলি ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, এ সব বিনাশী শক্তি ছিল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পরের শক্তিসঞ্চারক। যদি স্থানীয় সরকার, গণ-সংগঠন ও নাগরিক দলের ভারসাম্য-আনয়নকারী শক্তি তাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হয় তবে আশংকা হয় যে, এ সব শক্তি তার রাজনৈতিক জীবনকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে ভবিষ্যতেও একই ঐতিহাসিক শক্তির পুনরাবির্ভাব ঘটবে কি না। তিনটি সুস্পষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমত, আশাবাদী গণ-সামাজিক চয়ন (social choice) সাহিত্যের সাথে একমত পোষণ করে ধারণা করা যায় যে, জনগণ অসহযোগের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারবে। নর্থ-এর মতে অব্যাহত সহযোগিতার ক্ষেত্রে তিনটি আবশ্যিক শর্ত রয়েছে : ১. ব্যক্তি পুনঃপুনভাবে অন্যের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় রত হয়, ২. পরস্পরের ব্যাপারে তাদের প্রত্যেকের যথেষ্ট তথ্য রয়েছে, এবং ৩. মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির সংখ্যা সামান্য। প্রথম দুটি শর্ত সহজেই পূরণযোগ্য, তবে ক্ষুদ্র সংহত দল আপনা-আপনি গড়ে উঠবে কি না বলা শক্ত। গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, ক্ষুদ্র দল তৈরি করার উদ্যোগ বাহির থেকে আসতে পারে। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে, ভবিষ্যতে সহযোগিতার বাধ্যবাধকতা বদলে যেতে পারে। নগর-রাষ্ট্রসমূহ বিবেচনায় না নিলে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বোচ্চ। এ ধরনের পরিবেশে বিশ্বায়নের নীরব চাপের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতা পূরণের জন্য যৌথ সংগঠন গড়ে উঠতে পারে। পরিশেষে বলা যায় বাংলাদেশের মানুষ অতীত থেকে শিক্ষা না-ও নিতে পারে। যারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না তাদের পরিণতি হচ্ছে ইতিহাসের ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত থাকা।

ফরাসি বিপ্লবের প্রায় দুশ বছর পর মহান বিপ্লবী চৌ এন লাইকে বিপ্লবের তাৎপর্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হয়েছিল। জানা যায় তিনি বলেছিলেন, "এখনও মন্তব্য করার সময় আসেনি" (Schama, ১৯৮৯)। নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশ বিপ্লবের তাৎপর্য মূল্যায়ন করার জন্য পঁচিশ বছর অত্যন্ত স্বল্প সময়। এই বিপ্লব একই সাথে সামাজিক ও জাতীয় বিপ্লব। সামাজিক বিপ্লব হিসাবে গণ-প্রজাতন্ত্রের আওতায় সামাজিক রূপান্তরের মহান স্বপ্ন সারা বিশ্বে কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির পতনের মধ্য দিয়ে নির্মমভাবে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। অবশ্য তা সামাজিক ন্যায়-বিচার, সমতা ও মানবিক মর্যাদার দাবির সমাধান দেয়নি। ফলে, বাংলাদেশে সামাজিক ভারসাম্যের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

জাতীয় বিপ্লব হিসেবে বাংলাদেশ বিপ্লবের তাৎপর্য বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। লরেন্স জিরিং বাংলাদেশকে 'কালের অসঙ্গতির ভেতর অসঙ্গতি' বলে বর্ণনা করে বলেছেন যে, এগুলো হচ্ছে শুধু অতীতের ভুলের প্রতিক্রিয়া। তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, আসল বাংলাদেশের অভ্যুদয় এখনও হয়নি (Ziring, ১৯৯২, পৃ. ২১৬)। এ সব উদ্বেগ অবশ্য যথার্থ নয়। বাংলায় হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধারের আন্দোলন এখনও কোনও জোরালো শক্তি নয়। অন্য একজন লেখিকা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, "বাংলাদেশের জন্ম অনেক দিক থেকে. একটি অনন্য ঘটনা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য তা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দেয়" (Jahan, ১৯৯৪, পৃ. ২০৩)। বাংলাদেশের জন্ম দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে জাতিসত্তার ধারণার ক্ষেত্রে কতগুলো মৌলিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয় তুলে ধরেছে যে, দক্ষিণ এশিয়া একটি বা দু'টি জাতি নয়, বরং অনেক জাতির সমাহার। ফলে, এই উপমহাদেশে বাংলাদেশ সর্বশেষে উদ্ভূত জাতি না-ও হতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ায় 'সমগ্র' ও 'অংশের' মধ্যকার সম্পর্ক মীমাংসিত বিষয় না-ও হতে পারে; ভবিষ্যতে তাদের পারস্পরিক ভূমিকা আবারও নিষ্পত্তি করতে হতে পারে।

বাংলাদেশের জন্ম এক বিচারে তার ইতিহাসের জাতীয়তাবাদী পর্বের সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রতিষ্ঠান-নির্মাণের অধিকতর দুরূহ পর্বের সূচনা করেছে। ঐতিহাসিকভাবে এ অঞ্চলের মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাণ-প্রাচুর্যময় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। যে সামাজিক প্রতিবেশকে তা লালন করেছে তা ছিল প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য প্রতিকূল। বাংলাদেশের জনগণের সামনে আজ যে আসল চ্যালেঞ্জ তা পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি চণ্ডীদাসের লেখা বলে কথিত কবিতায় যথার্থই প্রতিফলিত হয়েছে :

"গড়ণ ভাঙ্গিতে পারে আছে কত খল
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে যে জন বিরল"

(বসু-তে উদ্ধৃত, ১৯৮৬, পৃ. ১)।

উত্তরলেখ

একটি সুশৃঙ্খল ধারণা-কাঠামোর আওতায় প্রাচীন একটি জনপদের সামগ্রিক ইতিহাস বিশ্লেষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। এ ধরনের অতি ব্যাপক বিশ্লেষণের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা হল খুঁটিনাটি উপেক্ষিত হয়। অন্যদিকে যদি বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করা হয় তবে পাঠকের দৃষ্টি মূল প্রতিপাদ্য থেকে দূরে যেতে পারে। পুনর্বিবেচনায় মনে হয় যে, এই বইটির সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা কিছু কিছু বিভ্রান্তি ও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। ১৯৯৬ সালে বইটি প্রকাশের পর পাঠক ও সমালোচকের মনে যে সব প্রশ্ন উঠেছে তার কিছু কিছু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বক্ষ্যমাণ উত্তরলেখটিতে।

বক্ষমান গ্রন্থটির একটি মূল প্রতিপাদ্য হল এমন – দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ এলাকায় গ্রাম ছিল মূলত 'প্রতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ' গ্রাম; অপরপক্ষে বাংলাদেশ অঞ্চলে গ্রামীণ বসতি ছিল 'উন্মুক্ত'। এই অনুকল্প নিয়ে তিন ধরনের প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

প্রথমত যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, এই সমীক্ষায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রামের সাথে উপমহাদেশের বাকি অঞ্চলের গ্রামের পার্থক্যকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় স্বয়ম্ভর গ্রাম-সমাজের ধারণা ভ্রান্ত বিবেচিত হয়েছে এবং পরিত্যক্ত হয়েছে; তাই এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাগণ মত ব্যক্ত করেছেন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যান্য অঞ্চলের গ্রামও সুষম নয় এবং তাকে বাংলাদেশ অঞ্চলের গ্রাম থেকে সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন বলে চিহ্নিত করা যায় না। এই সমীক্ষাটিতেও সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, তথাকথিত গ্রাম-সমাজ ছিল একটি ব্যতিক্রম এবং শুধুমাত্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু অংশে তাদের অস্তিত্ব ছিল। সে জন্যই এই সমীক্ষাটিতে 'স্বয়ম্ভর গ্রাম-সমাজের' পরিবর্তে 'প্রতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ' ও 'উন্মুক্ত' গ্রামের ধারণা-কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছিল। এইমর্মে প্রাক্-অনুমান পোষণ করা হয়েছিল যে, ব্যতিক্রমধর্মী গ্রাম-সমাজ ছিল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রামের আদর্শ রূপ। এবং 'প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতা' এবং 'উন্মুক্ততা' হচ্ছে গুণগত ধারণা। সকল গ্রাম একই ধরনের – এমন ধারণা পোষণ করা বাস্তবসম্মত নয়। এমনকী সকল ব্যতিক্রমধর্মী গ্রাম-সমাজ ও সমরূপ ছিল না; এগুলোও *রায়তওয়ারী*, *পত্তিদারী* এবং *ভাইয়াচারা* গ্রামের উপ-ভাগে বিভক্ত ছিল। ফলে প্রতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রামগুলোতেও সংঘবদ্ধতার মাত্রাগত ভিন্নতা ছিল। তবে তার অর্থ আবশ্যিকভাবে এমন দাঁড়ায় না যে, আদর্শ প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রাম-সমাজের ধারণার সাথে খাপ খায় না এমন গ্রাম একেবারেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রাম ছিল না। উদাহরণস্বরূপ একজন সমালোচক বলেছেন যে, " ... অনুক্রমে বলা যায় যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অংশে প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার অভাবকে (এবং ফলে উন্মুক্ত গ্রামের সম্ভাবনাকে) উড়িয়ে দেয়া যায় না। ফলে প্রতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার

অভাবকে শুধুমাত্র বাংলা, আরও সুনির্দিষ্টভাবে পূর্ব বাংলার বিশেষ মাত্রা হিসেবে ধরে নেয়া যায় না।" (Sen, ২০০০, পৃ.১৪৪)। সমীক্ষাটির প্রণালীতত্ত্বের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে এ ধরনের মন্তব্য রচিত হয়েছে। ম্যাক্স ভেবারের অনুসরণে 'প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ' ও 'উন্মুক্ত' গ্রামের ধারণা গ্রামের আদর্শ রূপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে (দেখুন পৃ. ৪০)। আদর্শ রূপ সর্বদা পুরোপুরি অবিমিশ্র রূপে বিদ্যমান না-ও থাকতে পারে। উপসংহারে বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রাম 'উন্মুক্ত গ্রামের' আদর্শ-রূপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যদিও দক্ষিণ এশিয়ার বাকি অঞ্চলসমূহে 'প্রতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ' গ্রামসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার মাত্রায় তারতম্য ছিল। এ সমস্ত পার্থক্য হয়ত বহিরাগতদের দৃষ্টিগোচর হয় না এবং সর্বদা তার মাত্রাও পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। তবে যে সব প্রশাসক এ ধরনের গ্রাম শাসন করেছে, যে সব নৃতাত্ত্বিক এ সব গ্রামে বাস করেছে এবং যে সব সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার-এর পদ্ধতিতত্ত্ব উপলব্ধিসহ (*verstehen*) অনুসরণ করেছে, তাদের চোখে এই পার্থক্য সহজেই ধরা পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, এমনও বলা হয়েছে যে, যে-সব এলাকা নিয়ে বর্তমানের বাংলাদেশে গঠিত তার আঞ্চলিক ভিন্নতা এই সমীক্ষাটিতে উপেক্ষা করা হয়েছে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, গ্রামভেদে জমি ভোগদখলের অধিকার ও কৃষি পদ্ধতি, ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের আঞ্চলিক ভিন্নতা বিদ্যমান ছিল। একটি গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক-সংঘবদ্ধতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ নিরিখ এর ভৌত বিন্যাস। নওয়াবগঞ্জ ও নাটোর জেলার বরেন্দ্র এলাকা ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রাম ছিল রেখা-সদৃশ ও ছড়ানো-ছিটানো, (বাকী, ১৯৯৮)। ফলে এই সমীক্ষার মূল প্রতিপাদ্যের ক্ষেত্রে জমির ভোগদখল-ব্যবস্থার বিচারে আঞ্চলিক ভিন্নতা অপ্রাসঙ্গিক।

পরিশেষে যুক্তি দেখানে হয়েছে যে, পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশ অঞ্চলের ভিন্নতা অস্পষ্ট; কারণ উভয় অঞ্চলেই কেন্দ্র-ঘেরা এবং রৈখিক ও ছড়ানো ছিটানো গ্রামের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সত্য বটে পশ্চিমবাংলা অঞ্চলের সকল গ্রাম কেন্দ্র-ঘেরা গ্রাম ছিল না। ব্রিটিশ প্রশাসকের প্রতিবেদন, ভূমি-জরিপ প্রতিবেদন এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণা স্পষ্টতই তুলে ধরে যে, বাংলাদেশ অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামই ছিল রৈখিক ও ছড়ানো-ছিটানো এবং পশ্চিম বাংলায় কেন্দ্র-ঘেরা গ্রামের অংশ ছিল অধিক। তবে এ সাধারণীকরণ পরিসংখ্যানগত আচরণের ভিত্তিতে প্রণীত; তা সকল ক্ষেত্রে সত্য না-ও হতে পারে।

বাংলাদেশ অঞ্চলের গ্রাম-কর্মচারিদের ভূমিকা নিয়ে বহুবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। ৩৮ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে; "এতদঞ্চলে গ্রামীণ কর্মচারি নিয়োগের পদ্ধতি একেবারেই ছিল না। এখানে পাটোয়ারী বা গ্রাম হিসাব-রক্ষকের পদ ছিল অজানা।" এ অনুচ্ছেদের গ্রামীণ কর্মচারি বলতে গ্রাম কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারি বুঝানো হয়েছে, বাইরের কোনও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজত এবং গ্রামে অবস্থিত কর্মচারি বোঝানো হয়নি। বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রথাগত অর্থে গ্রামীণ হিসাব-রক্ষকের প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না, যদিও নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, রাজস্বের আদায়ের হিসাব রক্ষাকারী হিসাব-রক্ষক ছিল। তবে তারা গ্রাম কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারি ছিল না। প্রাচীন বাংলায় গ্রামের হিসাব-

রক্ষকের কাজটি সম্পাদন করত পুস্তপাল-এর দপ্তর; এতে রাষ্ট্রের দু-তিনজন কর্মচারি নিযুক্ত থাকত (রায়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩২৫)। কিছু কিছু বড় গ্রামে পত্রদাস নামের কর্মচারি রাজস্ব সম্পর্কিত রেকর্ড-পত্র সংরক্ষণ করত (রায় ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩২৪)। তবে পত্রদাসদেরকে নিয়োগ করত ও বেতন দিত এবং পত্রদাসদের সাথে পুস্তপাল-এর সম্পর্ক কী ছিল তা স্পষ্ট নয়। প্রস্তরলিপির সূত্রাদি স্পষ্টতই তুলে ধরে যে, পত্রদাস-এর কর্মস্থল বড় গ্রামেই সীমাবদ্ধ ছিল। অধিকন্তু যে পুস্তপাল-দপ্তর একাধিক কর্মচারি নিয়োগ করত তা একাধিক গ্রামে কাজ করত। তাতে নিশ্চিত করেই বলা যায়, প্রথাগতভাবে যাকে গ্রাম-কর্মচারি বলা হয়, পুস্তপাল তা ছিল না। যেহেতু বাংলাদেশ অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রাম ছিল ছোট, সেহেতু প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে পুস্তপাল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাজস্বের রেকর্ড-পত্র সংরক্ষণ করত; সহজেই এ ধারণা পোষণ করা যেতে পারে।

মুসলমান শাসনামলে গ্রামীণ হিসাব-রক্ষক পদকে পাটোয়ারী বলে অখ্যায়িত করা হয়। তবে জমির ভোগ-দখলের সম্পর্ক অনুসারে পাটোয়ারীর ভূমিকা ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন হত। মোটমুটিভাবে বলা চলে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় দু'ধরনের গ্রাম ছিল: কৃষক-অধিকৃত (রায়তী) গ্রাম ও জমিদার-অধিকৃত (তালুক) গ্রাম। রায়তী গ্রামে পাটোয়ারী গ্রামের কর্মচারি হিসেবে গ্রামবাসীদের অধিকার রক্ষা করত। জমিদারী গ্রামে গ্রামের হিসাব-রক্ষক বা পাটোয়ারী ছিল জমিদারের তাবেদার; অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমিদারের বেতনভুক এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে জমিদার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। অনেক জমিদারী গ্রামে পাটোয়ারীর কাজ চালাত গোমস্তারা। বাংলাদেশ অঞ্চলের অনেক গ্রামের পাটোয়ারী বা গ্রাম হিসাব-রক্ষক ছিল বহিরাগত; তারা একাধিক গ্রামের হিসাব রক্ষণের কাজে নিয়োজিত থাকত। ১৮১৭ সালের XII নম্বর রেগুলেশনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকরা যখন কানুনগো ও পাটোয়ারী পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে শুরু করে তখন নিম্ন বাংলার গ্রাম হিসাব-রক্ষকের প্রতিষ্ঠানটির অনন্যতা ধরা পড়ে। ১৮১৯ সালের ২ জুন-এর রাজস্ব বোর্ড-এর জারিকৃত এক পত্রে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, "যে-সব প্রদেশে গ্রাম-সমাজ পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে তার তুলনায় 'রেগুলেশন অব বেঙ্গল' চালু করলে বাংলায় যে-সব বিপত্তি দেখা দিতে পারে সে ব্যাপারে গভর্ণর জেনারেল ইন-কাউন্সিল সচেতন রয়েছে" (GOB, ১৯১৭-১৯, পৃ. ১৬৫-১৬৬)। এর মাধ্যমে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, ১৮১৯ সালের দিকে ভারত সরকার লক্ষ করেছিল যে, বাংলাদেশ অঞ্চলে গ্রাম-সমাজ তার "পূর্ণ রূপে" বিদ্যমান ছিল না এবং প্রথাগত পাটোয়ারী প্রতিষ্ঠানও এখানে কাজ করত না। অধিকন্তু ১৮১৯ সালে ১৮ এপ্রিলের এক প্রতিবেদনে আর. চেম্বারলেইন পাটোয়ারী পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত রেখেছিলেন : বেনারস ও বিহারসহ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে পাটোয়ারীর খরচ সাধারণত বর্তায় রায়ত-এর ওপর ... বাংলা ও অন্যান্য যে-সব জেলায় আমার অনুসন্ধান করার সুযোগ ঘটেছে, সেখানে দেখতে পেয়েছি যে, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পাটোয়ারীরা বেতন পেত জমিদারদের কাছ থেকে" (GOB, ১৮১৭-১৯, পৃ. ১১৪-১১৫)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, একই দলিল-পত্র ব্যবহার করে একজন সমালোচক এমন বলার চেষ্টা করেছেন যে, বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রচলিত- অর্থে-ব্যবহৃত পাটোয়ারীর অস্তিত্ব ছিল (Sen, ২০০০, পৃ. ১৪৬-১৫০)। এই বিশ্লেষণের দু'টি প্রধান

দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, বিহার অঞ্চলের প্রতিবেদনকে (যা গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল ময়মনসিংহ-এর কালেক্টরকে পাঠিয়েছিল) বাংলাদেশ-অঞ্চলের-জন্য-প্রস্তুত প্রতিবেদন বলে ভুল করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ অঞ্চলের পাটোয়ারীদের অনন্যতা ব্যাখ্যা করে যে পরিচ্ছেদটি লেখা হয়েছে তা পুরোপুরি অবজ্ঞা করা হয়েছে। যাহোক, প্রথম দিককার ব্রিটিশ প্রশাসকদের এসব রেকর্ড-পত্র বিশ্লেষণ করলে দু'টি উপসংহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত, বিহার-এর পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে – যেখানে প্রতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রামের অস্তিত্ব ছিল – নিম্ন বাংলায় গ্রাম হিসাব-রক্ষকের পদ্ধতির তুলনায় পাটোয়ারী-প্রতিষ্ঠান ছিল অধিকতর শক্তিশালী। দ্বিতীয়ত, নিম্ন বাংলায় গ্রাম হিসাব-রক্ষক সাধারণত বেতন পেত (ছোটখাট কিছু ব্যতিক্রম বাদে) জমিদারের কাছ থেকে; অপরপক্ষে অন্যান্য অঞ্চলে পাটোয়ারীকে বেতন দিত গ্রমবাসীরা।

প্রশ্ন তোলা হয়েছে, বাংলাদেশ অঞ্চলের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রশাসকদের বর্ণনা ব্রিটিশ-পূর্ব বাংলার বাস্তবতার সত্যিকার যথাযথ প্রতিফলন কি না। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে, ব্রিটিশ-পূর্ব বাংলায় গ্রাম "শুধু একটি প্রশাসনিক স্তর ছিল না; জমিদারী কর্তৃত্বের বিপরীতে গ্রাম একটি জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক স্তর হিসেবেও বিদ্যমান ছিল, ... গ্রাম শুধু রাজস্ব-প্রদানের বুনিয়াদি এককই ছিল না, রাজস্ব নির্ধারণেরও প্রাথমিক একক ছিল" (Rahman, ১৯৮৬, পৃ. ৮২)। এই অনুকল্পে কতগুলো উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা বিদ্যমান।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ কোনও সত্তা হিসেবে সাধারণভাবে বাংলাদেশ অঞ্চলের কোনও গ্রাম কর্তৃক ভূমি রাজস্ব পরিশোধ করা হয়েছে –এমন কোনও দালিলিক প্রমাণ এই অনুকল্পের প্রবক্তাগণ উপস্থাপন করেন না। তাদের সিদ্ধান্ত তুলে ধরা হয় পরোক্ষ প্রমাণাদির মাধ্যমে। দক্ষিণ এশিয়ার বাকি অংশের গ্রাম বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, যে-সব গ্রাম নিজেরাই নিজেদের রাজস্ব পরিশোধের দায়িত্ব পালন করত তাদের দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, রাজস্ব পরিশোধের প্রাথমিক একক হিসেবে যে-সব গ্রাম দায়িত্ব পালন করত তাদের "যৌথ তহবিল ছিল, যেখানে প্রত্যেক অর্থ জমা দিত এবং যা থেকে গ্রাম প্রতিনিধিরা রাজস্ব দাবি মেটাত" (Habib, ১৯৮৫, পৃ. ১৩৫)। প্রাপ্ত সূত্রাদিতে বাংলাদেশের গ্রামে এ ধরনের কোনও যৌথ তহবিলের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে না। দ্বিতীয়ত, যে-সব লোক রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকত তারা ছিল সুপরিচিত। উত্তর ভারতের গ্রামের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, তারা যদি রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হত তবে অপরাধী হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হত (Habib, ১৯৮৫, পৃ. ৩১৩)। বাংলাদেশ অঞ্চলে এ ধরনের কোনও পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল এমন প্রমাণ এখনও মেলেনি। অধিকন্তু গ্রামের রাজস্ব আদায়কারী – গ্রাম-প্রধান বা চৌধুরী যে-ই হোক না কেন – প্রথাগতভাবে রাজস্বের একটি অংশ পেত বা তার রাজস্ব মওকুফ করা হত। এ ধরনের কোনও পদ্ধতি কখনও বাংলায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি।

১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই বাংলায় জমিদারী প্রথা শক্তভাবে প্রোথিত ছিল। ফলে এটি বোঝা কষ্টকর ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে রাজস্ব ধার্যকরণ ও কৃষকদের কাছ থেকে তা আদায়ের প্রক্রিয়ায় কেন আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা

দেবে। বিশ্লেষণে না গিয়ে গোড়াতেই ধরে নেয়া যায় যে, রাজস্ব ধার্যের ক্ষমতা গ্রামবাসীদের সাথে ভাগাভাগি করার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই জমিদাররা লাভজনক বলে মনে করবে – এটিই স্বাভাবিক। হাবিবের তথ্যানুযায়ী (ঐধনরন, ১৯৮৫, পৃ. ১৫৬) বাংলার জমিদাররা রাজাকে নির্ধারিত কর দিত; আর প্রথাগতভাবে যেখানে রাজস্ব নির্ধারিত থাকত তা ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে কৃষকদের দেয় কর তারাই নির্ধারণ করত। প্রাপ্ত সূত্রাদির বিশ্লেষণ এই অনুকল্পকে সমর্থন করে না যে, রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রাম বুনিয়াদি একক হিসেবে কাজ করত। তবে পাতলা-বসতি বা গহীন এলাকায় রাজস্ব নির্ধারণের বিষয়টি গ্রামবাসীদের সাথে যৌথভাবে সম্পাদন করাটা আর্থিক দিক থেকে যুক্তিযুক্ত মনে হলে হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ছিল ব্যতিক্রম; সাধারণভাবে এমনটি হবার কথা নয়। এ প্রসঙ্গে কুমিল্লার বলদাখাল পরগণার প্রাথমিক প্রতিবেদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৭ পিটারসন লিখেছেন যে, "এই দেশে উভয় প্রান্তে কী ধরনের বিভ্রান্তি পরিদৃষ্ট হচ্ছে বিদ্যমান পরিস্থিতি হতে বোর্ড তা বিচার করতে পারে। বলদাখালে রায়তদের যে পাট্টা দেয়া হয় তাতে শুধু কানি প্রতি জমির শুল্ক হার ধার্য করা থাকে এবং তাতে জমিদার বা আমিল-এর সীল-মোহর দেয়া থাকে; রায়ত পরবর্তীতে কত পরিমাণ জমি চাষাবাস করতে পারবে বা ভোগ দখল করতে পারবে তার কোনও উল্লেখ থাকে না তাতে। এ ধরনের একটি পাট্টা পুরো গ্রামের সব রায়তের কাজে লাগে; কিন্তু কোনও রায়ত চাইলে তার নিজের জন্য আলাদা একটি পাট্টা পেতে পারে। কিন্তু তার তথ্যে ভিন্নতা শুধু এতটুকুই যে এটি সেই রায়তের নামে করা" (Islam, ২০০০, পৃ. ২১৮)। পিটারসনের প্রতিবেদন স্পষ্টতই তুলে ধরে যে, কুমিল্লা জেলার বলদাখাল পরগণায় চাষীরা একক অথবা যৌথভাবে রাজস্ব পরিশোধ করতে পারত। অধিকন্তু, প্রতি একরের রাজস্বের পরিমাণ ছিল রাজস্ব-কর্মচারি কর্তৃক ধার্যকৃত। ফলে সমস্ত গ্রামের রাজস্ব-দাবি কৃষকদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়ার সমস্যা কোনক্রমেই দেখা দেয়ার কথা নয়। পিটারসন যে গ্রামের বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ হবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না ।

৪ নং অধ্যায়ে বিধৃত তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ও ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরের সম্পর্ক নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ একজন সমালোচক বলেছেন যে, গ্রন্থটির লেখক জোরে-শোরে দাবি করেছেন বাংলায় ইসলাম ধর্মের সহজ সম্প্রসারণ ঘটেছিল মূলত সুদৃঢ় তৃণমূল প্রতিষ্ঠানের অভাবের কারণে। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অংশে ইসলাম ধর্মের প্রসার সুদৃঢ় গ্রাম-সমাজের অস্তিত্বের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু তার অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে, যে-সব অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম ভালোভাবে প্রসারলাভ করেছিল, যেমন পাকিস্তানে শক্তিশালী গ্রাম-সমাজের অস্তিত্ব ছিল না? (ইসলাম, ১৯৯৭ পৃ. ৩৩৯)। বাংলায় ইসলাম ধর্মের তুলনামূলকভাবে সাফল্যের ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের একটি ভুল ব্যাখ্যা এটি। এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় দু'ধরনের ধর্মান্তর ঘটেছিল : (১) নিচ থেকে ধর্মান্তর, ও (২) ওপর থেকে ধর্মান্তর । যেখানে তৃণ-মূল সংগঠন ছিল দুর্বল সেখানে নিচ থেকে ধর্মান্তর সম্ভব ছিল। যেখানে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিভাবে- সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল সেখানে ধর্মান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল ওপর থেকে।

১০৩ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ওপর থেকে ধর্মান্তরের উদ্যোগে একজন রাজা, অথবা উপজাতি, বর্ণ-দল, পেশাদারী গিল্ড বা গ্রাম-সমাজ নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, প্রতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রাম-নেতৃত্ব বহিরাগত কোনও ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ছিল সক্রিয়ভাবে বিরোধী । যেসব অঞ্চল নিয়ে এখন পাকিস্তান গঠিত সেখানে মুসলমান সংখ্যাধিক্যের ব্যাখ্যা এই সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়েছে এভাবে : 'নিশ্চিতভাবেই বলা যায় পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে শক্তিশালী উপজাতীয় সংগঠন ছিল। ফলে হয়তবা এমন ঘটেছে যে, এ ধরনের উপজাতিগুলি দল বেঁধে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। (দেখুন, পৃ. ১০৩)।

এই সমীক্ষায় মূল প্রতিপাদ্য এবং বিকাশমান 'সামাজিক পুঁজি' সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যদিও 'সামাজিক পুঁজি' পদটি ১৯১৬ সালেই প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং ১৯'।০ ও ১৯৮০-র দশকে অর্থনীতিবিদ গ্লেন লোরি এবং সমাজবিজ্ঞানী ইভান লাইট ও জেমস্ কোলম্যান একে ধারণাগতভাবে মূর্ত করে তুলেছিলেন, তবু শুধুমাত্র ১৯৯০-এর দশকেই পুটনাম ও তাঁর সহযোগীদের কাজের মাধ্যমে তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে (Fukuyama, ১৯৯৯, পৃ.১৯)। পুটনাম পদটিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে : 'সামাজিক পুঁজি... বলতে সামাজিক সংগঠনের কিছু বৈশিষ্ট্য বুঝায়; যেমন, বিশ্বাস, আচরণ-পদ্ধতি, নেটওয়ার্ক – যা সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে" (Putnam, ১৯৯৩)। ফুকুয়ামার মতে "সাদামাটাভাবে সামাজিব পুঁজিকে অনানুষ্ঠানিক নিয়মনীতি বা আচরণ-পদ্ধতির অংশ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা একটি গ্রুপের সদস্যরা পোষণ ও পালন করে এবং যা তাদের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলে" (Fukuyama, ১৯৯৯, পৃ.১৬)।

এই সমীক্ষায় 'সামাজিক পুঁজি' ধারণাটি খোলাখুলিভাবে ব্যবহার করা হয়নি, এবং '*Discovery of Bangladesh*'-এর অন্তর্লীন তত্ত্ব সামাজিক পুঁজি তত্ত্বের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে; তবু বলতে হয় যে, সামাজিক পুঁজি ও বক্ষমান গ্রন্থটির তাত্ত্বিক- কাঠামো একই অর্থনীতি সম্পর্কিত সাহিত্য থেকে উৎসারিত । বাস্তবিকপক্ষে, পুটনাম-এর বই '*Making Democracy Work*' এবং '*Discovery of Bangladesh*'-এর প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য রয়েছে। এই সমীক্ষাটিতে তুলে ধরা হয়েছে যে, বৃহৎ বাংলার নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্য সত্ত্বেও তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিন্নতার কারণে বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের ঐতিহাসিক বিকাশ উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্নতর হয়েছে। যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, পূর্ব বাংলার গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য ছিল "বিচ্ছিন্নতার স্ববিরোধিতা" – যা সর্বনিম্ন পর্যায়ে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। পুটনামও দেখিয়েছেন যে, উত্তর ও দক্ষিণ ইতালির ঐতিহাসিক বিবর্তন ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছে, কারণ দক্ষিণ ইতালিতে নাগরিক সমাজের ঐতিহ্য ছিল অনুপস্থিত; অপরপক্ষে, ঐতিহাসিকভাবেই উত্তর ইতালিতে গ্রাম-পর্যায়ে প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর তৃণমূল প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল।

'*Making Democracy Work*' এবং '*Discovery of Bangladesh*'-এর মধ্যে এ ধরনের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বই দুটোর প্রণালীতত্ত্ব এবং পূর্ব-অনুমানের গুরুত্বপূর্ণ

ভিন্নতা রয়েছে। এক অর্থে '*Discovery of Bangladesh*-'এর প্রণালীতত্ত্ব পুটনাম-এর বিশ্লেষণের তুলনায় স্বল্প পরিসরের। '*Discovery of Bangladesh*'-র 'বিচ্ছিন্নতার স্ববিরোধিতা" কেবলমাত্র যুক্তিবাদী ব্যাক্তিমানুষের অর্থনৈতিক আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অপরপক্ষে, সামাজিক পুঁজির ধারণা শুধু অর্থনৈতিক আয়-ব্যয় নিয়ে গঠিত নয়, তাতে সামাজিক আচরণ পদ্ধতি এবং বিশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অন্য এক অর্থে '*Discovery of Bangladesh*'-এর প্রণালীতত্ত্ব পুটনামের চাইতে বৃহত্তর পরিসরের; কারণ এতে বাংলাদেশের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। (অধ্যায় ৩ দেখুন)। পুটনাম এ ধরনের কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। কোনও কোনও এলাকায় সংঘবদ্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠান কেন গড়ে ওঠে না তার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাগত ভিন্নতা রয়েছে সমীক্ষা দু'টোতে। পুটনাম যুক্তি দেখিয়েছেন যে, দক্ষিণ ইতালিতে নাগরিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল নরমান স্বৈরাচারী শাসনের দ্বারা। অপরপক্ষে, '*Discovery of Bangladesh*'-এ যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রাম আবশ্যিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরোধী নয়; অনেক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরাই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে-সংঘবদ্ধ গ্রাম প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ জুগিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, কর ধার্য ও আদায় এবং ভূমিদাস প্রথা (Serfdom) টিকিয়ে রাখার জন্য রাশিয়ায় জারেরা "মীরচ (গ্রাম-সমাজ) প্রতিষ্ঠা করেছিল। '*Discovery of Bangladesh*'-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে কীভাবে তৃণমূল পর্যায়ের সহযোগিতার ব্যয় প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে অধিক হয়ে উঠেছিল। পুটনামে এমন কোনও বিশ্লেষণ নেই। পুনর্বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ অঞ্চলের ঐতিহাসিক বির্বতন ব্যাখ্যা করার জন্য "সামাজিক পুঁজি" তত্ত্বের প্রয়োজন নেই। তবে, '*Discovery of Bangladesh*' গ্রন্থের ১৫৩ হতে ১৫৭ পৃষ্ঠায় বর্তমান গ্রন্থের ১৩৮-১৪২ পৃষ্ঠা) উপস্থাপিত বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বির্বতনের মাধ্যমে ভবিষ্যত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের তাৎপর্য সামাজিক পুঁজি তত্ত্বের আলোকে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই সমীক্ষাটির অনিবার্য উপসংহার হল – বাংলাদেশ অঞ্চলের গ্রামীণ বসতিতে সামাজিক পুঁজির প্রভূত ঘাটতি রয়েছে। এই প্রস্তাবকে অবশ্য একজন সমালোচক এই বলে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, "সংকটের সময় জনগণের আত্ম-উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি-বীমার ভূমিকা পালন করে" (Sen, ২০০০, পৃ. ১৫২)। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বন্যাপ্রতিরোধ বাঁধের ভাঙ্গনের আশু হুমকিও এ ধরনের প্রত্যাশিত সহযোগিতামূলক প্রতিক্রিয়া জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। একটি বিখ্যাত চীনা প্রবাদ আছে – "দেখা-শোনার মানুষ না থাকলে বাঁধ তৈরি অর্থহীন।" চীনে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের বাঁধ রক্ষার জন্য লাখ লাখ মানুষের সমাবেশ ঘটানো হয়। প্রতিতুলনায় বাংলাদেশের গ্রামে বন্যার সময় মাটির বাঁধ রক্ষা করার আশু প্রয়োজনীতা দেখা দিলেও স্থানীয় লোকেরা থাকে পুরোপুরি নির্বিকার। গোমতী নদীতে গত দু'শ বছরের পৌনঃপুনিক ভাঙ্গনের অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলা দখল করে তখনও গোমতী নদীর তীরে মাটির বাঁধ ছিল। ১৭৭০ এর দশকে যখন বাঁধে ভাঙ্গন দেখা দেয় তখন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির খরচে বাঁধটি মেরামত করা হয়; প্রায়শ বাঁধটিকে রক্ষা করতে হত

কোম্পানির সৈন্যদের সাহায্যে। এ ধরনের উদ্যোগে জনগণের কোনও অংশগ্রহণ ছিল এমন প্রমাণ নেই (Islam, ২০০০)। রিচার্ড কারস্টেয়ার নামে একজন ব্রিটিশ প্রশাসক কুমিল্লা জেলা-প্রশাসনে যোগ দিয়েছিলেন ১৮৭৪ সালে। তিনি গোমতীর বন্যা সম্পর্কে চমৎকার একটি বর্ণনা রেখে গেছেন।

"পানির সাথে বন্যার প্রশ্নও জড়িত। কুমিল্লার পাশ দিয়ে গোমতী নদী বয়ে চলে; তার দু'পারে রয়েছে মাটির বাঁধ; তাদের উচ্চতা এমন যে নদী যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে তখন তার উচ্চতা দাঁড়ায় শহরের উচ্চতা থেকে আট ফুটেরও বেশি। এই বাঁধ ছিল আমাদের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়, কারণ এই বাঁধটি সংরক্ষণ করার কথা রাজার। অবহেলার কারণে তাতে ইঁদুরের গর্তের ছড়াছড়ি। যখন বাঁধে ফুটো দেখা দিত তখন তা বন্ধ করার লোক পাওয়া যেত না; এক্ষেত্রে সমস্যা ছিল নিত্যকার। জনসাধারণ ছিল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত – এক বর্ণের লোক ছিল যারা কোনওক্রমেই কায়িক শ্রমে রাজি নয়, আরেক ধরনের লোক ছিল যারা নিজের জমিতে ছাড়া অন্যের জায়গায় কাজ করাকে অসম্মানজনক মনে করত। এ ধরনের লোক কুলী হিসেবে কাজ করাকেও অপমানজনক বলে মনে করত। একজনকে আমার মনে আছে যার বাড়ী বাঁধের ফুটো-সংলগ্ন নিচের জমিতে; যদি বাঁধটি ভেঙ্গে যায় তবে প্রথম তোড়েই তার বাড়ী ভেসে যাবে; তবু বাঁধটিকে রক্ষা করার জন্য হাত চালাতে সে কিছুতেই সম্মত হল না।

সে বলল "এটা আমার কাজ না; বাঁধ ঠিক করা সরকারের দায়িত্ব (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, এটি সরকারের নয়, রাজার দায়িত্ব); তারাই এটাকে দেখশুনে রাখবে – আমি হাত দিতে যাব কেন।"

এ কথা যখন বলা হয় তখন আমি বাঁধের ফুটো ঠিক করার ব্যাপারে সাহায্য করতে বেরিয়েছিলাম। নদীর পানি পাড় উপছিয়ে পড়ে – এমন অবস্থা। ইঁদুরের একটি গর্ত দিয়ে পানি চোঁয়ানো শুরু হয়েছে এবং পুরো পাড়টি নরম কাদায় ভরা; ঘাসের একটি পাতলা আস্তরণে তা ঢেকে আছে মাত্র। একটি বাঁশ নিয়ে আমরা হাতের চাপেই তা কাদার মধ্যে বারো ফুট নিচ পর্যন্ত গেঁথে দিলাম। গণপূর্ত-সার্জেন্ট বসে ছিল একটি বাক্সে; অসহায় অবস্থা তার; মুখে কোনও রা নেই, শুধু ফিসফিস করে কিছু বলার চেষ্টা করছে। চারিদিকে তখন হল্লা চলছে; জায়গাটিতে শক্তসমর্থ কৃষকরা গাদাগাদি করছে, কিন্তু ফুটোটি সারানোর জন্য একমাত্র শ্রমিক যাদের পাওয়া গেল তারা হল জেলের কয়েদি (Carstairs, ১৯১২, পৃ.৩৯)।

আনুমানিক সত্তর বছর-এর আখতার হামিদ খানও গোমতীর বন্যার ব্যাপারে একই ধরনের বর্ণনা দিয়েছেন :

"নদীটির উঁচু পার ধরে আমরা দশ মাইল মোটরগাড়ী চালিয়ে গেলাম; নদীটির ঘোলা জল খরস্রোতে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। আমাদের ডানদিকে ধানের ক্ষেত অন্ততপক্ষে নদীর উঁচু স্তর থেকে বিশ ফুট নিচে অবস্থিত। যেখান দিয়ে পানি চুইয়ে পড়ছে সেইসব গর্ত পরীক্ষা করার জন্য বার বার থেমে থেমে এগুচ্ছিলাম আমরা। গর্তগুলোই ছিল বিপদজ্জনক স্থান। কিছু কিছু গর্ত আস্তে আস্তে বিপজ্জনকভাবে বড় হচ্ছিল: আবার কিছু কিছু ছিদ্র বুজিয়ে দেয়া হয়েছিল। নদীকে বাগ মানিয়ে রাখা হচ্ছিল

কিন্তু তার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। তখনও কোনওখানে ভাঙ্গন দেখা দেয়নি। কিন্তু মনে হল পাশাপাশি গ্রামগুলোতে জীবন স্বাভাবিকভাবেই বয়ে চলছে। তাদের মাথার ওপর যে পানির দেয়াল ঝুলছে তা আপাতদৃষ্টিতে নির্বিকার গ্রামবাসীদের মাথাব্যথার কারণ বলে মনে হল না। শিশুরা, এমনকী বয়স্করা আমোদ-ফূর্তি করছে, মাছ ধরছে, ফূর্তিতে গোসল করছে। নদীর পাড়ে যেখানে ইঞ্জিনিয়ারদের জীপ থামছে সেখানেই তারা জটলা পাকাচ্ছে। যেসব 'গর্ত' আমাদের মাথাব্যথার কারণ ঘটিয়েছে আর আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে সেগুলো তারাও দেখছে। কিন্তু পানির নিচে যে-সব গর্ত দিয়ে জল চুয়াচ্ছে তা খুঁজে বের করার জন্য কেউ এগিয়ে আসছে না।

আমি একটি জটলার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "বাঁধ ভেঙ্গে গেলে যে আপনারা পুরোপুরি মারা পড়বেন একথা কি বুঝেন না আপনারা? তাহলে ভাঙ্গন ঠেকানোর জন্য এগিয়ে আসছেন না কেন?"

আমি তাদের কাছ থেকে কোনও সদত্তর পাইনি। তারা উদ্বিগ্ন নয় কেন ? আমি জানি না এবং বলতেও পারি না তারা নির্বোধ কি না। হয়তবা এর মধ্যে গভীর কোনও ব্যাপার আছে।" (Khan, ১৯৮৩, খণ্ড ১, পৃ. ৩৪১-৩৪২)।

আখতার হামিদ খান কর্তৃক এই ধারণা লিপিবদ্ধ করার পর পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু অবস্থার কোনওই পরিবর্তন ঘটেনি। বাঁধ রক্ষায় এখনও স্থানীয় লোকেরা অংশগ্রহণ করে না। জরুরি অবস্থা দেখা দিলে গোমতী বাঁধ রক্ষায় নিয়োজিত করা হয় সেনাবহিনী বা সরকারি ঠিকাদার। যে-সমাজ তাদের মাথার ওপর খড়গের মতো ঝুলে থাকা বাঁধের ভাঙ্গন দেখেও এমন নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার থাকে তার সামাজিক পুঁজির ঘাটতি আরোগ্যাতীত। বাস্তবিকপক্ষে এ ধরনের সমাজে "নীতিবিসর্জন, অবিশ্বাস, ফাঁকিবাজি, শোষণ, বিচ্ছিন্নতা, বিশৃংখলা এবং স্থবিরতার শ্বাসরুদ্ধকারী দুষ্টচক্রে একটি অপরটিকে জোরদার করে" (Putnam, ১৯৯৩ পৃ. ১৭৭)।

মানচিত্র - ১

বাংলার জেলা, ১৯৪৭

মানচিত্র - ২

বাংলাদেশ

DINAJPUR
RANGPUR
ASSAM
MEGHALAYA
BOGRA
RAJSHAHI
SYLHET
MYMENSINGH
TANGAIL
PABNA
DHAKA
KUSHTIA
COMILLA
JESSORE
FARIDPUR
CHITTAGONG
HILL
TRACTS
BARISAL
NOAKHALI
MISERAM
KHULNA
PUTUAKHALI
CHITTAGONG
-N-
Mouths of the Ganges
0
50 Miles
0
60 km
Bay of Bengal
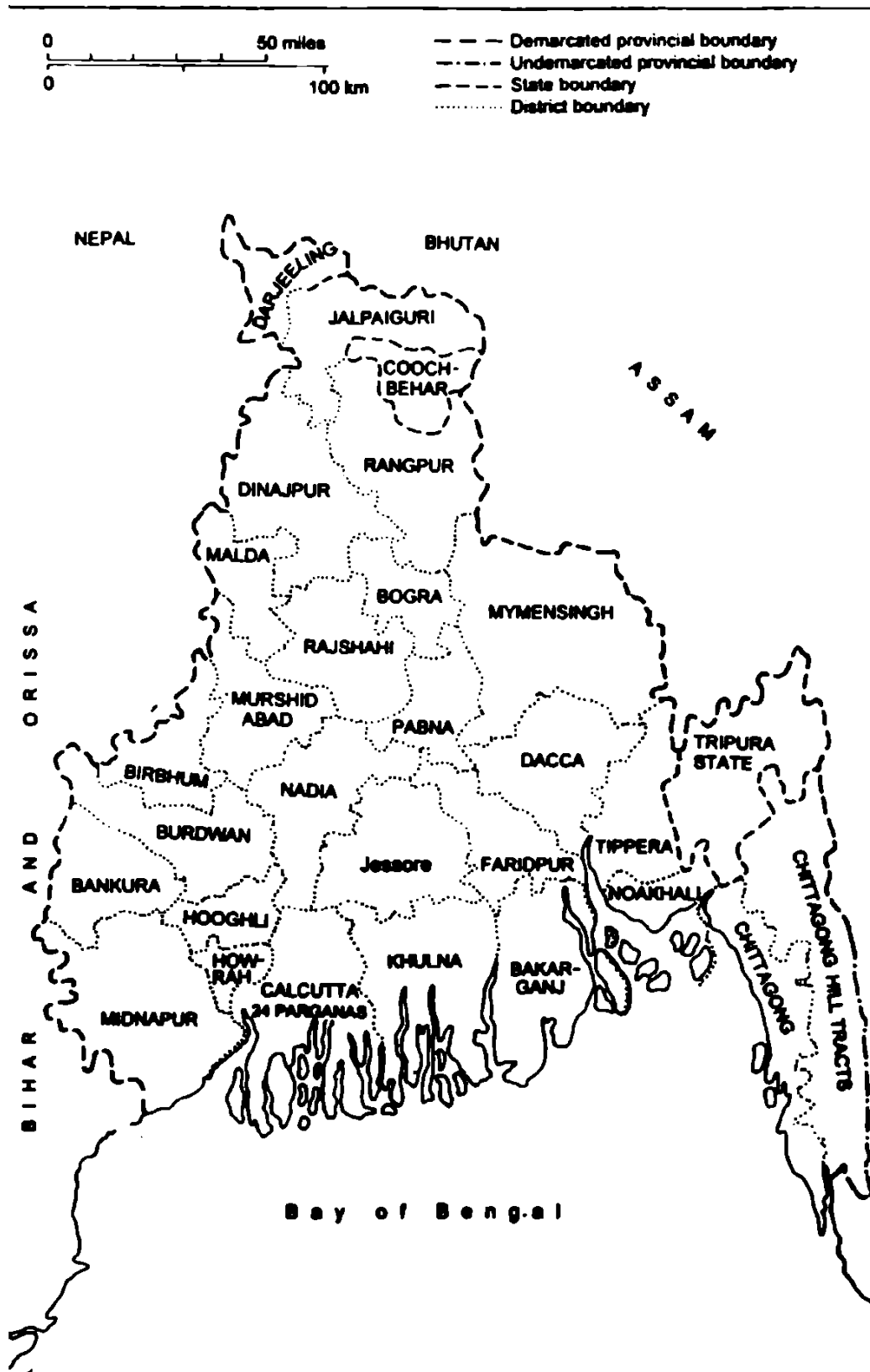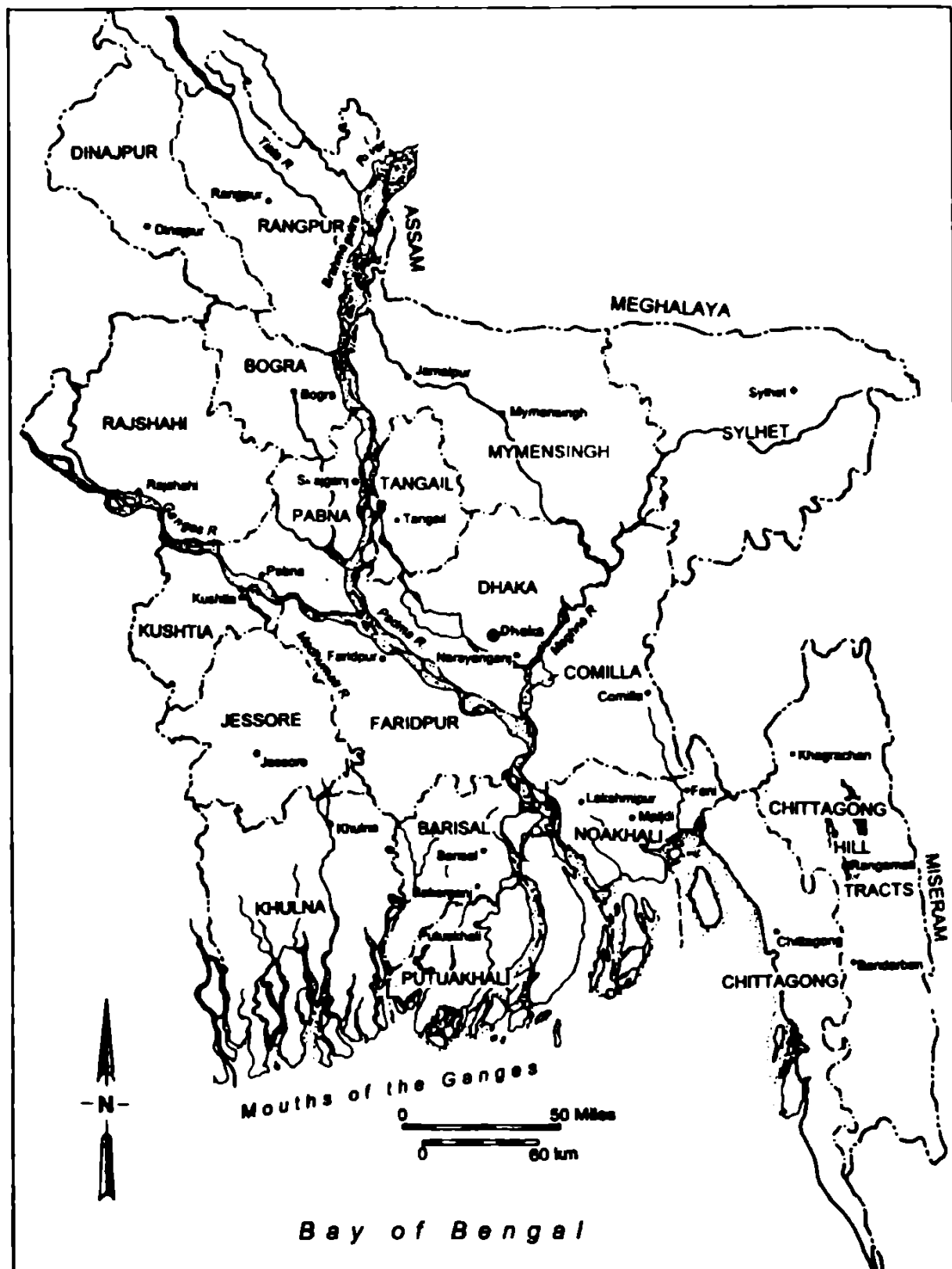
গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজি

Addy. Premen and Azad. Ibne. 1975. "Politics and Society in Bengal" In Robin Blackburn (ed.), *Explosion in a Subcontinent*, Middlesex: Penguin.

Adnan. Shapan, 1990. *Annotation of Village Studies in Bangladesh and West Bengal*. Comilla: BARD.

Ahmed, Abul Mansur. 1975. *End of a Betrayal and Restoration of Lahore Resolution*. Dhaka: Khoshroj Kitab Mahal.

Ahmed, A.F. Salahuddin. 1994. *Bengali Nationalism and the Emergence of Bangladesh.* Dhaka: International Centre for Bengal Studies.

Ahmed, Rafiuddin. 1981. *The Bengal Muslims,* 1871-1906. New Delhi: Oxford University Press.

Ali Muhammad Mohar. 1985. *History of the Muslims of Bengal*. Riyadh: Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University.

Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Communities*. London: Verso.

Anderson. Perry. 1994. *Lineages of the Absolutist State*. London: Verso.

Arens. J & van Beurden. 1977. *Jhagrapur: Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh.* Amsterdam: Third World Publications.

Baden-Powell, B.H. 1896. *The Indian Village Community*. London: Longmans. Green and Co.

Basham, A.L. 1959. *The Wonder That Was India*. New York: Grove Press.

Bayly. C.A. 1992. *Rules, Towsmen and Bazaars*. Delhi: Oxford University Press

Bertocci. Peter J. 1970. *"Elusive Village: Social Structures and Community Organization in East Pakistan"* (mimeo). Michigan: Unpublished Ph.D. dissertaion of M.S.U.

Beteille. Andre. 1980. "The Indian Village Past and Present" In E.J. Hobsawm et. Al (eds.). *Peasants in History: Essays in honour of Daniel Thorner*. Calcutta: Oxford University Press.

Beverley. Henry. 1872 *Census of Bengal 1871*. Calcutta: Bengal Secretariat Press.

Bloch, Marc. 1953. *The Historian's Craft*. New York: Vintage Books.

Bouquet, A.C. 1954. *Comparative Religion*. Hammondsworth: Penguin Books.

Brass, Paul R. 1979. "Elite Groups, Symbol Manipulation and Ethnic Identity among the Muslims of South Asia". In David Taylor and Malcolm Yapp (eds.) *Polotical Identity in South Asia*. London: Curzon Press.

Breuilly, John. 1982. *Nationalism and the State*. Manchester: Manchester University Press.

Broomfield, J.H. 1968. *Elite Conflict in a Plural Society*. Berkely: University of California Press.

———. 1992. "Social and International bases of Politics". In Serajul Islam (ed.) *History of Bangladesh*, Vol. I. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Carr, E.H. 1972. *What is History?* Middlesex: Penguin Books.

Carstairs, R. 1912. *The Little World of an Indian District Offier*. London. Macmillan & Co.

Chakravarti, P.C. 1943. "Economic Conditions". In R.C, Majumder (ed.), *History of Bengal*, Vol. I. Dacca: University of Dacca.

Chatterjee, Joya. 1995. *Bengal Divided*. Cambridge: Cambridge University Press.

Chatterjee, Partha. 1993. *The Nation and its Fragments*. Princeton, NJ:Princeton University Press.

Chaudhuri, Nirad C., 1987. *Thy Hand, Great Anarch*. Reading, Mass: Addison-Wesley Publishing Company.

———. 1988 (Reprint). *The Autobiography of an Unknown India*. Delhi: Jaico Publishing House.

Chowdhury, Abdul Momin. 1987. *Dynastic History of Bengal*. Dacca: The Asiatic Society of Pakistan.

Collions, Larry and Lapierre, Dominique. 1975. *Freedom at Midnight*. New York: Simon and Schuster.

Connor, Walker. 1978. "A Nation is a Nation, is a State, is an Ethnic Group, is a ..." *Ethnic and Racial Studies*, ¼, 379-88.

Davis, Kingsley. 1951. *The Population of India and Pakistan*. Princeton: Princeton University Press.

Dube, S.C. 1955. *Indian Village*. Ithaca: Cornell University Press.

Dumont, L. And Pocock, D.F. 1957. "Village Studies". *Contributions to Indian Sociology, I*.

Durant, Will. 1963. *Our Oriental Heritage*. New York: Simon and Schuster.

Dutta, Debabrata. 1986. *History of Assam*. Calcutta: Sribhumi Publishing Company.

Dutt, R.C. 1960. *Economic History of India*. 2 Vols. Delhi: Publications Division, Govt. of India.

Eaton, Richard M. 1994. *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*, 1204-1760. Delhi: Oxford University Press.

Foster, George. 1965. "Peasant Society and Image of Limited Good". *American Anthropologist*, Vol-67.

Friedman, David. 1977. "A Theory of the Size and Shape of Nations". *Journal of Political Economy*. Vol. 85. No. 1.

Fukutake, Tadashi 1967. *Asian Rural Society*. Seattle: University of Washington Press.

Fukuyama, Francis. 1999. *The Great Disruption*. New York: The Free Press.

Gait, E.A. 1902. *Report of the Census of India*, 1901. Vol.V. Calcutta; Bengal Secretariat Press.

———. 1913. *Census of India* 1911. Vol. I, Pt. I. Calcutta: Govt. Printing.

Ganguly, Birendranath. 1938. *Trends of Agriculture and Population in the Ganges Valley*. London: Methuen and Co. Ltd.

Geddes Arthur, 1929. "The Regions of Bengal". *Geography*, September 1929.

Geertz. Clifford. 1963. "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States". In Clifford Geertz (ed.), *Old Societies and New States*. New York: Free Press.

Gellner, Ernest. 1993. *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press.

Gordon, Leonard A. 1974. Bengal: *The Nationalist Movement*. New York: Columbia University Press.

Government of Bangladesh (GOB). 1992. *Forestry Master Plan*. (mimeo). Dhaka: Ministry of Environment and Forests.

Government of Bengal. 1817-1819. *Mymensingh District Records*. Vol. XI. (manuscript in National Archives of Bangladesh).

Government of Bengal. 1936. *The Bengal Survey and Settlement Manual*. Calcutta: Secretariat Press.

Government of East Pakistan 1950. *Report of the Land revenue Commission*. Dacca: Government Press.

Guha, B.S. 1944. *Race Elements in the Population of India*. Oxford: Oxford University Press.

Habib, Ifran. 1969. "Potentialities of Capitalist Development in India" *Journal of Economic History*, XXIII, No. 4.

Hashim, Abul. 1974. *In Retrospection*. Dhaka: Mowla Brothers.

Hashmi, Tajul Islam. 1994. *Peasant Utopia: The Commercialization in East Bengal*. Dhaka: University Press Limited.

Hayami, Yujiro. 1981. *Understnding Village Community and the Direction of Agrarian Change in Asia*. New Delhi: Hindustan Publishing Corporation.

Hazarika, Sanjoy. 1994. *Strangers of the Mist*. New Delhi: Viking.

Hicks, Sir john. 1969. *A Theory of Economic History*. London: Oxford University Press.

Hobsawm, Eric. 1983. "Introduction: Inventing Tradition". In Eric Hobsawm and Terence ranger (eds), *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hourani Albert. 1992. *A History of the Arab Peoples*. New York: Warner Book.

Hutchinson, John and Smith, Anthony D. (ed) 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.

Hunter, W.W. 1945. *The Indian Mussalmans*. Calcutta: Comrade Publishers.

——— . 1985 (Reprint). *Imperial Gazetteer of India*. Calcutta.

Ibn Batuta 1969. *Travels in Asia and Africa*, 1325-1354. translated by H.A.R. Gibb. New York: August M. Kelly.

Imam, Abu. 1982. "Bengal in History". In S.N. Mukherjee (ed.) *India: History and Thought*. Calcutta. Subarnalekha.

Islam, Kamrunnesa. 1984. *Aspects of Economic History of Bengal*. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Islam, Mustafa Nurul. 1973. *Bengali Mulim Public Opinion Reflected in the Bengali Press*, 1901-1930. Dhaka: Bangla Academy.

Islam, Serajul. 1997. "Review of Book (Discovery of Bangladesh)". *Journal of Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. 42. No.2. pp.336-339.

Islam, Serajul. 2000 *Comilla District Records*, Vol.I Dhaka: The Institute of Liberation, Bangladesh and Bangladesh Studies.

Jahan, Raunaq. 1994 (Reprint). *Pakistan: Failure in National Integration*. Dhaka: University Press Limited.

Kabir, Muhammad Ghulam. 1994. *Changing Face of Nationalism: The Case of Bangladesh*, Dhaka: University Press Limited.

Karim, Abdul. 1985. *Social History of the Muslims in Bengal. Chittagong:* Baitush Sharaf Islamic Research Institute.

Kedourie, Elie. 1960. *Nationalism*. London: Hutchinson.

Khan Akbar Ali. 1982. *Some Aspects of Peasant Behaviour in Bengal*. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

———. 1987. "The Village in Bangladesh: A Survey". *Bangladesh Journal of Public Administration*, Vol.I. No.1.

———. 1989. "The Controversy On the Origin of the Pala Rule in Bengal Reconssidered" *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. XXXIV.

———. 1992. "Golden Bengal: Myth and Reality". In Sirajul Islam (ed.) *History of Bangladesh*, Vol.I. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Khan, Akhter Hamid 1983. *The Works of Akhtar Hamid Khan*. 3 Vols. Comilla: BARD.

Khan, M.A. 1992. "Religious Reform Movement of the Muslims" In Serajul Islam (ed.). *History of Bangladesh*, Vol. II. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Khandkar Shahid, Khalily. Baqui and Khan. Zahed. 1994. Is *Grameen Bank Sustainable?* Washington D.C. World Bank.

Kohn, Hans. 1945. *The Idea of Nationalism*. New York: Macmillan.

Latif, Sk. Abdul. 1993. *The Muslim Mystic Movement in Bengal*. Calcutta: K.P. Bagchi and Company.

Lindsay, J.H. 1964. "Local Self Government" In H.H. Dodwell (ed.) *Cambridge History of India*. Vol. VI. Delhi: S. Chand and Co.

Lorwin. VAL R. 1965. "The Comparative Analysis of historical change: nation-building in the western world". *International Social Science Journal*, Vol. XVII. No.4.

Majumdar. D.N. and Rao. C.R. 1960. *Race Elements of Bengal*. Calcutta: Statistical Publishing Society.

Majumder. R.C. 1943. *History of Bengal*, Vol. I. Cacca: University of Dacca.

———. 1957. *Struggle for Empire*. Bombay : Bharatiya Vidya Bhavan.

Mahalanobis. P.C. 1927. "Analysis of Race Mixture in Bengal". *Journal of Asiatic Society of Bengal* (N.S.) XXIIII.

Mallick. A.R., and Husain Syed Anwar. 1992. "Political Basis of Bengali Nationalism". In Sirajul Islam (ed.). *History of Bangladesh*. Vol.1. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Mandelbaurn. David G. 1990. *Society in India*. Bombay: Populai Prakashan.

Manu. 1991. *Laws of Manu*. Translated by Wendy Doniger and Brian K. Smith. New Delhi: Penguin Books.

Maniruzzaman Talukdar. 1980. *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*. Dhaka: Bangladesh Books International Limited.

Martin J. T. 1924. *Census of India*. 1921. Vol. I. Pt. I. Calcutta: Government Printing.

Marx. Karl and Engels, Frederick. 1962. *Selected Works*, Vol. I. Moscow: Foreign Language Publishing House.

Mclane, John R. 1992. "Partition of Bengal. 1905. A Political Analysis". In Sirajul Islam (ed.) *History of Bangladesh*, Vol. I. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Mitra, R.C. 1954. *The Decline of Buddhism in India*. Visva-bharati: Visva bharati Press.

Moon, Penderel. 1989. *The British Conquest and Dominion of India*. London: Duckworth.

Morrison, B. 1969. "Region and Subregion in Pre-Muslim Bengal". In D. Kopt (ed.), *Bengal Regional Identity*. East Lansing: Michigan State University.

Morris, Morris D. 1963. "Towards and Interpretation of Nineteenth Century Indian Economic History". *Journal of Economic History*, XXIII, No. 4.

Mukhia, Harbans. 1994. *Perspectives on Medieval History*. New Delhi: vikas Publishing House Pvt. Ltd.

Nairn. Tom. 1977. The Break-up of Britain: Crisis and Neo-Nationalism: London: New Left Books.

Nath, R.M. 1948. *The Background of Assamese* Culture. Shillong: A.K. Nath.

North. Douglass C. 1981. *Structure and Change in Economic History*. New Work: W.W. Norton and Company.

———. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University press.

Novak. James J. 1993 *Bangladesh*. Dhaka: University Press Limited.

Osmany,Shireen Hasan. 1992. *Bangladeshi Nationalism*. Dhaka: University press Limited.

Palit, Chittabrata. 1975. *Tensions in Bengal Rural Society*. Calcutta: Progressive Publishers.

Planhol, Xavier de. 1957. *The World of Islam*. Ithaca: Cornell University Press.

Popkin, Samuel L. 1979. *The Rational Peasant*. Berkeley: University of California Press.

Porter, A.E. 1933. Census of India. 1931, Vol. V. Calcutta: Central Publication Branch.

Putnam, Robert D. 1982. Making Democracy Work. Princeton: Princeton University Press.

Qureshi, I.H. 1965. The Struggle for Pakistan. Karachi: University of Karachi.

Rahim, Muhammad Abdur. 1963. *Social and Cultural History of Bengal*. Karachi: Pakistan Historical Society.

———. 1977. *Social and Cultural History of Bengal*. Vol. II. Karachi: Pakistan Publishing House.

———. 1979. *The Muslim Society and Politics in Bengal*. Dhaka:: Dhaka University Press.

Rahman. H.Z. 1986. *Landed Property and the Dynamic of Instability* (mimeo) Manchester unpublished Ph.D dissertation submitted to Victoria University.

Renan, Ernest. 1994. "Qu'est-ce qu'une nation ?" In John Hutchinson and Authony D. Smith (eds.) *Nationalism*. Oxford: Oxford University Press.

Risley. Sir Herbert, 1915. *The People of India*, Calcutta: Thacker, Spink and Company.

———. 1981.(Reprint). *Tribes and Castes of Bengal*. Calcutta: Firma Mukhopadhyay.

Rose H.A. n.d. *Religious History of Islam*. Delhi: Amar Prakashani.

Rothermund. Dietmar. 1988. *An Economic History of India*. London: Croom Helm.

Roy Asim.1983 (Reprint). *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*. Dhaka: Academic Publishers.

Roy. Nihar Ranjan. 1945. "Medieval Bengali Culture –a Socio-Historical Interpretation. *Visva-Bharati Quarterly* XI.

Rudra Ashok. 1988. *Some Problems of Marx's Theory of History*. Calcutta: Centre for Studies in Social Sciences.

Sarkar. Jadunath. 1976 (Reprint). *The History of Bengal*. vol. II. Dhaka: University of Dhaka.

Sastry, K.A.N. 1966. *A History of South India*. London: Oxford University Press.

Satyamurty . T.V. 1979. "Language. Religion and Political Economy. The Case of Bangladesh " In david Taylor and Malcolm Yapp, *The Political Identity in South Asia*. London: Curzon Press.

√Schama. Simon 1989. *Citizens*. New York: Alfred & Knopf.

Schendel. Williem VAN 1980. *The Odds of Peasant Life* (mimeo). Amsterdam: Unpublished Ph.D. dissertation of University of Amsterdam.

Scott, James C. 1976. *The Moral Economy of the Peasants*. New Haven: Yale University Press.

Sharif, Jafar. 1975. *Islam in India or the Qanuni-Islam*. London: Curzon Press.

Sen. Binayak. 2000. "Beyond Nation: A Reconsideration of Akbar Ali Khan's Discovery of Bangladesh: Exploration into Dynamics of a Hidden Nation" *The Bangladesh Development Studies*. Vol. XXVI. pp. 125-162.

Sen. K.M. 1961. *Hinduism*. Baltimore: Penguin Books.

Seton-Watson, Hugh. 1977. *Nations and States*. London: Methuen.

Singer. Milton, 1972. *When a Great Tradition Modernizes*. Chicago: The University of Chicago Press.

Sobhan, Rahman. 1992. "Economic Basis of Bengali Nationalism". In Sirajul Islam (ed.). *History of Bangladesh*. Vol. II. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Srinivas, M.N. 1987. *The Dominant Caste and other Essays*. Delhi: Oxford University Press.

Stein. Burton- 1994. *Peasant State and Society in Medieval South India*. Delhi: Oxford University Press.

Sugden. Robert. 1989. "Spontaneous Order". *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 3. No.4.

Tarafdar. Momtazur Rahman. 1965. *Hussain Shahi Bengal*. Dacca: Asiatic Society of Pakistan.

Thompson. W.H. 1921. *Census of Bengal*. 1921. Calcutta. Bengal Secretariat.

Thorner. Daniel. 1966 "Marx on India and the Asiatic Mode of Production". *Contributions to Indian Sociology*. Vol. IX.

Titus. Murray T 1959 *Islam in India and Pakistan*. Calcutta: YMCA Publishing House.

Turner, F.J. 1953. *The Frontier in American History*. New York: Henry Holt and Company.

Umar, Badruddin. 1990. "Language Movement". In Serajul Islam (ed.). *History of Bangladesh*, Vol. I. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

UNDP. 1993. *Report on Public Administration Sector Study in Bangladesh*. New York: UNDP.

Wade, Robert. 1985. *Village Republics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Weber, Max. 1948. *From Max Weber: Essays in Sociology*. Trans and (ed.) H.H. Gerth and C. Wright Mills. London: Routledge and Kegan Paul.

———. 1960. *General Economic History*. Translated by Frank H. Knight. New York: Collier Books.

Wilcox, Sir William. 1930. *Lectures on the Ancient System of Irrigation* in bengal. Calcutta: University of Calcutta.

Wittfogel, Karl A. 1957. *Oriental Despotism*. New Haven: Yale University Press.

Wolpert, Stanley. 1984. *Jinnah of Pakistan*. New York: Oxford University Press.

Zaheer, Hasan. 1994. *The Separation of East Pakistan*. Karachi: Oxford University Press.

Zainuddin, Alisa. 1970. *A. Short History of Indonesia*. New York : Praeger Publishers.

Ziring, Lawrence. 1992. *Bangladesh: From Mujib to Ershad*. Dhaka: University Press Limited.

বাংলা

উমর, বদরুদ্দিন, ১৯৬৯। সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা। ঢাকা : গ্রন্থন

———. ১৯৮৭। "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি"। মুহম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত জাতীয়তাবাদ বিতর্ক-এ অন্তর্ভুক্ত। ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লি

কৌটিল্য ১৯৬৭ (পুনর্মুদ্রণ)। আর সামশাস্ত্রী কর্তৃক অনূদিত। মাইশোর; মাইশোর প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউজ।

চক্রবর্তী, রণবীর, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ। প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লি.।

চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ)। "বর্তমান হিন্দু মুসলমান সদস্যা"। সুকুমার, সেন সম্পাদিত শরৎ সাহিত্য সমগ্র, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।

চৌধুরী, নীরদ সি., ১৪০২ বঙ্গাব্দ। "বাঙ্গালীর কাছে আমার শেষ কথা"। দেশ (পূজা সংখ্যা)

দাশ, আশা, ১৯৬৯। বাংলা সাহিত্য বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি। কলকাতা : বুক হাউজ।

দাশ, দেবেশ, ১৯৮৪। বৃহত্তর বাঙ্গালি। কলকাতা : নাথ ব্রাদার্স।

বসু, সজল, ১৯৮৬। বাঙালি জীবনে দলাদলি। কলকাতা : কল্পন।

বাকী, আব্দুল, ১৯৯৮। গ্রামীণ বস্তি। ঢাকা : বঙ্গ প্রকাশনী।

মজুমদার, আর. সি., ১৯৮১। বাংলাদেশের ইতিহাস। কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স।

মুখোপাধ্যায়, সুখময়, ১৯৯৬। বাংলার ইতিহাসে দু'শ বছর। কলকাতা : ভারতী বুক স্টল।

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর। ১৯৯৪ (পুনর্মুদ্রণ)। গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

রাব্বী, খন্দকার ফজলে, ১৯৮৬ (পুনর্মুদ্রণ)। বাংলার মুসলমান। আব্দুর রাজ্জাক অনূদিত। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

রায়, অজয়, ১৯৮৭। "জাতীয়তাবাদ : পাকিস্তান ও বাংলাদেশ"। মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত জাতীয়তাবাদ বিতর্ক-এ অন্তর্ভুক্ত। ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লি.।

রায়, অন্নদাশঙ্কর, ১৯৫৪। "খুকু ও খোকা", বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা-য় অন্তর্ভুক্ত। কলকাতা : এস.সি. সরকার এ্যান্ড সন্স্।

রায়, নীহার রঞ্জন, ১৪০০ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ)। বাঙালীর ইতিহাসের আদি পর্ব। কলকাতা : দেজ পাবলিশিং।

রাব্বী, খন্দকার ফজলে, ১৯৮৬ (পুনর্মুদ্রণ)। বাংলার মুসলমান। আব্দুর রাজ্জাক অনূদিত। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

শর্মা, রাম শরণ, ১৯৮০। ভারতের সামন্ততন্ত্র। শিবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় অনূদিত। কলকাতা : কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী।

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ, ১৯৭৬। বাংলা সাহিত্যের কথা। ঢাকা : রেঁনেসা পাবলিকেশন্স।

সরকার, সুধীর চন্দ্র, ১৯৩২ বঙ্গাব্দ। পৌরাণিক অভিধান। কলকাতা: এস.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স।

সেন, দীনেশ চন্দ্র, ১৯৯৩। বৃহৎ বঙ্গ। কলকাতা : দেজ পাবলিশিং।

হাবিব, ইরফান, ১৯৮৫। মোগল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা। এস. পাল দত্ত ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত। কলকাতা: কে. সি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি।

হক, মুহম্মদ এনামুল। ১৯৫৭। মুসলিম বাংলা সাহিত্য। ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন্স।

নির্ঘণ্ট